সব সম্ভব

Gen-Z ◆ জীবন জয়ের গল্প

তরুণ বয়সটা সকল বৃত্ত
ভাঙার। অসম্ভব জেনেও
সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার।
কোনো ব্যর্থতাকে ব্যর্থতা
মনে না করার। বড় চিন্তা
করার। ভালো চিন্তা করার।
কারণ সে বিশ্বাস করে,
সম্ভবের নির্দিষ্ট কোনো
সীমানা নেই।
বাংলাদেশের Gen-Z প্রজন্ম
বিশ্বাস করে—সব সম্ভব।
এমনই শত তরুণের
জীবন জয়ের গল্প নিয়ে
সংকলন ‘সব সম্ভব’।

বইটি অনলাইনে ফ্রি পড়ুন।
ডাউনলোড করুন।
পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন।

যুগে যুগে সভ্যতার বাঁকবদল হয়েছে
তরুণদের হাত ধরেই।
হে তরুণ! বিশ্বাস করুন—
আপনিও পৃথিবীতে কিছু করে যেতে এসেছেন।

নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই
প্রকৃত দেশপ্রেম

সব সম্ভব

Gen-Z u জীবন জয়ের গল্প

সম্পাদক

শরিফুল ইসলাম □ উক্যএ মার্মা

সব সম্ভব
সম্পাদক : শরিফুল ইসলাম □ উক্যএ মার্মা

প্রকাশক
মায়িশা তাবাসসুম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
শান্ত খিয়াং
একাদশ শ্রেণির ছাত্র

মুদ্রাকর
প্রজ্ঞাপ্রকাশ
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য
৫০০ টাকা

ISBN : 978-984-37-0079-7

Shob Shombhob
(Everything is possible)

Published by
Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : $25

উৎসর্গ

যাদের ভাবনা
যাদের দোয়া
যাদের সহযোগিতায়
আমরা জীবন জয়ের
উৎসাহ পেয়েছি
সেই নেপথ্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের
উদ্দেশ্যে

সূচিপত্র

ভাবনা, বিশ্বাস ও অর্জনের সাক্ষী এই আমি	১৭	থংইয়া মুরুং
মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা পেয়েছি	২২	জ্যাকসন বড়ুয়া
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি প্রথম ম্রো ছাত্র	২৫	কাইংপা ম্রো
কোয়ান্টাম আমাকে শিখিয়েছে 'সব সম্ভব'	২৯	শরিফুল ইসলাম
স্বপ্ন দেখি বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ	৩৩	মিল্টন বম
ভালো ছাত্র হওয়ার চেয়ে ভালো মানুষ হওয়া বেশি প্রয়োজন	৩৬	লেংঙি ম্রো
অন্যের থেকে নেয়ার চেয়ে দেয়াতেই শতগুণ বেশি আনন্দ	৪০	জ্যাকি মার্মা
এখানে না এলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হতো না	৪৩	মংহ্লাচিং চাক
সুযোগ পেলে যে-কেউ উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে	৪৬	মো. সাহেদুজ্জামান
আমিও মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই	৫০	আরিফুল ইসলাম
কোটা নয়, মেধা	৫৩	এনক বম
কষ্টসহিষ্ণু হয়ে আমরা বেড়ে উঠেছি	৫৬	চিংমং মার্মা
যা আছে তা নিয়ে শুরু করলাম	৫৯	উক্যএ মার্মা
শৃঙ্খলাই জীবন	৬২	মংপ্রু মার্মা
এ পর্যন্ত ২০ বার রক্তদান করেছি	৬৫	শফিকুল ইসলাম
তরুণ সমাজকে ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্ত করতে চাই	৬৯	সুইঅং থোয়াই মার্মা
কঠিন যুদ্ধেও আমি পরাজয় মানতে শিখি নি	৭৩	উক্যচিং মার্মা
পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ব	৭৬	হারুন অর রশিদ
কীভাবে পেরোতে হয় স্বপ্নের সীমানা—তা জেনেছি	৮০	জিয়াবুল হক
হ্যান্ডবলে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মনছবি করলাম	৮৪	শরিৎ চাকমা
স্কুল জীবন থেকেই দেশ নিয়ে ভাবতাম	৮৭	রুবেন ত্রিপুরা
এখন আমি নিজ এলাকায় ট্যুরিস্টদের নিয়ে কাজ করি	৯০	রানা খিয়াং
জাহিদ স্যার বললেন, প্র্যাকটিসকে কখনো 'না' বলবে না	৯৩	লাংসাই খুমী
মেডিকেলে পড়ার স্বপ্নটাই ছিল দুঃসাহস	৯৭	কামরুল ইসলাম
আমার গল্পটা আনন্দের, সংগ্রামের	১০০	সুজন ত্রিপুরা

সূচিপত্র

আমার পথ চলায় মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি	১০৫	রেংতম ম্রো
আমি পারি আমি পারব	১০৮	ক্যথোয়াইপ্রু মার্মা ঝিঝি
আমার ধ্যানজ্ঞান জুড়ে শুধুই আর্চারি	১১১	ভানরুম বম
আমার উপজেলায় বমদের মধ্যে আমিই প্রথম মেডিকেলে পড়ছি	১১৪	লালসেপ্ঠা বম
আমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে	১১৮	হালিরাম ত্রিপুরা
মনছবি ছিল বুয়েটে পড়ব	১২১	শৈক্যচিং মার্মা
সঠিক নিয়মে পরিশ্রম করলে সবই সম্ভব	১২৪	উচেনা মার্মা
স্বপ্নে বাবা বললেন, আল্লাহ চালাবেন	১২৬	এখতিয়ার উদ্দিন
মনছবি ও মেডিটেশন আমার সাফল্যের গতিপথ রচনা করেছে	১২৯	নাঈমুর রহমান
শিক্ষকেরা শুধু শিক্ষক নন, তারা আমাদের অভিভাবক ছিলেন	১৩৩	সজিব চাকমা
ভাবনাটা রাখতে হবে শুধু পারা'র প্রতি	১৩৭	এমংসিং মার্মা
স্মার্টফোন আসক্তি থেকে মুক্ত হলাম	১৪০	নোমেন চাকমা
শুদ্ধাচার বইটি সর্বত্র পৌঁছে দিতে চাই	১৪২	প্রিয়রঞ্জন চাকমা
খুমীদের মধ্যে আমি প্রথম স্নাতক পাশ করলাম	১৪৫	সুইতং খুমী
আমাদের মাধ্যমে খুমীরা পেল নতুন এক পরিচয়	১৪৮	অংহো খুমী
কোটায় ভর্তির সুযোগ পেয়েও নিই নি	১৫১	শান্তিময় চাকমা
স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে	১৫৫	পিএসমং মার্মা
১৩ বছর ধরে শিখেছি কীভাবে পারতে হয়	১৫৮	থোয়াইছাচিং চাক
ভালো থাকুন প্রিয় শোভন স্যার!	১৬১	জাকের হোসেন শাহিন
শিখেছি কীভাবে মানুষকে ভালবাসতে হয়	১৬৫	তনক চাকমা
বিদেশে যাব না, দেশেই থাকব	১৬৯	শহীদুল ইসলাম
খাতার প্রচ্ছদে দেখতাম ইউনিভার্সিটি লেখা	১৭৩	নবজ্যোতি চাকমা
এখানে আসার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই শুনি নি	১৭৭	মো. ওমর ফারুক রনি
গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে চাই	১৮১	উসাইথিং মার্মা
বিশ্বমানের গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চাই	১৮৫	উসেসাইন মার্মা
মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা হীনম্মন্যতা মানুষকে পিছিয়ে দেয়	১৮৭	আবিদ রহমান জেনীথ
বৌদ্ধ বিহার থেকে কসমো স্কুল, তারপর মেডিকেল কলেজ	১৯২	উজ্জ্বল কান্তি চাকমা
এই স্কুলই ছিল আমাদের দুই ভাইয়ের একমাত্র ভরসা	১৯৫	ইমরান শাহেদ
একজন আদর্শ চিকিৎসক হতে চাই	১৯৯	উহাইমং মার্মা

সূচিপত্র

তামাক ও মাদকমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি	২০২	সাইদুল ইসলাম
পৃথিবীতে প্রথম হয়ে এসেছি, আগামীতেও প্রথম হবো	২০৫	শৈক্যনু মার্মা
পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়তে চাই	২০৮	অপূর্ব চাকমা
এই মানুষগুলোকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না	২১০	খোরশেদ আলম
ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল	২১৩	অংচুথিং মার্মা
ভালো কিছু করতে চাই	২১৬	শিশির চাকমা
জিমন্যাস্টিক্স আমার জীবনের অংশ	২১৮	সাংখেঅং খুমী কিতং
এই স্কুল আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট	২২২	অলি ইসলাম
যেভাবে সেবা পেয়েছি ঠিক সেভাবেই সেবা দিতে চাই	২২৫	ক্যসাজাই মার্মা
ডিসিপ্লিন মেনে চলা কঠিন হলেও এটাই সবচেয়ে ভালো দিক	২২৮	জেমি বড়ুয়া
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছেটা দৃঢ় ছিল	২৩১	মংছাইনু মার্মা
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে চাই	২৩৪	আব্দুর রাব্বি তোতা
দেশের দুর্গম জায়গাটি পরিণত হলো আলোকিত জনপদে	২৩৮	সামসন বম
ঋণের দুষ্টচক্রের ভয়াবহতা আমি দেখেছি	২৪১	মো. ইমন বিশ্বাস
আজ মা থাকলে খুব খুশি হতেন	২৪৫	উটিংমং চাক
নেশায় বুঁদ থাকা ছেলেটা এখন স্বপ্ন দেখে ভালো মানুষ হওয়ার	২৪৮	জোসীময় চাকমা
অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই	২৫৩	রেমন্ড ত্রিপুরা
স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেয়েছি	২৫৭	এম. শহিদ উল্যা
ভোকেশনাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে	২৬১	দিমান্ত চাকমা
আমার এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চাই	২৬৪	মো. আব্দুর রহিম
বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে চাই	২৬৭	রিমন কান্তি দে
রুটিন ও মেডিটেশনের শক্তি এনে দিয়েছে সাফল্য	২৭০	অংসাইনু মার্মা
মেধাকে সেবায় রূপান্তর করতে চাই	২৭৩	মো. হোছন
এলাকায় আমার মতো জেগে উঠুক আরো অনেকে	২৭৭	পাঅং বম
সৎ থাকতে চাই সবসময়	২৮০	মো. বখতিয়ারুল ইসলাম
ভাবনার দুয়ার খুলে গেল	২৮৩	মো. আব্দুল মোমেন
শিখেছি কীভাবে মানুষের সাথে মিশতে হয়	২৮৭	ক্য সাইন উ মার্মা
একজন আদর্শ ভাস্কর হয়ে বেঁচে থাকতে চাই মানুষের হৃদয়ে	২৮৯	হাস্তরাম ত্রিপুরা
গহীন জঙ্গল থেকে আলোর পথে যাত্রা	২৯৩	রেংওয়ই ম্রো

সূচিপত্র

আমি পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রেখে যেতে চাই	২৯৭	মো. হায়দার আলী
জীবনের কাছে কখনো হার মানি নি, মানব না	৩০০	হ্লানুমং মার্মা
দেশের মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই	৩০৫	উচিনচো রাখাইন
আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ পেয়েছি	৩০৯	নিয়াজ মাহমুদ গৌরব
ভালো কিছু পেতে হলে প্রয়োজন ধৈর্য ও পরিশ্রম	৩১৩	রবি শংকর চাকমা
দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমে ভালো কিছু করতে চাই	৩১৭	সৈয়দ শফিকুল ইসলাম
মনছবি ছিল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকব	৩২১	জসাইমং মার্মা
আমি একজন ভালো শিক্ষক হতে চাই	৩২৫	রাজীব আহমেদ
মানুষ মরে যায় কিন্তু তার স্বপ্ন বেঁচে থাকে	৩২৮	ওমর ফারুক
মা-বাবার ত্যাগের ফল দিতে চাই সাফল্যের মাধ্যমে	৩৩২	উচাইন মার্মা
প্রতিটি মানুষেরই পারার ক্ষমতা আছে	৩৩৫	তপ্ত বিকাশ ত্রিপুরা
পাহাড়ি পরিবেশে অল্প খরচে বাসস্থান তৈরির পরিকল্পনা করছি	৩৩৮	নিলয় তঞ্চঙ্গ্যা
গ্রামের মানুষ বলেছিল, এর দ্বারা পড়াশোনা হবে না	৩৪০	সুমন ত্রিপুরা
বড় কিছু, ভালো কিছু করতে হবে	৩৪৩	গাঁথীচন্দ্র ত্রিপুরা
আমার জীবন হয়তো একটা পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেত	৩৪৭	ইয়াইয়ং ম্রো
আমি সফল হবো	৩৫১	মো. নাজমুল ইসলাম
এই স্কুলে না পড়লে হয়তো লেখাপড়াই করা হতো না	৩৫৫	লেনার্ধ সাংমা
ভোকেশনালে পড়েও জেনারেল শাখায় ভালো করা সম্ভব	৩৫৮	শিহাব সজীব
আনন্দটা যেন স্বাধীনতার	৩৬২	শাহনেওয়াজ হৃদয়
স্বর্গভূমি বাংলাদেশ আমরাই নির্মাণ করব	৩৬৫	পারভেজ আলম
আমার সম্প্রদায়ে আমি প্রথম সরকারি ডেন্টাল ইউনিটে পড়ছি	৩৭০	খয়লন ম্রো

সব সম্ভবে ব্যবহৃত পরিভাষা	৩৭৪
ছবিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ	৩৭৫

* অনুভূতিগুলো ২০২২-২৪ এর মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে

সম্ভব! সব সম্ভব!!

তরুণ বয়সটা সকল বৃত্ত ভাঙার। অসম্ভব জেনেও সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার। কোনো ব্যর্থতাকে ব্যর্থতা মনে না করার। বড় চিন্তা করার। ভালো চিন্তা করার। কারণ সে বিশ্বাস করে, সম্ভবের নির্দিষ্ট কোনো সীমানা নেই। বাংলাদেশের Gen-Z প্রজন্ম বিশ্বাস করে—সব সম্ভব। এমনই শত তরুণের জীবন জয়ের গল্প নিয়ে সংকলন 'সব সম্ভব'।

প্রশ্ন হতে পারে, কীভাবে বদলে গেল তাদের জীবন? একটি শিক্ষালয়—কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ বদলে দিয়েছে তাদের জীবন।

মেধার কোনো জাত নেই পাত নেই। সুযোগ পেলে যে কেউ নিজ গুণে বিকশিত হতে পারে—এই বিশ্বাস নিয়ে ২০০১ সালে বান্দরবানের প্রত্যন্ত এলাকায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ আল বোখারী মহাজাতক গড়ে তোলেন এ বিদ্যাপীঠ। মাত্র সাতটি শিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু। বর্তমানে বাঙালিসহ ২২ জাতির আড়াই হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ধ্যানে জ্ঞানে প্রযুক্তিতে আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠছে এখানে।

কারো হয়তো বাবা নেই, কারো মা নেই, কারো দুজনই নেই, আবার কারো বাবা-মা থেকেও আর্থিকভাবে অসহায়, কারো লেখাপড়ার পরিবেশ ছিল না—এমন অবস্থায় এই স্কুলে শিশুরা এসেছে চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সে, নয়তো স্কুল জীবনের কোনো না কোনো ধাপে। আবার কেউ কেউ ভর্তি হয়েছে কলেজে।

সেই শিশু বয়সেই তারা পেয়েছে নিয়মিত মেডিটেশন, ইয়োগা, লেখাপড়া, খেলাধুলা, শুদ্ধাচার চর্চার পাশাপাশি 'জীবনে ১ম' হওয়ার ভাবনা বা মনছবি। এই স্কুলের ছোট্ট কোনো শিশুকে 'বড় হয়ে তুমি কী হবে' জিজ্ঞেস করলে, নিজের নামটা ঠিকমতো বলতে না পারলেও সে বলতে পারে—'পথম' (প্রথম) হবো। এই প্রথম হওয়ার মনছবির শক্তিতেই তারা আজ অধিকাংশ

পড়ছে দেশের স্বনামধন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্যারেড ও ব্যান্ড বাদনে (২০১৫-২০১৯) টানা পাঁচ বার প্রথম হয়ে সারাদেশে নজর কেড়েছে। এছাড়াও ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা স্কুল হয়েছে পর পর চার বার (২০১৭-২০২০)।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের বলা হয় কোয়ান্টা। অর্থাৎ প্রত্যেকে একটা করে আলোকগুচ্ছ।

এই বই পড়তে গিয়ে একজন পাঠক যেমন জীবন বদলে দেয়ার শতাধিক ঘটনা জানবেন, তেমনি পাবেন আমাদের দেশের প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রামের বাস্তব চিত্র, তাদের আশা-নিরাশার গল্প। আর ঋণ, তামাক চাষ, মাদক, অবিদ্যা, কুসংস্কার, ডিজিটাল আসক্তির মতো সমাজের নানা অসঙ্গতির খণ্ড খণ্ড চিত্র। তাদের এই গল্পগুলোর নেপথ্যে উঠে আসবে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের ২৩ বছরের ইতিহাস। কোয়ান্টামমের ইতিহাস। শূন্য থেকে শুরু করার ইতিহাস। অসম্ভবকে সম্ভব করার ইতিহাস। আসলে তিন দশক আগে সাধারণ মানুষের ভাবনারাজ্যে কোয়ান্টাম যে মানবিক মহাসমাজের বীজ বুনেছিল, তারই ক্রমবিকশিত রূপ এই কোয়ান্টামম এবং এই শিক্ষাঙ্গন।

প্রিয় পাঠক, আপনি যে বয়সের হোন না কেন, তারুণ্যশক্তিকে অনুভব করবেন। আপনি অনুপ্রাণিত হবেন। নতুন শুরুর একটা তাগিদ পাবেন। এই তরুণদের প্রত্যেকের মতো আপনিও বলে উঠবেন—সব সম্ভব!

পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন।

সব সম্ভব

Gen-Z u জীবন জয়ের গল্প

ভাবনা, বিশ্বাস ও অর্জনের সাক্ষী এই আমি

থংইয়া মুরুং
কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার

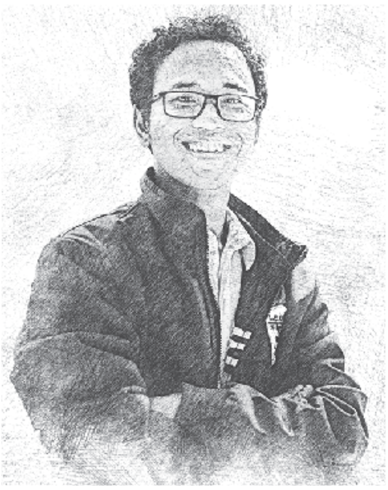

ঠিক মনে করতে পারছি না কবে ১৯৯৮ কি ৯৯ সাল, আমাদের ম্রো সম্প্রদায়ের একটি এলাকা নয়াপাড়ায় আলখেল্লা পরা একজন মানুষের সাথে দেখা হয়েছিল। আমার জীর্ণশীর্ণ শরীরে ছিল ময়লা কাপড়। তিনি কোথা থেকে এসেছেন, কী করেন—কিছুই জানি না। আর আমার বয়সটাই বা কত তখন। পাঁচ বছর হবে। কী করে বুঝব তখন যে, তিনি আমাদের ও বঞ্চিত মানুষের জন্যে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখেন। কাল পরিক্রমায় আমার ২৩ বছর কেটে গেল তারই স্বপ্নের ফুল বাগান কোয়ান্টামমে। ধীরে ধীরে সেই মানুষটা হয়ে উঠলেন আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ—আমার গুরুজী দাদু, যার স্বপ্নের সারথি হয়ে স্বপ্ন দেখছে হাজারো সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম শিশু। এ শিশুরা হয়ে উঠছে আগামী বাংলাদেশের নির্মাতা। তিনি আমার জীবনের মডেল—সত্য, আলোকিত ও সফল জীবনের সন্ধানদাতা।

২০০১ সাল। কোনো এক শুক্রবার বিকেলে আমার বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কোয়ান্টামমে। কোথায় যাচ্ছি, কোথায় থাকব, কিছুই জানি না। পলিথিনই ছিল আমার ব্যাগ। তাতে কিছু কাপড়-চোপড় ছিল।

বাবা জুমচাষী ছিলেন, তার কোনো অক্ষরজ্ঞান ছিল না। কিন্তু বাবার স্বপ্ন ছিল—তিনি যে দা-কুঠার দিয়ে আজীবন কাজ করেছেন, তার ছেলেকে যেন এসব ধরতে না হয়। তার ছেলে যেন লেখাপড়া শেখে। আজ কিছুটা হলেও বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি।

আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের একজন। আমাদের দিয়েই শুরু হয়েছিল এ স্কুলের শুভযাত্রা।

কোয়ান্টামমে দরবার হলের দুপাশে এখন বড় কয়েকটি খেজুর গাছ দেখা যায়। আমি নিজেই এই গাছে পানি দিয়েছিলাম ২৩ বছর আগে। তখন ওগুলো ছিল চারাগাছ। শুধু খেজুর গাছের চারাতে নয়, কোয়ান্টামমের রহমভ্যালির যত বড় গাছ এখন দেখা যায়, তখন সবই ছিল চারাগাছ নয়তো বীজ। সবগুলোতে আমরা তখন পানি দিয়েছি। সময়ের পরিক্রমায় চারাগুলো এখন বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আর ছোট্ট কোয়ান্টাম শিশুকানন এখন পরিণত হয়েছে সুবিশাল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে। কোয়ান্টামমেরও বিস্তৃতি ঘটেছে ব্যাপক। এগুলোর সাথেই আমার বেড়ে ওঠা।

প্রথম যেদিন এলাম সেদিন রাতে থাকার জায়গা হলো এখনকার রাহমাতান বাংলোর ডাইনিংয়ে। মাটির উপরে কয়েকটি তক্তা বিছানো ছিল। সেখানে দুইরাত কাটিয়েছি। কয়েকদিন পর বাংলোর বারান্দায় লেখাপড়া শুরু হলো। তখন কেবল স্কুল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিদিন সকালবেলা খিচুড়ি দেয়া হতো। কিন্তু খিচুড়ি খাব কেমন করে! খিচুড়ি বলে যে একটা খাবার আছে, আমাদের পাহাড়ি সমাজে সেটার প্রচলন ছিল না। যখন থালায় খিচুড়ি দেয়া হলো আমাদের তিন জনের একজন বলছে—এগুলো কি খাওয়া যায়? আমি তাকে বললাম—আরে খেয়ে ফেল যা হওয়ার হবে! সে-ও আমার কথা শুনে খেয়ে নিল। খিচুড়ির সাথে অর্ধেক ডিম ভাজি দিত তখন।

এদিকে দুমাস পর স্কুল ঘর নির্মাণ কাজ শেষ। মাত্র তিন রুমের একটি বিদ্যালয়। একটিতে শিক্ষক, আর বাকি দুইটিতে ক্লাস হতো। ক্লাস রুমে আমরা সাত জন ছাত্র। আর এখন একটা ক্লাসে বা একটা সেকশনে ৪০ জনের বেশি ছাত্র অবশ্যই আছে। এরপরে আমাদের জন্যে আবাসন তৈরি হলো। প্রথমে সাত জন তারপর ছাত্র সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল।

ম্রো, মার্মা, ত্রিপুরা ও বাঙালি ছাত্র যোগ হলো। কিন্তু আমরা কেউ কারো ভাষা বুঝি না। কথা বলতে বলতে আমরা সবাই মিলে নতুন এক ভাষা উদ্ভাবন করলাম। সে ভাষা একটু শোনাই—আই তুন স্যার কয়ইয়ে ইয়া (আমাকে স্যার বলেছেন...)। তুই তুন স্যার ডাকিয়ে (তোমাকে স্যার ডেকেছেন)। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিশেলে অদ্ভুত এক ভাষা।

শুক্রবার ছিল টিভি দেখার দিন। বিকেলবেলা বাংলা সিনেমা হতো। টিভি দেখার জন্যে আমাদের কী যে আগ্রহ! সাদা-কালো টিভি। বাইরে অ্যান্টেনা ছিল। একজন অ্যান্টেনা ঘুরাত আর বলত—চ্যানেল আসছে? আমরা বলতাম—না আসে নাই। আরেকটু বাম দিকে ঘুরা। মাঝে মাঝে টিভির সমস্যা দেখা দিত, আমরা ঠিক করতে পারতাম না। এদিকে আমাদের শিক্ষক মতিন স্যার ঘুমাচ্ছেন। তাকে সাত-আট জন মিলে কাঁধে করে নিয়ে আসতাম। আর বলতাম—টিভি ঠিক করে দেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে কেয়াজুপাড়ায় গিয়ে টিভির ব্যাটারি চার্জের জন্যে দিয়ে আসতাম। আমিই মূলত এই ব্যাটারি চার্জের বিষয়গুলো দেখতাম। তখন থেকেই আমার ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসপত্রের ওপর একটা আগ্রহ জন্মে।

তখন তো কোয়ান্টামমে বিদ্যুৎ ছিল না। মাঝেমধ্যে কোনো অতিথি এলে হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হতো। এই বাতি জ্বালানোর কিছু নিয়ম আছে। আর প্রতিবারই বাতি জ্বালাতে গিয়ে দেখা যেত বাতি নষ্ট! ঠিক করতে আমাকে ডাকা হতো। আনন্দ নিয়ে আমি বাতি জ্বালাতাম।

শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন একঘণ্টা আমরা করসেবা (স্বেচ্ছাশ্রম) করতাম। কখনো লাকড়ি টানা, ইট বহন করা, কখনো বাঁশ টানা। বাজার অবশ্য আমাদেরকেই আনতে হতো। কখনো ২ কিলোমিটার দূরবর্তী লম্বাখোলা, কখনো পাশের পাহাড় থেকে। যেহেতু এখনকার কোয়ান্টাদের এ-কাজে হাত লাগাতে হয় না, তাই তারা আমাদের সময়ের সংগ্রামগুলোকে হয়তো ভাবতেও পারবে না। আমি কিন্তু কষ্টের কথা বলছি না। তখনকার প্রেক্ষাপট বোঝানোর চেষ্টা করছি।

প্রায়ই কোরবানি ঈদে গুরুজী ও মা-জী দাদু লামায় আসতেন আমাদের সাথে ঈদ করতে। আমার এখনো মনে পড়ে—গুরুজী দাদুর সাথে বিশেষ কায়দায় আমরা কোলাকুলি করতাম। তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন আর আমরা বেঞ্চের উপর উঠে তার গলা জড়িয়ে কোলাকুলি করতাম। মা-জী আমাদের নিজে হাতে খাবার বেড়ে খাওয়াতেন। তারা যখন বিদায় নিতেন আমরা লাইন

ধরে শুভ বিদায় জানাতাম। আর অপেক্ষা করতাম কবে আবার আসবেন।

এদিকে আমরাও বড় হতে থাকলাম, আমাদের লেখাপড়া এগোতে থাকল। ক্লাস নাইনে যখন উঠি তখন আমাদের স্কুল এসএসসি-র জন্যে রেজিস্ট্রেশন হয় নি। তাই নাইন-টেন পড়াশোনার জন্যে আমাদের তিন জনকে পাঠানো হলো রাজশাহীতে। সেখানে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারের তত্ত্বাবধানে আমাদের এসএসসি সম্পন্ন হলো। তারপর ঢাকায় একটি কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করলাম। এভাবে আমার স্কুল ও কলেজ জীবন শেষ হলো কোয়ান্টামের সাথে থেকেই।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। প্রত্যাশিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হলো না। চট্টগ্রাম কলেজে চান্স পেলাম। কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইতাম। গুরুজী দাদুকে জানালাম বিষয়টি। তিনি ঢাকায় যেতে বললেন। ঢাকায় কোয়ান্টামের বনশ্রী অফিসে আমি আইসিটি বিভাগে কাজ শিখতে শুরু করলাম। তাদের তত্ত্বাবধানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ভর্তি হলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ হলো। জানতে পারলাম আমাদের সরই ইউনিয়নে আমিই প্রথম ম্রো ইঞ্জিনিয়ার।

এখন চাকরির পালা। কিন্তু আমি কোয়ান্টামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানকার পরিবেশ ও চেতনা আমার ভালো লাগত। সেবামূলক কাজগুলো আমাকে আকৃষ্ট করত। তাই আমার পেশাজীবন এখানেই শুরু করি। এখন আমি কোয়ান্টামমে আইসিটি বিভাগে কর্মরত আছি।

পেশাজীবনের পাশাপাশি আমার স্বপ্ন মানুষের জন্যে কিছু করা। বিশেষ করে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেক পিছিয়ে আছে। আমার এলাকা নয়াপাড়ার ছেলেমেয়ে এখনো অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার আলো থেকে তারা বঞ্চিত। একদিন ভাবলাম, একজন শিক্ষককে ম্যানেজ করতে পারলে তাদের প্রাথমিক লেখাপড়াটা এখানেই শুরু করতে পারি। গুরুজী দাদুকে চিঠি লিখলাম, পাড়ায় আমি একটি স্কুল দিতে চাই। তিনি সাথে সাথেই অনুমতি দিলেন। সেই স্কুলে এখন ২৪ জন ম্রো শিশু পড়াশোনা

করছে। আসলেই বিপদে-আপদে সবসময় পাশে পেয়েছি দাদুকে।

কোয়ান্টাম শুধু এই অঞ্চলে শিক্ষা নিয়েই কাজ করছে না, বিভিন্ন সেবাকাজের মাধ্যমে এই জনপদকে আলোকিত করছে। চিকিৎসাসেবা, অসহায় বয়স্কদের জন্যে প্রবীণসেবা, গর্ভবতী মায়েদের জন্যে মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের মাধ্যমে হাজারো বাঙালি-পাহাড়ি প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এখানে। তাই এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে।

সজ্ঘকে আমি ভালবাসি। আমি বিশ্বাস করি, সাফল্য কখনো একদিনে ধরা দেয় না। কোয়ান্টামও একদিনে তৈরি হয় নি। তেমনি সফলতার গল্পগুলো একদিনে তৈরি হয় না। জীবন যত কঠিনই হোক না কেন, যারা স্বপ্ন দেখতে জানে, একদিন তারাই সফল হয়। কোয়ান্টাম যদি সেই শিশু বয়সে, কিশোরবেলায় এবং তারুণ্যে আমার হাতটা না ধরত তাহলে বিশ্বাসের কথাগুলো আজ এভাবে বলতে পারতাম না। আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারতাম না।

মা-বাবা-স্ত্রী আর দুই কন্যা নিয়েই এখন আমার পরিবার। আমার সন্তানেরা যেন বড় হয়ে মানুষের জন্যে কাজ করে এই প্রার্থনাই করি। সবকিছুর জন্যে আমি পরম স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ, কোয়ান্টামের কাছে কৃতজ্ঞ। হাজার হাজার বছর কোয়ান্টামের সেবামূলক চেতনা আরো বিস্তৃতি লাভ করুক এই শুভকামনা করি। □

মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা পেয়েছি

জ্যাকসন বড়ুয়া

শিক্ষক, রাংলাই দাংলি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলীকদম, বান্দরবান

২০০২ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে শিশুশ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। বলা যায় স্কুল যখন শুরু হয়, সেই প্রথম দিকের ছাত্র আমি। তখন স্কুলের নাম ছিল শিশুকানন। আমার খালুর হাত ধরে আমি ও আমার এক বন্ধু সেখানে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। আমার খালু বাহারাম ত্রিপুরা এই শিশুকাননে চাকরি করতেন। সৌভাগ্যবশত আমি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। কিন্তু আমার বন্ধুর হলো না।

শুরু হলো আমার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের জীবন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার পর পড়ালেখায় ভালো হওয়ায় আমাকে তৃতীয় শ্রেণিতে না পড়িয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করে দেয়া হয়। আমি লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর সপ্তম শ্রেণিতে আমাকে গাজীপুরের টঙ্গীতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এখানে বলে রাখি, কোয়ান্টাম শিশুকাননে তখনো বড় ক্লাসে পড়ানোর মতো অবকাঠামো গড়ে ওঠে নি। তাই আমাদের ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় বড়

ক্লাসে ওঠার পর বিভিন্ন স্কুলে পড়ানো হতো। দশম শ্রেণিতে রাজশাহীতে লোকনাথ হাই স্কুলে ভর্তি হই। সেখান থেকে এসএসসি পাশ করে বান্দরবানে ক্যান্টনমেন্ট কলেজে আমাকে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে প্রথম বর্ষের পর আমি লামা উপজেলায় মাতামুহুরী কলেজে চলে আসি। সেখানে এইচএসসি পরীক্ষা দেই এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকেই বিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করি।

এরপর সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দিলাম। টিকে গেলাম। শিক্ষকতায় যোগদান করলাম। ২০২০ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে পুরো পরিবারের দায়িত্ব আমার ওপর আসে। কারণ আমি বাড়ির বড় ছেলে। আমার ছোট দুই ভাইয়ের এখন আমিই অভিভাবক।

আমার ছোট দুই ভাই জ্যাকি ও জেমি। তারা দুজনেই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেছে। জ্যাকি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগে অধ্যয়ন করছে। আর জেমি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। বর্তমানে দুই ভাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ আমিই বহন করার চেষ্টা করি।

কোয়ান্টামের সেই ছোটবেলার অনেক স্মৃতি আমার এখনো মনে পড়ে। তখন আমরা যারা বড় ছাত্র ছিলাম, তারা খাবার রান্নার কাজে ব্যবহৃত শুকনো বাঁশ জঙ্গলে গিয়ে একসাথে বেঁধে আনতাম। সবাই একসাথে যে আনন্দ করতাম, তা এখনো স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে। ছুটির দিনে পাহাড়ের ঝিরিতে গিয়ে মাছ ধরতাম আর ঝিরির পাশের ঢেঁকিশাক তুলে আনতাম। রাতে রান্না করে সবাই মজা করে খেতাম।

কোয়ান্টামে সবাই যা খেয়েছে আমরাও তা-ই খেয়েছি। শিক্ষকরা আর আমরা আলাদা খেতাম না। খাবারের মেন্যু আলু ভর্তা, ডাল হলে সবাই আলু ভর্তা, ডাল খেয়েছি। পাতলা খিচুড়ি হলে সবাই তা-ই খেয়েছি।

আমার মা-বাবাও আমাকে ভালো শিক্ষাটাই দিয়েছেন। আমার মা মারা গেছেন ২০১৮ সালের ১৩ জুন, সে-সময় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাসায় কেউ যদি অসহায় অবস্থায় আসত, তার কাছে পাঁচ কেজি চাল থাকলে তিন কেজি চাল তিনি দিয়ে দিতেন। আমিও তার মতো মানবকল্যাণে আজীবন কাজ করে যেতে চাই।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সাথে আমার এখনো যোগাযোগ হয়। স্কুলে নতুন শিশু ভর্তির জন্যে আমার এলাকা আলীকদমে অভিভাবকদের সহযোগিতা করি। অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের যেন এই স্কুলে ভর্তি করায় এ ব্যাপারে

আমি তাদের উৎসাহ দেই। যাদের ফরম কেনার টাকা নেই, তাদের আমিই ফরম কিনে দেই। যতটুকু পারি কোয়ান্টামের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে মন থেকে কাজ করি। মূলত কোয়ান্টাম থেকে আমি যে শিক্ষা অর্জন করেছি সেটাই আমার ভেতরে এখনো আছে। আমি যদি বাইরে পড়ালেখা করতাম তাহলে হয়তো আমার মানসিকতা এরকম থাকত না। বাইরের পরিবেশের সাথে মিশে আমি অন্যরকম হয়ে যেতে পারতাম।

আমি ২৪৩ তম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের গ্রাজুয়েট। গুরুজী দাদুর কাছ থেকে আমি মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা পেয়েছি। আমিও মনে করি মানুষ হিসেবে জন্মেছি, তাই আমার কাজ হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এটাই নৈতিকতা। এটাই হলো মানবপ্রেম। □

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি প্রথম ম্রো ছাত্র

কাইংপা ম্রো
মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিনটির কথা মনে পড়লে আজও আমি শিহরিত হই। যেখানে পড়াশোনা করার স্বপ্ন এতদিন দেখেছি বাস্তবে সেদিন প্রথম পা দিলাম। আনন্দ ও ভয় দুটোই সমান কাজ করছিল। নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ ও নতুন পড়াশোনা। ব্যবসায় অনুষদের মার্কেটিং বিভাগে আমি ভর্তি হয়েছি। সময়মতো ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে উপস্থিত হলাম। সেখানে উপস্থিত শিক্ষক একে একে নতুন শিক্ষার্থীদের পরিচয় শুনছেন—নাম কী? কোথা থেকে এসেছি!

কয়েকজনের পরে আমার পালা। আমি দাঁড়িয়ে আমার নাম বললাম কাইংপা ম্রো। স্যার বললেন—কী? নিজের নাম আরো কয়েকবার বলতে হলো। সহপাঠীরা আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। কেউ কেউ হেসে উঠল। তাদের কোনো দোষ নেই। ম্রো সম্প্রদায়ের নামের উচ্চারণের সাথে তারা পরিচিত না। কীভাবেই বা পরিচিত হবে! আমার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ম্রো শিক্ষার্থী পড়ে নি। যদিও এই তথ্য তখন জানতাম না। জেনেছি একবছর পরে।

নিঃসন্দেহে এটা আমার সৌভাগ্য। আমার পরে আরো ছয় জন ম্রো শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। আসলে কাউকে না কাউকে তো পথ দেখাতে হয়। আমি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সুনির্দিষ্টভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম। কারণ আমার স্কুলের এক বড় ভাই বীর বাহাদুর ত্রিপুরা আমাদের স্কুল থেকে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছিল। তাহলে তিনি পারলে আমি পারব না কেন? তখন থেকেই আমার মনে বিশ্বাস জন্মাল—আমিও পারব।

আমার বাড়ি বান্দরবানের লামা উপজেলার নয়াপাড়া গ্রামে। এখানে কিছু ম্রো জনগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করে। তারা কেউই তেমন শিক্ষিত ছিল না। জুমচাষ আমাদের প্রধান পেশা। তারা অধিকাংশই পড়াশোনা করতে চাইত না বা সুযোগ হতো না। ২০০৩ থেকে ২০১৫ সাল, শিশুশ্রেণি থেকে এইচএসসি—১৩ বছর আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ছিলাম। এখন তো এই স্কুল অনেক বড় হয়েছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু আমাদের সময় আমরা হাতে গোনা কিছু ছাত্র ছিলাম।

আমার বড় ভাইও এই স্কুলে ভর্তি হয়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে আমিও এখানে আসি। আমাদের পাড়া থেকে আমার আগে চার-পাঁচ জন ছেলে এখানে পড়ত। তাই কোয়ান্টামমের প্রতি আমাদের এলাকায় একটা বিশ্বস্ততা ছিল। এর আরেকটি কারণ আছে। গুরুজী দাদু আমাদের গ্রামে এসেছিলেন ১৯৯৮ সালে। যদিও আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। ছবিতে দেখেছিলাম আমাদের পাড়ার কয়েকটি শিশুর সাথে তিনি এক বেঞ্চে বসে আছেন।

আমার মা জুমচাষী ছিলেন। দিনে কাজ করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। আমি আর আমার বড় ভাই ঘরের ভাঙা জানালা দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মায়ের সাথে কাটানো এই স্মৃতি এখনো আমার চোখে ভাসে। শিশুবয়সেই মনে হতো বড় হয়ে মায়ের সব কষ্ট দূর করে দেবো। কিন্তু সেই শৈশবেই আমরা আমাদের মাকে হারাই।

কোয়ান্টামম থেকে ছুটিতে আমি এবং বড় ভাই বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি মা খুব অসুস্থ। যেন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। আমরা বাড়ি পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর আমার বড় ভাইও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। আমার ছোট তিন বোন আর আমি একা হয়ে গেলাম। আমি ফিরে গেলাম কোয়ান্টামমে। এখনো মায়ের কথা মনে পড়লে চোখে জল চলে আসে।

২০১৪ সালে ঢাকায় স্বাধীনতা কাপ খো খো-তে আমাদের দল চ্যাম্পিয়ন হয়

তারপর চলতে থাকল আমার পড়াশোনা। স্যারদের থেকে জানতে পেরেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করার পর জানতে পারি, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়তে চাই সেখানে ভর্তি হতে প্রয়োজন অনেক পরিশ্রম আর মনছবি। এই মনছবি শব্দটা আমার অভিধানে ছিল না। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের শিক্ষা আমাকে সাহায্য করল। গুরুজী দাদুর *আত্মনির্মাণ* বইটি আমার জীবন বদলে দিয়েছে। বইটিতে সার্কাসের হাতির গল্প আছে, সেটা আমার খুব ভালো লাগে। অবিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে বের হওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায় এই গল্প থেকে।

তারপর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরের দিন থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলাম এই প্রত্যয়ন নিয়ে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে চান্স পেতেই হবে। একমাত্র বিশ্বাসই ছিল তখন মূলধন। একটানা তিন মাস রাতদিন এক করে শুরু হলো পড়াশোনা। আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন ভর্তি পরীক্ষা দিতে রওনা হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে তার আগের দিন রাতে সারারাত জেগে প্রার্থনা করেছিলাম। আমার মনে হয় সেদিন আমি একা নয় কোয়ান্টাম পরিবারের হাজারো সদস্য আমাদের জন্যে রাত জেগে দোয়া করেছিলেন।

আমার বাবা আমাকে নিয়ে এখন গর্ববোধ করেন। অনেক সময় এরকম হয় যে, এলাকায় বাবা একজনকে আমার বিষয়ে কিছু বললেন, সবকিছু বলার পরে সেই ব্যক্তি আমার বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কী জিনিস? আসলে আমাদের এলাকায় অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই শোনেন নি। আমি কোয়ান্টামে না থাকলে এ সম্মান পেতাম না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর আমার রেজাল্ট বরাবরই ভালো হচ্ছে। আমি কিন্তু আহামরি বেশি পড়ি না। আমি যখন পড়ি তখন মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আমার চারপাশে কে ঘুমাল, কে খেলাধুলা করল তা দেখি না।

আমাদের এসময় শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্মার্টফোন। কারণ পড়ার সময় মোবাইল বেজে উঠলেই পড়ালেখা শেষ। আমি পড়ালেখা করার সময় মোবাইল ফোন বন্ধ রাখতাম। পরীক্ষার দুই সপ্তাহ আগে একটা রুটিন তৈরি করে পড়া শুরু করতাম। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে চলে যেতাম। তাই এমবিএতেও ভালো রেজাল্ট হয়েছে।

কোয়ান্টাম আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে। এখান থেকে সবচেয়ে বড় শিক্ষা পেয়েছি অসাম্প্রদায়িকতার। শুধু আমি না, কসমো স্কুলের প্রতিটি কোয়ান্টাই অসাম্প্রদায়িক। ক্যাম্পাসে একত্রে পাহাড়ি-বাঙালি মিলিয়ে ২২ জনগোষ্ঠীর বসবাস, যা বাংলাদেশে শুধু নয়, বিশ্বে বিরল।

সাধারণত দেখেছি একসাথে অনেক জাতি থাকলে নিজেরা নিজেরা সংগঠন তৈরি করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন আছে। কিন্তু কসমো স্কুলের ক্যাম্পাসে এ ধরনের কোনো সংগঠন বা টিম নেই। এখানে সব পাহাড়ি-বাঙালি সমান। আলাদাভাবে কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় না। কারণ মানুষের সর্বপ্রথম পরিচয় সে মানুষ। তারপর অন্য কিছু। এটাই আমার জীবনে বড় একটি শিক্ষা।

আমি আমার ছোটবেলার বন্ধুদের খুব মিস করি। সবার সাথে করা সেই দুরন্তপনাও খুব অনুভব করি এখন। আমার মনছবি আমি আমার জাতিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করব। ম্রো জাতির মধ্যে এখনো কোনো বিসিএস ক্যাডার নেই। তাই আমি প্রথম বিসিএস ক্যাডার হয়ে আমার সম্প্রদায়ের নাম উজ্জ্বল করতে চাই। □

কোয়ান্টাম আমাকে শিখিয়েছে ‘সব সম্ভব’

শরিফুল ইসলাম

ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

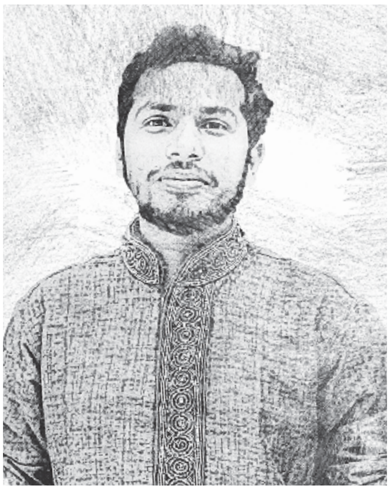

২০০৩ সাল। বয়সটা পাঁচ পেরিয়ে ছয় ছুঁই ছুঁই করছে। একদিন রাতে বাসায় আব্বু একটি বার্তা নিয়ে বেশ তোড়জোড় শুরু করেছেন। বার্তাটি হলো আমাকে কোনো একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিবেন। খবরটি নিয়ে আমার তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। একদিন আব্বু সত্যিই আমাকে সকালে ঘুম থেকে উঠিয়ে কোথায় যেন রওনা হলেন। অনেকটা পথ চাঁদের গাড়িতে পাড়ি দেয়ার পর জানতে পারলাম গাড়ি আর সামনে যাবে না, বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে। পাহাড়ি রাস্তা, আঁকাবাঁকা পথ, জঙ্গল পেরিয়ে অনেকক্ষণ পর অবশেষে একটি বেড়ার ঘরের সামনে এসে পৌঁছালাম, সেখানে এখন কোয়ান্টামমের মারহামান হল। সেখানে আমার মতো অনেকেই এসেছে। ভর্তি পরীক্ষা চলছে। ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। চান্স পেলাম। ভর্তিও হয়ে গেলাম। আমার রাগ হলো আব্বু-আম্মুর ওপরে। মোটামুটি নিশ্চিত যে, তারা আমাকে এটা-সেটা বুঝিয়ে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে, নয়তো বিক্রি করে দিয়ে গেছে।

আমি বাসায় থাকতে খুব বাংলা ছায়াছবি দেখতাম। সেখানে বাংলা ছবির নায়ক ছোটবেলায় কোথাও হারিয়ে গেলে বাসার কোনো একটা জিনিস স্মৃতি হিসেবে তার পকেটে বা ডায়েরিতে রেখে দিত। যাতে বড় হয়ে বাবা-মাকে খুঁজে বের করতে পারে। আমি যেহেতু নিশ্চিত ছিলাম যে, আমাকে আর আব্বু-আম্মু নিতে আসবেন না, তাই বড় হয়ে খুঁজে বের করার জন্যে আমার বাম হাতের বাহুতে আম্মুর দেয়া একটা কাপড় বেঁধে রেখেছিলাম। কয়েকদিন পর সেই কাপড় কোথায় যে খুলে পড়ে গেছে তা আর আমার খেয়াল নেই। একদিন দেখি আব্বু এসে হাজির। তখনি আমার বাংলা সিনেমার পুরো কাহিনী সেখানেই ধুলিসাৎ হয়ে গেল।

২০০৩ সালের কোয়ান্টাম শিশুকানন আর ২০২২ সালের কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজকে যখন মেলাতে যাই তখন গর্বে হৃদয়টা ভরে যায়। গুরুজী দাদুকে দেখেছি আমাদের সাথে সেই শিখর (বর্তমানে সেলিমান) থেকে কামরুল চত্বর (সৈয়দ হক মঞ্চ) পর্যন্ত কাঁধে করে ইট টানতে, দেখেছি বস্তায় করে বালি টানতে, মাটি কাটতে।

আবাসনের কথা বলতে গেলে বলতে হবে প্রথম অবস্থায় হাসপাতাল, সিস্টারদের আবাসন, কোয়ান্টাদের আবাসন এই তিন একসাথে মিলে ছিল শিশুকানন-১ এবং বর্তমান হংস লেক ছিল শিশুকানন-২। শিশুকনন-২ আবাসনে কিছুদিন উপরে থাকত কোয়ান্টারা আর নিচে থাকত রাজহাঁস। খুব মজা হতো। রাজহাঁসের প্যাক প্যাক আওয়াজ আর গায়ের গন্ধে কোয়ান্টারা ঘুমের এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে যেত। সে এক স্বর্গীয় সুখ। এরপর ২০০৩ সালে তৈরি হলো নুর হল। প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম স্যারের নামে নুর হল। আমরা সবাই তখন একসাথে সেখানে থাকতে শুরু করলাম। ২০১১ সালে ইকরানে, ২০১৩ সালে গিরি ফিকরানে এবং ২০১৫ সালে ভ্যালি কুরবানে আমাদের ক্যাম্পাস স্থানান্তরিত হয়। কারণ কোয়ান্টাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছিল।

বর্তমান কোয়ান্টাদের প্রতিদিন একটা করে সেদ্ধ ডিম, সয়া দুধ, নিয়মিত মাছ-মাংস দেয়া হয়। তবে প্রথমদিকে আমাদের অর্ধেক ডিম সেদ্ধ দেয়া হতো। বর্তমান সময়ের মতো এত প্রাচুর্য আমরা তখন পাই নি। যদিও পরে আমরাও প্রতিদিন একটা করে ডিম খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। শুক্রবারে সকালে খেয়ে খেলতে বের হয়ে একেবারে বিকেলে ফিরত আমাদের কিছু ছাত্র। তবে শুক্রবারে আমাদের বিশেষ একটা কাজ ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এরপর

সবাই মিলে মাছ ধরতে আর ঢেঁকিশাক তুলতে যেতাম। সেগুলো আবার রান্নাবান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেয়া হতো। প্রতিদিন বিকেলে নাশতা দেয়া হতো। যার মধ্যে অন্যতম ছিল নুডুল্‌স, লাচ্ছা সেমাই, সুজি ইত্যাদি। আমার পছন্দের নাশতা ছিল লাচ্ছা সেমাই।

যারা হাসপাতালে ভর্তি থাকত তাদের একটু ভালো খাবারদাবার দেয়া হতো। বিশেষ করে প্রতিদিন সকালে ওষুধ খাওয়ার জন্যে ডিমের সাথে ফুলকলির বিস্কুট, যেটা আমার অসম্ভব ভালো লাগত। আমি একবার ইচ্ছে করে 'আমার জ্বর হয়েছে' এই বাহানায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম প্রিয় খাবার খেতে পাওয়ার জন্যে। দুই দিন পর যখন বুঝতে পারলাম সিস্টার আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন আবার অসুস্থের অভিনয় করলাম। তাতেও কোনো লাভ হলো না। শেষে আমাকে হাসপাতাল থেকে বের করে দিল, তোমার কিছু হয় নি এই বলে।

যতদূর মনে পড়ে, 'কোয়ান্টা' শব্দটি নতুন সংযোজন হয় ২০০৮ সালে। আমার আইডি ছিল এন-থ্রি। স্টিকারে লেখা থাকত আইডি নম্বর। স্টিকারগুলো যার যার আইডি অনুযায়ী তার কাপড়ের সাথে সেলাই করে দেয়া হতো, যাতে কোনটা কার কাপড় তা খুঁজে বের করা যায়। তারপর নতুন করে কোয়ান্টা নম্বর দেয়া হয় যেখানে আমার কোয়ান্টা নম্বর হয় ৩৫।

বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম ছিল বাংলা ছায়াছবি। তখন বিটিভিতে নিয়মিত বাংলা ছায়াছবি সম্প্রচার করা হতো। আমরা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম কখন ছায়াছবি শুরু হবে। সে এক অন্যরকম অনুভূতি। সাদাকালো টিভি। ঝিলমিল করত সবসময়। একটু পর পর একজনকে গিয়ে এন্টেনা ঘুরাতে হতো। তবুও এটা ছিল আমাদের আবেগের একটা জায়গা। আরেকটি বিনোদনের মাধ্যম ছিল মার্বেল খেলা। সারা বিকেল মার্বেল খেলতাম। আবার কেউ কেউ ক্রিকেট, ফুটবল খেলত। রাবারের আঠা নিয়ে বানাতাম ক্রিকেট বল, সিমেন্টের বস্তা দিয়ে বানাতাম ফুটবল।

লামাতে অনেক ধুপ গাছ আছে। একটা সময় নিয়ম ছিল এক কেজি ধুপ সংগ্রহ করে দিতে পারলে একটি টেনিস বল পাওয়া যেত। সন্ধ্যাবেলায় সেই ধুপ জ্বালানো হতো মশা তাড়ানোর জন্যে।

স্কুলে প্রথমবারের মতো কোনো স্পোর্টস হিসেবে খো খো খেলার পথচলা শুরু হয় আমাদের ব্যাচের মাধ্যমে। প্রথমবারের মতো ২০০৯ সালে খো খো খেলায় জাতীয় পদক অর্জন করি আমরা। সেই হিসেবে আমার ইভেন্ট ছিল খো

খো। এরপর আরো কিছু নতুন ইভেন্ট যুক্ত হলো স্কুলে। একসময় ক্রীড়ায় দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হলাম আমরা।

পড়াশোনায়ও পিছিয়ে ছিলাম না। আমাদের ব্যাচ দিয়েই শুরু হলো ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টের প্রস্তুতি। মজার বিষয় হলো, যে ক্লাসরুমে বসে প্রস্তুতি নিয়েছি সে ক্লাসরুমে কোনো ফ্লোর ছিল না। আমরা ইট বিছিয়ে ফ্লোর তৈরি করে প্রস্তুতি নিয়েছি। অবশেষে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে চান্সও হলো প্রায় সবার। আজ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে অনার্স সম্পন্ন করেছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার বিভাগে প্রথম হয়েছি।

শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনেও কীভাবে সফলতার স্বাক্ষর রাখা যায়, তারও শিক্ষা পেয়েছি স্কুলে। এজন্যেই ইউনিভার্সিটিতে আমার ক্লাসে আমি ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভের দায়িত্ব পালন করি।

ছোটবেলা থেকে খো খো খেলার সাথে সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠার কারণে *খো খো খেলার আদ্যোপান্ত* নামে আমার লেখা একটি বই ২০২২ সালে প্রকাশ করেছি। এরপর *ওয়ার্ম আপ স্ট্রেচিং ও কুল ডাউন* এবং *পিটি প্যারেড ড্রিল* বই দুটি প্রকাশ করি। বই প্রকাশের অনুপ্রেরণা আমি কোয়ান্টাম থেকেই পেয়েছিলাম। কোয়ান্টাম আমাকে শিখিয়েছে—সব সম্ভব। আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে আমি জীবনযাপনের ব্যাকরণ ও একটি শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পেয়েছি। আমি এমন কিছু শিক্ষা পেয়েছি যা পৃথিবীর অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাকে দিতে পারত না।

আমি কোয়ান্টামের সেবামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছি। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা দাফন টিমের আমি একজন সক্রিয় স্বেচ্ছাসেবক অর্থাৎ কোয়ান্টিয়ার। আমার জীবনের শেষ চাওয়া, আমি যাতে সারাজীবন এই স্কুলের সাথে থাকতে পারি। কোয়ান্টামের সাথে থাকতে পারি। □

স্বপ্ন দেখি বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ

মিল্টন বম

স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ, পাঞ্জাবি ইউনিভার্সিটি, ভারত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ থেকে অনার্স শেষ করে এখন ভারতের পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে পড়াশোনা করছি। বান্দরবানের রোয়াংছড়ির রৌনিন পাড়ায় আমার বাড়ি। বেশ দুর্গম এলাকা। সেখানে প্রায় শত বম পরিবারের লোকেরা বসবাস করে। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে আমার পূর্বপুরুষেরা সেখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

এই গ্রামে এখন পর্যন্ত আমিই একমাত্র দেশের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। শুধু তা-ই নয়, আমিই প্রথম এই গ্রাম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র। আমার কোয়ান্টামে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত এই গ্রাম থেকে আরো আট জন শিশু-কিশোর কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে পড়ছে। গ্রামের মানুষেরা এখন স্বপ্ন দেখে, এরাও আমার মতো পড়াশোনা করবে। আমি স্বপ্ন দেখি, তারা আমার চেয়ে আরো এগিয়ে যাবে।

কিন্তু শুরুর চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ২০০৪ সালে ভর্তি হয়েছিলাম কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। বয়স তখন সাত বছর বা তারও কম হবে। প্রথমে আমাকে শিশুশ্রেণিতে ভর্তি করানো হয়েছিল। কিছুদিন পর ক্লাস ওয়ানে উঠিয়ে দেয়া হলো। যেহেতু ক্লাস ওয়ানের পড়ালেখা আমার আয়ত্তে ছিল, তাই ঐ বছরই ক্লাস টু-তে দেয়া হলো।

ভর্তি পরীক্ষার সময় বাবা আসতে পারেন নি। আমার চাচার সাথে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। আমরা একসাথে পাঁচ জন এসেছিলাম ভর্তি পরীক্ষা দিতে কিন্তু ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম দুই জন।

আমার স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বল করছে সেই সময়টা। বাসা থেকে কীভাবে রওনা দিলাম আর রাস্তায় ভ্রমণের সময়গুলো এবং কসমো স্কুলে পৌঁছানোর পর শিক্ষক, স্টাফ আর ছাত্রদের মুখগুলো আমার স্মৃতিতে এখনো সুস্পষ্ট।

আমার বাবা-মায়ের একটাই চাওয়া ছিল। ছেলে পড়ালেখা শিখে শিক্ষিত হবে, পরিবার ও সমাজের আশা পূরণ করবে। পরিবারের অগাধ ভরসা ছিল—আমি কসমো স্কুলে ভর্তি হলে মানুষের মতো মানুষ হতে পারব। সঠিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা অর্জন করতে পারব। কালক্রমে এই চিন্তা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হলো।

কলেজের পড়া শেষ করলাম ২০১৫ সালে। ২০০৪-২০১৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এক যুগ ছিলাম কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে। এই ১২ বছর আমার জীবনের বেশ কিছু স্মরণীয় সময় পার করেছি। বিশেষ মুহূর্তগুলোর মধ্যে চমৎকার ব্যতিক্রমী ঘটনাও কম ছিল না। যেমন কোনো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে দিনরাত পরিশ্রম করা, ছোট-বড় সাফল্য অর্জন, শিক্ষক-কর্মী বা পরিচিত কারোর সাথে খুবই আনন্দময় মুহূর্ত কাটানো ইত্যাদি। কোয়ান্টামের সাথে আমি এখনো আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার লেখাপড়ার পরে বাকি সময়টা আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারে থাকতাম, সেখানে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি ও দাফন কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছি। যখন কারো রক্তের প্রয়োজন পড়েছে, তখন আমি রক্ত সংগ্রহের জন্যে যোগাযোগ শুরু করেছি। এটা আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজ। মানবসেবার এই বহুমুখী কার্যক্রমের সাথে থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

ছোটবেলা থেকে আমার ভেতরে একটা বিষয় খুব নাড়া দিত। সেটা হলো কারো কল্যাণে কাজ করতে পারলে যেন আমি অন্তরে তৃপ্তি পেতাম। আর ভালো মানুষের সংস্পর্শে গেলে আমি আরেকটু নিরাপত্তা অনুভব করতাম। তাই

ছোটবেলা থেকেই স্বেচ্ছাসেবামূলক যে-কোনো কাজে আমি সবসময় এগিয়ে থাকার চেষ্টা করতাম। ছবিটি আমার ছোটবেলার। স্কুলে কোনো এক ফল উৎসবে বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্যে দুহাতে তরমুজ নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। পেছনে বন্ধু রিংইয়ং ম্রো। সে এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

আমার মেধা ও শ্রম দিয়ে আমি দেশের মানুষের পাশেই থাকতে চাই। আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করছি যে, সৎসঙ্ঘ মানুষকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করে আরো বেশি। সৎসঙ্ঘ মানুষের গুণাবলিকে বিকশিত করতে সহযোগিতা করে। আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কেন, এই সৎসঙ্ঘ কোয়ান্টামের সাথে থাকতে চাই। ভারতে মাস্টার্স ডিগ্রি নেয়ার পরে, পিএইচডি সম্পন্ন করতে চাই। পরিবার, সমাজ, সঙ্ঘ, গুরু ও দেশকে ভালবেসে এগিয়ে যেতে চাই।

স্বপ্ন দেখি বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং দেশের সর্বস্তরের মানুষ মর্যাদার সাথে সমানভাবে কাজ করছে। আমি মনে করি, দেশ কতদূর এগিয়ে গেল আর কতটুকু উন্নতি লাভ করল এটা নির্ভর করে প্রান্তিক মানুষেরা কতটুকু নাগরিক সুবিধা পাচ্ছে সেটার ওপর। কারণ আমি নিজেই প্রান্তিক এলাকা থেকে উঠে এসেছি। এই মানুষগুলো অনেক সরল। তাদের নিয়েও যেন কাজ করতে পারি এই প্রত্যাশা রাখি নিজের প্রতি। □

ভালো ছাত্র হওয়ার চেয়ে ভালো মানুষ হওয়া বেশি প্রয়োজন

লেংঙি ম্রো
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমার অব্যক্ত কথা

কলেজে পড়ার সময় প্রায়ই চিন্তা করতাম—কোয়ান্টাম আমার পেছনে এত টাকা খরচ করছে, আমি কেমন করে সেটা শোধ করব? কোয়ান্টামের প্রতি আমার যে ঋণ, সেটা অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য নয়। কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে সেই ঋণের রিটার্ন দিতে হবে। যখন একাকী থাকতাম তখন এ বিষয়গুলো আমার মনে চিন্তার উদ্রেক ঘটাত।

আমি স্বভাবগতভাবে একটু চিন্তা করতে ভালবাসি। কেননা আমি উপলব্ধি করেছি, আমি যখন কোনো বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি তখন কোনো না কোনো প্রশ্নের সমাধান, নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া পেয়েছি। বলতে পারেন এটা মেডিটেশনের ইফেক্ট। যা-হোক, দিনকয়েক এসব বিষয়ে চিন্তা করার পরে আমার বোধোদয় হয়। আমি বুঝলাম, ভালো মানুষ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ভালো ছাত্র হওয়ার চেয়ে ভালো মানুষ হওয়া অধিকতর প্রয়োজন। কোয়ান্টামের মূল শিক্ষা এটাই। ভালো মানুষ হতে হবে। আমি তখন মনস্থির করলাম—সুযোগ পেলে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসব। তাহলে কোয়ান্টামের প্রতি আমার যে ঋণ রয়েছে সেটা কিছুটা হলেও শোধ করতে পারব।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গ

আমি চিন্তা করলাম, মানুষের জন্যে কাজ করতে গেলে নিজের একটা অবস্থান থাকা প্রয়োজন। আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাই তাহলে ফিরে গিয়ে জুমচাষ করতে হবে। তাই আমাকে যে-কোনো মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নবম-দশম শ্রেণিতে কিছুটা ধারণা পেয়েছিলাম। কিন্তু চান্স পেতেই হবে এমন মনোবল তখনো তৈরি হয় নি। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ার সময় ঢাকা থেকে কোয়ান্টামের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আমাদের কলেজে এসে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে যেতেন। তাদের অনুপ্রেরণামূলক কথা শুনলে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যেত। এমনভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে যেতাম, মনে হতো যেন দিনরাত পড়াশোনা করি।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজির গুরুত্ব বুঝাতে ইমরান ভাই (কোয়ান্টামের স্বেচ্ছাসেবক) আমাদের প্রতিদিন ইংরেজিতে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং চর্চা করা আর ভোকাবুলারি শেখার পরামর্শ দিয়েছেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি টানা তিন মাস ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং চর্চা করতাম। আর ইংরেজি শব্দ খাতায় লিখে লিখে মুখস্থ করতাম। আমার কাছে এসব কাজ বিরক্তিকর লাগত না; বরং উপভোগ করতাম।

আমি ক্লাস সেভেন থেকে *রিডার্স ডাইজেস্ট*, *কারেন্ট ওয়ার্ল্ড* পড়ে এসেছি। যার ফলে ইংরেজি আমার কাছে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় সহজ লাগত আর সাধারণ জ্ঞান পড়তে খুব ভালো লাগত। যে কথাটা না বললে সারাজীবন আক্ষেপ রয়ে যাবে সেটা হচ্ছে—নবম শ্রেণির শুরুতে আমাদেরকে হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট মানে ব্যবসায় শিক্ষা ধরিয়ে দেয়া হলো। আমার খুব ইচ্ছে ছিল সায়েন্সে পড়ার। কিন্তু সেটা হয় নি। স্কুলে তখন সায়েন্স ছিল না।

কর্মাস থেকে পালানোর জন্যে এইচএসসি-র পরে মনস্থির করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মাসের সাবজেক্ট নিয়ে পড়ব না। যেই ভাবা সেই কাজ। এইচএসসি পরীক্ষার পর আমরা খুব সম্ভবত তিন বা সাড়ে তিন মাসের মতো

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেয়েছিলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আগের ব্যাচের বড় ভাইয়েরা চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং করেছিলেন। আমাদেরকে চট্টগ্রামে নিয়ে যায় নি, তাই আমরা শুরুর দিকে খুব মন খারাপ করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৌ চান্স পাব কিনা এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতাম আর মন খারাপ করতাম। যা-হোক, সৃষ্টিকর্তার নামে প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলাম। সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে ও সকলের দোয়ায় আমি চান্স পেলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে।

আমার নিজস্ব কোচিংয়ের যাত্রার গল্প

তখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। ২০১৭ সালের জুলাই মাসের ১৭ তারিখ। সেদিন বিকেলে মেসে গিয়ে দেখি আমাদের রুমে চার জন অতিথি। তারা সবাই ম্রো জনগোষ্ঠীর। তারা আমার রুমমেটদের সাথে আলাপ করছিল। তাদের সাথে আলাপে যোগ দিয়ে জানতে পারলাম তারা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিংয়ের জন্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এসেছে। ক্যাম্পাস থেকে শহরের কোনো একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবে। চট্টগ্রাম শহরের ব্যাপারে তাদের আইডিয়া কম।

তাই তাদের বললাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরের দূরত্ব প্রায় ২২ কিলোমিটার। ক্যাম্পাস থেকে প্রতিদিন কোচিংয়ে যাওয়া-আসা করা কষ্টকর হবে। পড়াশোনা করার সময় পাবে না। সব মিলিয়ে তোমাদের জন্যে খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে। আমার কথা শুনে তারা চিন্তিত হয়ে যায়। তাদেরকে বললাম, তোমাদের দুইটা অপশন দেবো। তোমরা শহরে গিয়ে কোচিং করতে পারো। অথবা তোমরা যদি চাও আগামীকাল থেকে আমার কাছে পড়তে পারো। এটার জন্যে আমাকে কোন সম্মানী দিতে হবে না। ফ্রি-তে পড়াব। একথা বলে তাদেরকে ১০ মিনিট ভাবার সময় দিলাম। ১০ মিনিট চিন্তাভাবনা করার পরে তারা জানায় আমার কাছে পড়বে।

আমি তাদেরকে নিয়মকানুন বলে দিলাম। প্রস্তুতির কলাকৌশল শিখিয়ে দিলাম। শুরুতে চার জন হলেও পরে আরো তিন জন তাদের সাথে যোগ দেয়। মোট সাত জন ছাত্রকে নিয়ে প্রফেশনালি কোচিং জগতে আমার পদার্পণ। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় সাত জন থেকে পাঁচ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়।

তাদের চান্স পেতে দেখে আমার কনফিডেন্স আরো বেড়ে যায়। এরপরের বছর প্রায় ১৫ জনকে পড়াই। এদের মধ্য থেকে ২/৩ জন পারিবারিক সমস্যার

কারণে বাড়িতে চলে যায়। সেই বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে ১০ জন চান্স পায়। এরপর এটা নিয়ে 'সারাবাংলা' নিউজে আমি একটি সাক্ষাৎকার দেই। সেই সাক্ষাৎকারটা অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আমার উদ্যোগের ব্যাপারে জানতে চান, আমার গল্প শোনার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মূলত তখন থেকে আমার পরিচিতি বাড়তে শুরু করে। দেখা গেছে ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষার ভাইভাতেও স্যারেরা একাডেমিক প্রশ্ন যতটা না জিজ্ঞেস করেন, তার চেয়ে আমার কোচিং কেমন চলছে, কতজন চান্স পেয়েছে এসব ব্যাপারে জানতে চান।

কোচিংয়ের বাইরে পরিচিতদের রেফারেন্স ছাড়া আলাদাভাবে আমি কাউকে পড়াই নি। কোচিং থেকে মোট ৫২ জন শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে সক্ষম হয়েছে, যা আমার জীবনের সেরা অর্জনগুলোর মধ্যে একটি। আমার এসব অর্জনের পেছনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অবদান অনস্বীকার্য। কেননা ফাউন্ডেশন না থাকলে আমি কিছুই হতাম না। আমার আইডেন্টিটি সৃষ্টি হতো না।

নিজেকে যে জায়গায় দেখতে চাই

অনার্স থার্ড ইয়ার পর্যন্ত আমার ইচ্ছে ছিল উচ্চশিক্ষার জন্যে ইউরোপে পাড়ি জমাব। প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম। ইউরোপে যাওয়ার জন্যে থার্ড ল্যাংগুয়েজ হিসেবে স্প্যানিশ ভাষাও প্রায় তিন মাস রপ্ত করার চেষ্টা করেছিলাম।

এরপর অনেক ভেবেচিন্তে মনস্থির করলাম স্কলারশিপের জন্যে চেষ্টা করব না। দেশেই থাকব। বিসিএস দেবো, একজন ভালো সরকারি কর্মকর্তা হবো। এখন সেই পথেই আছি। জানি না এই পথের শেষ কবে হবে। চেষ্টা চলছে, চলবে। □

অন্যের থেকে নেয়ার চেয়ে দেয়াতেই শতগুণ বেশি আনন্দ

জ্যাকি মার্মা
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

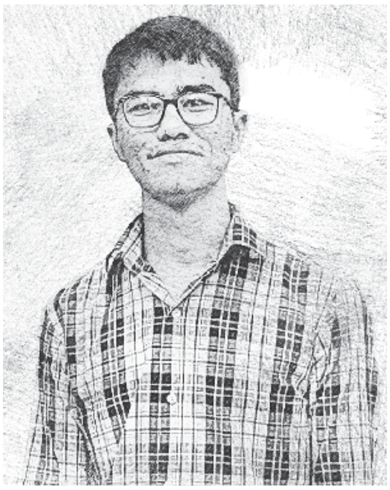

২০০৩ সাল। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার বলতে গেলে শুরুর দিকেই বাবা-মা আমাকে ভর্তি করিয়ে যান। স্কুলের তখন একচালা ছনের ঘর। এসব দেখেও আমার বাবা-মা ভরসা করেই কোয়ান্টামের হাতে আমাকে দিয়ে যান। আশা ছিল তাদের সন্তান এখানে থাকলে সত্যিই একদিন শিক্ষিত হবে, ভালো মানুষ হবে।

মাত্র চার বছর বয়সেই এখানে ভর্তি হয়েছিলাম। যে বয়সটা মায়ের কোলে, মায়ের ভালবাসা মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকার কথা—সেই বয়সেই কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়েছি। মায়ের অভাবটা অনুভব করলেও খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠেছিলাম। স্কুলে ও ছাত্রাবাসে শিক্ষক, শিক্ষিকা, সিস্টার, হলের দায়িত্বশীলদের ভালবাসা-মায়া-মমতায় ঘিরে থাকত আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। পেছন ফিরে তাকালে একটু অবাক লাগে, ২০০৩ সালে শিশুশ্রেণিতে ভর্তি

হওয়া সেই শিশু জ্যাকি আজ দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই সংগ্রাম, জীবনের এই যাত্রাটা মোটেই সহজ ছিল না।

বাবা-মা এবং তিন ভাই নিয়ে আমাদের ছোট পরিবার। বাবা জমিতে কাজ করতেন। কখনো বেকার থাকতেন। বেশিরভাগ সময় কাজের সন্ধানে থাকতেন। বাবা মৃত্যুর আগে ছোট একটা দোকানে বসে ব্যবসা করেছেন। আর বাবার সাথেই জমিতে কাজ করতেন আমার মা।

২০০৩ সাল থেকে ২০১৬, এই দীর্ঘ ১৩ বছরের পুরো সময়টা অতিবাহিত হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে। ২০১৪ সালে আমি এসএসসি-তে কসমো স্কুল থেকে প্রথম গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি। তারপর ২০১৬ সালে কসমো কলেজ থেকে ভার্সিটি কোচিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে মেধাতালিকায় ১৬৮ তম হয়ে শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছি। বর্তমানে সেখানেই মাস্টার্সে (২০২৩) অধ্যয়নরত আছি।

আমার জীবনে বেশিরভাগ কৃতিত্ব ও সাফল্য সবই অর্জিত হয়েছে এই স্কুলের কল্যাণে। এখানেই শিখেছি কীভাবে নিজেকে এবং সমাজকে পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের এই সমাজ পরিবর্তনের জন্যে যে-সব শিক্ষা দরকার সবই শিখেছি এই প্রতিষ্ঠানে এসে। উদার মানসিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, পরের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার প্রচেষ্টা—সবই শিখেছি দীর্ঘ ১৩ বছর কোয়ান্টামে শিক্ষালাভের মাধ্যমে।

২০০৯ সালে যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি, তখন ঢাকায় ২৮৭ তম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এটাই আমার জীবনে চলার পথে এক স্মরণীয় দিন। জীবনকে জানা, নিজেকে চেনা, রাগ-ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা, জীবনের মনছবি দেখা, মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে যে আনন্দ তা জেনেছি, শিখেছি এই মেডিটেশন কোর্স করে। এজন্যে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যাব আমার গুরুজী দাদুর প্রতি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এবং এর আত্মিক অভিভাবকদের প্রতি।

সালটা হয়তো ২০০৮-এর দিকে, ঠিক মনে পড়ছে না। ছালেহ আহমেদ স্যার ঢাকা থেকে আমাদের কসমো স্কুলের দায়িত্বে বদলি হয়ে এসেছেন। এই মানুষটার কাছে আমি ঋণী হয়ে থাকব। একজন শিক্ষকের প্রধান সাফল্য হলো ছাত্রের মধ্যে লুকায়িত সুপ্ত প্রতিভা ও মেধাকে বিকশিত করা। তিনি তা পেরেছিলেন বলেই আজ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছালেহ স্যারের

২০১৫ সালে জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় আমাদের ব্যান্ডের দলনেতা ছিলাম আমি

ছায়ায় কাটানো আমার শৈশব আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

কোয়ান্টাম আমাকে সবসময় নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন ও মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা শিখিয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ জাগ্রত করতে শিখিয়েছে। অন্যের থেকে নেয়ার চেয়ে দেয়ার মধ্যে শতগুণ বেশি আনন্দ উপভোগ করা যায়। এই মহৎ উপদেশটি আমি আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

আমি, আমার বড় ভাই এবং ছোট ভাই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমাদের দায়িত্ব কোয়ান্টাম নিয়েছিল বলেই আমরা তিন জনই আজ বড় স্বপ্ন দেখি। সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারার জন্যে বিশেষভাবে ফাউন্ডেশনের সকল আত্মিক অভিভাবকদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের একটু আন্তরিকতা, মমতা, ভালবাসায় বেড়ে উঠুক আমার মতো আরো হাজারো, লাখো বঞ্চিত শিশু। □

এখানে না এলে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হতো না

মংহ্লাচিং চাক
আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার চাক হেডম্যান পাড়া থেকে ২০০৪ সালে পাঁচ কি ছয় বছর বয়সে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন কোয়ান্টামমের আশেপাশে পুরোটাই জঙ্গল আর অনুন্নত হলেও আমার বাবার বন্য জন্তু, ডাকাত ও ছেলেধরার ভয় ছিল না। তার কেবল ভরসা ছিল—আমি যাদের কাছে আমার ছেলেকে তুলে দিচ্ছি, তারা খুবই ভালো এবং পিতা হিসেবে যা দিতে পারব না এরা হয়তো পারবে। কারণ বাবার স্বপ্ন ছিল তার ছেলে পড়ালেখা করবে আর উচ্চশিক্ষিত হয়ে বড় কিছু করবে।

আমি শিশুশ্রেণিতে স্বল্প সময়ের জন্যে ছিলাম। কিছুদিন পরেই আমাকে প্রথম শ্রেণিতে নেয়া হয়। ২০০৪ সালে আমরা প্রথম তিন জন চাক সম্প্রদায়ের ছেলে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। তবে পরিবেশ-পরিস্থিতির সমস্যা মনে হওয়ায় একজন বাড়ি চলে যায়। ছাচিংঅং আর আমি দুজন থেকে যাই। স্বাভাবিকভাবেই চাক ভাষাভাষীর কেউ না থাকায় বাংলা ভাষা বুঝিয়ে

দেয়ার কেউ ছিল না। বাংলা পারতাম না বিধায় সবকিছুতে একটা ভয় কাজ করত। কার সাথে কী বলব, কীভাবে চলব এসব নিয়ে। সবকিছুতে বড় একটা শূন্যতা আর অভাব অনুভব করেছিলাম সে-সময়ে।

সিস্টাররা আমাকে অনেক বেশি সহযোগিতা করেছিলেন। তারা আমাকে যথেষ্ট মমতা দিয়ে দেখভাল করেছিলেন। এভাবে আস্তে আস্তে বাংলা শিখে নিই এবং অন্য কোয়ান্টাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশতে শুরু করি।

আমি প্রায় দীর্ঘ এক যুগ ক্যাম্পাসে ছিলাম। ২০১৬ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করি। এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেই। সে-বছর ২৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ ইউনিটে পরীক্ষা দিয়ে ৩১ অক্টোবর আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সি ইউনিটে শেষ পরীক্ষা দিতে যাই। আমার আর বন্ধু কাদেরের পরীক্ষার হল ছিল একই। পরীক্ষার শেষে আসাদ স্যার কাদেরকে কল করে বলে মংহ্লাকে বলো মিষ্টি আনতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটের রেজাল্ট প্রকাশ হয়েছে আমি জানতাম না। মিষ্টির কথা বললেও কাদের আমাকে বলে নি যে রেজাল্ট দিয়েছে। সে বলল, চল আগে বাসায় যাই।

বাসায় গিয়ে দরজা খুলতেই বন্ধু সাহেদ জাপটে ধরে বলল, 'এই মংহ্লা তুমি তো আইন বিভাগে চান্স পেয়েছ! তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘ ইউনিটে মেধাতালিকায় ৭৭ তম হয়েছ।' যদিও আমার স্বপ্ন ছিল মেধাতালিকায় প্রথম সাত জনের মধ্যে থাকা। ভাগ্য সেটাকে ডাবল সাত বানিয়ে দিল!

আমার তখন ফোন ছিল না। তাই ঐ মুহূর্তে খুশিটা আমার পরিবারকে জানাতে পারি নি। আমাদের যেদিন রেজাল্ট দিয়েছে সেদিন চট্টগ্রাম থেকে লামায় যাওয়ার কথা। পরের দিন আমরা লামা যাই। পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। কিন্তু আমার আর তর সইছিল না। বাড়িতে যে করেই হোক এই খুশির খবরটা দিতেই হবে। বন্ধু মংশৈসিং মার্মার কাছে মোবাইল ছিল। ডায়রি থেকে নাম্বার নিয়ে ভাইয়ের কাছে কল করে যখন সুখবর জানালাম, ভাই অনেক খুশি হয়েছিল। বললাম আমি আইন নিয়ে পড়তে চাইলে পারব আর ইংরেজি নিয়ে পড়তে চাইলেও পারব। বড় ভাই বললেন তুমি আইন নিয়ে পড়ো। আমাদের চাক সম্প্রদায়ের মধ্যে আইন নিয়ে তখনো কেউ পড়ে নি। এই যে একটা খুশির আদানপ্রদান, এটা বলে বুঝানো সম্ভব না।

আমি যে এই পর্যন্ত এসেছি সেটা সহজ ছিল না। আমার কখনো একা মনে হয় নি নিজেকে। সবসময় মনে হয়েছে কোয়ান্টাম আমার পাশে আছে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার আগে থেকেই আমি নিয়মিত মেডিটেশন করতাম। ২০০৯ সালে যখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি, তখন আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করানো হয় স্কুল থেকে। আসলে কোয়ান্টাম যদি না থাকত তাহলে আমি আজকে এ পর্যায়ে আসতে পারতাম না।

তাছাড়া শিক্ষকেরা যেভাবে সহায়তা করেছেন সেটা অন্য কোনো প্রাইভেট স্কুলে, কোনো আশ্রমে পাওয়া যায় না। কোয়ান্টাম একটি সুন্দর পরিবেশে আমাদের পড়ালেখা করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্তরিকতার সাথে এখানে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে পড়ালেখা করছি। দেশের উন্নতির জন্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা যাতে আরো সুদৃঢ় হয় এজন্যে কাজ করব। সাধারণ মানুষকে তাদের ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করব। যারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার, তাদের পাশে দাঁড়াব। আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যেহেতু আমরা কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি, স্বাভাবিকভাবেই তারা চাইবে যেন তাদের জন্যে ভালো কিছু করি। আমার লক্ষ্য আমাদের পিছিয়ে পড়া যে ভাইবোনেরা আছে তাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি সবসময় আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে চাই, যেন তা হারিয়ে না যায়। আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করি এবং এর পাশাপাশি গান গাইতেও ভালবাসি।

জীবনের বিভিন্ন ধাপে আমার জীবনে যে চ্যালেঞ্জ আসে সেগুলো মোকাবেলা করার নতুন অনুপ্রেরণা পেয়েছি বইপুস্তকের মাধ্যমে, কোয়ান্টামের কোনো সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে কিংবা সুন্দর সুন্দর অটোসাজেশনে। এগুলো আমার জীবন বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অদূর ভবিষ্যতে নিজেকে একজন সৎ এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে দেখতে চাই। আমার জীবন বদলের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছে। হয়তো আমার জীবনটা পাহাড়ে জুমচাষ করে কেটে যেত। জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত থাকতাম। তবে এখন আমার জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারব। □

সুযোগ পেলে যে-কেউ উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে

মো. সাহেদুজ্জামান
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

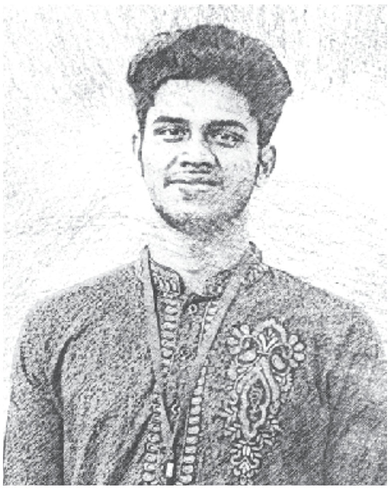

আমার বাড়ি সাতক্ষীরার তালা থানার হরিহরনগর গ্রামে। সেখানেই আমার শৈশব কেটেছে। আমাদের পরিবারের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। পুরো সংসার আমার মা কষ্ট করে চালাতেন। মা সবসময় দোয়া করতেন, তার ছেলেমেয়ে দুটো যেন মানুষের মতো মানুষ হয়। আমি পাড়ার স্কুলে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি। নিজের কোনো বই ছিল না। পাড়ার অন্য ছেলেদের পুরনো বই মা আমাকে এনে দিতেন।

ক্লাস ফাইভে উঠলাম। বেশ দুরন্ত স্বভাবের ছিলাম। ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতাম বেশি। মা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতেন। তিনি চাইতেন আমি যেন একটি ভালো স্কুলে পড়ি। কিন্তু আমার নিরুপায় মা আর কী করবেন! একদিন আল্লাহ আমার মায়ের ইচ্ছে কবুল করলেন। হঠাৎ আমার ফুফাতো ভাই মাকে কোয়ান্টামের কথা জানালেন। সেই ভাইয়ের মাধ্যমেই আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এলাম। শুরু হলো আমার পরিবর্তনের সময়।

প্রথমে আমি স্কুলের ছাত্রদের সাথে তাল মেলাতে পারছিলাম না। আগে যেহেতু পড়াশোনা কম করতাম, তাই পরীক্ষায় পাশ করতে পারলাম না। আমাকে ক্লাস ফাইভে থাকতে হলো দুই বছর। তারপরে ক্লাস সিক্স, সেভেন শেষ করে আমি ক্লাস এইটে উঠলাম। আমি তখনো পেছনের সারির ছাত্র। অষ্টম শ্রেণিতে আমাদের পাবলিক পরীক্ষার জন্যে একটু বেশি জোর দেয়া হতো। জিপিএ ৪.৫৭ পেলাম। আসলে আমার ভেতরে বদলানোর ইচ্ছাটা ছোটবেলা থেকেই ছিল। কিন্তু আমি পরিবেশ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে এর আগে ঢুকতে পারি নি।

নবম শ্রেণিতে বাণিজ্য বিভাগ বেছে নিলাম। ধীরে ধীরে বিষয়গুলো ভালো লাগতে শুরু করল। আনন্দ পেতে শুরু করলাম পড়ালেখায়। তখন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিষয়গুলো যেমন সাদাকায়ন ও আলোকায়নে (সাপ্তাহিক আত্ম উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামে) স্যারদের কাছ থেকে ভালো কথা শোনার প্রবণতা বেড়ে গেল।

এখন বুঝতে পারি—একজন মানুষের মধ্যে ভালো কথা শোনার প্রবণতা তৈরি হয়, যখন তার ভেতরে বিনয় আসে। তখন তার ভালো সত্তা জাগ্রত হয়। ভালো কিছু গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যায়। আমারও ঠিক এমন অবস্থা হলো। তাই বলে আমার পরিবর্তনগুলো হঠাৎ করে হয়েছে এমন নয়। এটাও একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে, ধীরে ধীরে হয়েছে। এসময় মেডিটেশনের প্রতি আমার আগ্রহ তৈরি হলো। বিশ্বাস ও আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকলাম। এবার রেজাল্ট আমাকে ভালো করতেই হবে। এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। এ প্লাস পেয়ে গেলাম।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে আমি কলেজে উত্তীর্ণ হলাম। আমাদের অধ্যক্ষ ছালেহ আহমেদ স্যারের উপদেশ আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করত। সে-সময় আমাদের কোয়ান্টাদের নিয়ে নৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন জহুরুল হক স্যার। এই কার্যক্রমে শেখানো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে অনেক পরিবর্তন করে দিয়েছে। একাদশ শ্রেণিতেও আমি লেখাপড়ায় ভালো করতে শুরু করলাম। মন খারাপ হলে বা সামনে পরীক্ষা থাকলে আমি গুরুজী দাদুকে চিঠি লিখে দোয়া চাইতাম। এই অভ্যাস আমার এখনো আছে।

আমাদের পুরো ব্যাচটাকে স্যারেরা মডেল হিসেবে দেখতেন। শিক্ষকদের সাথে আমাদের যোগাযোগও অনেক ভালো ছিল। গুরুজী দাদু লামায় এলে আমরা স্যারদের বলতাম, আমরা তার সাথে দেখা করব। সরাসরি তার কথা শুনলে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যেত। তার নির্দেশগুলো অনেক দিন

পর্যন্ত আমাদের শক্তি হিসেবে কাজ করত। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের ব্যাচে সর্বোচ্চ রেজাল্ট আমিই করেছিলাম। ক্লাসের শেষ বেঞ্চের ছাত্র থেকে আমি একসময় প্রথম হলাম।

ঐ সময়টা আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কিছু সংকট চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময় আমার নানা মারা গেলেন। পরীক্ষার জন্যে নানাকে দেখতে যেতে পারি নি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিলাম। এর মধ্যে খবর পেলাম আমার ছোট বোনের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে আমি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এমনকি শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার পাইলসের সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু আমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না।

আমি জানতাম আমাদের শতকরা ৭৫ ভাগ রোগই মনোদৈহিক। নিয়মিত বিকেলবেলা আরোগ্যশালায় গিয়ে মেডিটেশন করতাম। ছালেহ স্যারের সাথে এ নিয়ে কথা বললাম। স্যার আমাকে ইয়োগা করার পরামর্শ দিলেন। কিছু যোগাসন দেখিয়ে দিলেন। আমি লাইব্রেরি থেকে *রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা* বই নিলাম। চর্চা চালিয়ে গেলাম। ইয়োগা করতে গিয়ে শুধু পাইলসের সমস্যাই না, অন্যান্য বিষয়েও অনেক উপকৃত হলাম। ফলে ইয়োগার প্রতি একটা ভালবাসা তৈরি হয়ে গেল। এখনো আমার এই অভ্যাস রয়ে গেছে। আমার অন্য কোনো কাজ হোক বা না হোক, ইয়োগা চর্চা এখনো প্রতিদিন করতেই হবে আমাকে।

কোয়ান্টাম কসমো কলেজের ক্যাম্পাস থেকেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ করলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘গ’ ইউনিটে পরীক্ষা দিলাম। চান্স পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরপর বাকি আছে ‘ঘ’ ইউনিট। আমার হাতে আর মাত্র একটা মাস সময়। আমি ভালো করে প্রস্তুতি নিলাম। আবার ঢাকায় ‘ঘ’ ইউনিটে পরীক্ষা দিতে গেলাম। এবার প্রশ্ন পেয়ে খুব খুশি। প্রায় সবই আমার কমন পড়েছে। উত্তরপত্রে আমার রোল নম্বর পূরণ করতে গিয়ে ওএমআর শিটে একটি সংখ্যা ভুল পূরণ করলাম। পরীক্ষক বললেন, তুমি তোমার সঠিক রোলটা পূরণ করে দাও। তারপর সঠিক সংখ্যাটি পূরণ করলাম। পরীক্ষা ভালো হলো কিন্তু মনের মধ্যে খচখচ করছিল, রোল নম্বরের জন্যে যদি আমি বাদ হয়ে যাই!

ঢাকা থেকে চলে এলাম চট্টগ্রাম। পরের দিন আমাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা। আমি চট্টগ্রামে ‘ঘ’ ইউনিটে ৬৪ তম হলাম।

কিন্তু আমার তো ইচ্ছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট বের হলো। আমাদের কলেজের আসাদ স্যার জানালেন, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৯ তম হয়েছি। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। খুশিতে আমার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছিল। স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতায় সেজদায় মাথা নত করলাম।

প্রথমেই সুখবর মাকে জানালাম। মা তো প্রচণ্ড খুশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার খবর আমার গ্রামের লোকেরা বিশ্বাসই করতে পারল না। তারা ভেবেছিল আমি হয়তো হাই স্কুলের বেশি পড়তে পারব না। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করছিল যে, গোবরে নাকি পদ্মফুল ফুটেছে! যা-হোক এরপরে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন শুরু হলো। অনার্স শেষ করে এখন আমি মাস্টার্সের শিক্ষার্থী।

ছোটবেলার কিছু কথা খুব মনে পড়ে। যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতাম, এসেই মাকে খুঁজতাম। ওদিকে আমার ক্ষুধায় পেট ফেটে যাচ্ছে। হাঁড়িতে ভাত নেই। পান্তা ভাত থাকলে কান্না করে করে মাকে ডাকতাম। আমি মিষ্টি খেতে পছন্দ করতাম বলে পান্তা ভাত চিনি বা গুড় দিয়ে খেতাম। কখনো কষ্টে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম। ভাবতাম, যদি এমন জায়গায় যেতে পারতাম যেখানে খাবারের কোনো অভাব থাকবে না। ঠিক সেই সময়ই পেয়েছি এই স্কুলকে। মনে হয়েছিল যেন স্বর্গে এসেছি। কোনো অভাব নেই।

উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যে-কোনো মানুষের মেধা বিকশিত হতে পারে, আমি তার দৃষ্টান্ত। আমি জীবনে ভালো মানুষ হতে চাই। আমার মাকে একটু আরাম দিতে চাই। আমাকে দেখে আমার এলাকা থেকে আরো শিক্ষার্থী কোয়ান্টামে পড়তে এসেছে। তাদেরকে নিয়ে আমার এলাকায় সেবামূলক কিছু কাজ এগিয়ে নিতে চাই। কোয়ান্টামের সাথে থেকে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে আমার জীবন পরিচালিত হোক, আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনাই করি। □

আমিও মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই

আরিফুল ইসলাম

ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছে তখনকার ছাত্র আমি। ২০০৪ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। তখন আমার পাঁচ বা ছয় বছর বয়স হবে। বাবা আমাকে ভর্তির জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। বাবা চেয়েছিলেন আমি যাতে তার মতো না থাকি, পড়াশোনা করি। কিন্তু আমার এই স্কুলে থাকতে খুব ভয় হচ্ছিল। মা-বাবা আর বাড়ির কথা বার বার মনে পড়ছিল। কিন্তু শিশুদের অবস্থা যা হয় তা-ই হলো আমার সাথে। সমবয়সীদের পেয়ে সব ভুলে গেলাম।

কিছুদিনের মধ্যে পরিবেশের সাথে মিশে গেলাম। কিন্তু যখনই মন চাইত কোয়ান্টামের সীমানার ভেতরে বনে-জঙ্গলে আনন্দের অন্য ভুবনে হারিয়ে যেতাম, তা অবশ্য সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে। আমি ছোটবেলায় কখনো তেমন ভালো ছাত্র ছিলাম না। খুবই ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। সারাদিন পড়ালেখা বাদ দিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতাম।

খেলাধুলার আগ্রহ ভালোই ছিল আমার। কোয়ান্টাদের জন্যে আলাদা আলাদা স্পোর্টসের ব্যবস্থা ছিল। আমার ইভেন্ট ছিল আর্চারি। এছাড়াও টেবিল টেনিস, ক্রিকেট, ব্যাটমিন্টন ভালো লাগত। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেও সক্রিয় ছিলাম। গল্প-কবিতা লেখা, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদিতে বেশ আগ্রহী ছিলাম।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে আমি একজন সক্রিয় আর্চার ছিলাম। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ, স্বাধীনতা কাপসহ আরো অনেক টুর্নামেন্টে আমি পদক পেয়েছি। বাংলাদেশ গেমসে আমি প্রথম ১০ জনের একজন হয়েছিলাম। এখনো আমার সময় সুযোগ হলে আর্চারি খেলি। পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে ট্রেইনার হিসেবেও কাজ করি। পরিকল্পনা আছে কর্মজীবনেও আমি খেলাধুলা করে নিজের শরীর-মন ভালো রাখব।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার সুযোগ হয়েছিল। এই কোর্সে মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি নতুন করে জীবনের মনছবি তৈরি করি। উচ্চ মাধ্যমিকের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার সময় মেডিটেশন আমাকে যেভাবে স্থির থাকতে সাহায্য করেছিল, অন্য কোনোকিছু দ্বারা সেটা সম্ভব ছিল না। প্রতিদিন মেডিটেশন করেই পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখতাম।

২০১৬ সালে আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করি। তারপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তি হই। সেখানেই গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করলাম।

কোয়ান্টামের সাথে আমি এখনো আছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিটেশন সোসাইটির সার্বিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। নিয়মিত সাদাকায়নে সহপাঠী ও ছাত্রছাত্রীদের অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সময় আমরা বড় পরিসরে বুলেটিন ও শুদ্ধাচার ক্যাম্পেইন করে থাকি। আর মেডিটেশন সোসাইটির সকল সদস্য প্রতি মাসে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্নতার কাজ করি। এই কাজের জন্যে ক্যাম্পাসে আমাদের বেশ সুনাম আছে।

অনেক কারণেই আমার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ভালো লাগে। বর্তমানে কোয়ান্টাম এক সুশীল সুন্দর সমাজ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখানে এসে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব আর চেতনাকে জাগ্রত করে জীবনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে।

আমার ভাই শরিফুল ইসলাম। সে-ও এখন বেশ কৃতিত্বের সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। আমরা দুই জনই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে ছোট থেকেই পড়েছি। কলেজে পড়ার সময় একবার মা আমাদের সাথে দেখা করতে কোয়ান্টামমে আসেন। মায়ের হাতে আমাদের দুই ভাইয়ের পাওয়া ক্রেস্ট তুলে দিয়েছিলাম। সেদিন মায়ের মুখে কী হাসি! পরে শুনেছি, মা বাড়িতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে এই গল্পই বার বার করছিলেন।

আমিও মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই। বিশেষ করে সমাজের কুসংস্কার দূর করার কাজ। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নানা কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে আমাদের গ্রামে (বান্দরবানের লামার একটি গ্রাম)। দেশের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর মতো সেখানেও সঠিক সামাজিক অবকাঠামো এখনো তৈরি হয় নি। আমি আমার এলাকাকে সুস্থ সুন্দর করতে চাই। যেখানে সামাজিক সচেতনতা থাকবে শতভাগ। আমার বিশ্বাস আমি পারব।

এই আত্মবিশ্বাস ও সমাজ-সচেতন একজন ভালো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার তাগিদ পেয়েছিলাম আমি গুরুজী দাদুর কাছ থেকে। তার জীবনদর্শন আমাকে বেশ অনুপ্রাণিত করে। তার ভালবাসা আমরা (কোয়ান্টারা) পেয়েছি। ২০১৯ সালে কোয়ান্টামে গিয়েছিলাম এবং লামাতে ঈদ করেছিলাম। তখন দাদুর সাথে ঈদ মোলাকাতের সময় দাদু আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। সত্যি অনেক ভালো লেগেছিল।

স্কুলে শেখা আমার প্রতিদিনের দুটি অভ্যাস যা আমি এখনো পালন করি, সেটা হলো রাতে অটোসাজেশন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া আর সকালে পরম করুণাময়কে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুম থেকে ওঠা। এই চর্চা আমাকে একজন শোকরগোজার মানুষ হতে সাহায্য করে এবং তৃপ্তি দেয়। □

কোটা নয়, মেধা

এনক বম
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'পাহাড়ি চেহারা! নিশ্চয় কোটায় চান্স পেয়েছ?' এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে হরহামেশাই হতে হয়।

কোটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি কিনা এটা নিয়ে প্রথম বর্ষ থেকে খোঁটা দিয়েছে অনেকেই। এখনো এসবের সম্মুখীন হতে হয়। আগেও আমি এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মুচকি হেসে এড়িয়ে যেতাম। এখনো তা-ই করি। কারণ সত্যটা তো আমিই জানি। আমি কোনো কোটায় নয়, মেধায় চান্স পেয়েছি। আমি যে বছর পরীক্ষা দেই, চারুকলার ১৩৫টি সিটের মধ্যে মেধা তালিকায় আমি ২৯ তম হয়েছিলাম।

আমার পুরো নাম এনক সাংতিন লিয়ান বম। সংক্ষেপে এনক বম। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথেই অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন (২০২৩) করেছি। এখন আমি নিজেকে একজন আত্মবিশ্বাসী তরুণ মনে করি। বলে রাখি, এই আত্মবিশ্বাস কোনো ঔদ্ধত্য নয়। এটি

বিনয়ের শিক্ষা। এই শিক্ষা পেয়েছি আমি আমার শিক্ষালয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে, যেখানে আমি প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ১২টি বছর অধ্যয়ন করেছি। এখন ভাবতে অবাক লাগে—১২ বছর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমি অবস্থান করেছি। শিশু বয়সেই চলে এসেছিলাম কোয়ান্টামে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

কত স্মৃতি! কত আনন্দ! বন্ধু! শিক্ষক!

আমি ২০০৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কোয়ান্টামমে ছিলাম। ২০০৪ সালে ১ম শ্রেণিতে যখন ভর্তি হই, সে-সময় বিদ্যুৎ ছিল না। জেনারেটর দিয়ে সন্ধ্যার পর লাইট জ্বালানো হতো। প্রায় সময় জেনারেটর নষ্ট হয়ে যেত, পড়াশোনার জন্যে হারিকেন ছিল আমাদের ভরসা।

এখনকার অবস্থা কিন্তু ভিন্ন। কিছুদিন আগে স্কুলে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ক্যাম্পাস সুবৃহৎ আকার ধারণ করেছে। ভাবতেই অবাক লাগে! তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ছনের ঘরে ক্লাস করেছি আমরা। দুপাশে বেড়া নেই, সামনে শুধু একটি ব্ল্যাকবোর্ড। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনেই কিছু স্কুল ভবন নির্মাণ হয়।

চিত্রকলার প্রতি আমার ছোটবেলা থেকেই প্রবল আগ্রহ ছিল। চারুকলা নিয়ে যে পড়াশোনা করা যায় তা জানতে পেরেছি সপ্তম শ্রেণিতে উঠে। ঐসময় ধর্মদাস স্যার জানিয়েছিলেন ছবি আঁকা নিয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যায়। তখন আমার মনে স্বপ্ন জন্মেছিল—ছবি আঁকা নিয়ে আমি পড়ব।

আমাদের স্কুলে শুধু পড়াশোনাই করানো হতো না। আমাদের প্রত্যেকের কোনো না কোনো খেলাধুলায় বা প্যারেড বা ব্যান্ডে পারদর্শিতা ছিল। সপ্তম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় চার মাস আমি ব্যান্ড ট্রেনিংয়ের জন্যে চট্টগ্রামে ছিলাম। তখন পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতাম। ধর্মদাস স্যারের সহযোগিতায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ইনস্টিটিউটে চারুকলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি এবং কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছি। এমনকি চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম হয়েছিলাম। প্রাপ্ত ক্রেস্টটি এখনো আমাদের স্কুলে সংরক্ষিত আছে।

ছবি আঁকা, পড়াশোনার পাশাপাশি খো খো খেলা ও আর্চারিতে আমি দক্ষ একজন খেলোয়াড় ছিলাম আমাদের ক্যাম্পাসে। খেলাধুলা করতে পারার যে নির্মল একটা আনন্দ আছে এটা প্রত্যেক কোয়ান্টা তার জীবনে উপভোগ করেছে, যেটা হয়তো শহরের ছেলেরা সহজে পায় না।

এবার আমার লেখাপড়ার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। পাবলিক পরীক্ষায় বাণিজ্য

বিভাগে এসএসসি-তে এ প্লাস এবং এইচএসসি-তে এ পেয়েছিলাম। কোয়ান্টাম কসমো কলেজের ক্যাম্পাসে বসেই বিবিএ ও চারুকলা দুটো বিভাগের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম একমাস। এরপর চিন্তা করলাম আমার যেহেতু ছবি আঁকতে ভালো লাগে এবং কম্পিউটারে গ্রাফিক ডিজাইনেও আগ্রহ আছে, তাই বিবিএ প্রস্তুতি বাদ দিয়ে চারুকলার প্রতি মনোযোগ বাড়ালাম।

নির্দিষ্ট সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। প্রথমে লিখিত তারপর ড্রইং পরীক্ষা হলো। রেজাল্ট বের হলো। মেধা তালিকায় আমার নিজের স্থান দেখে আমি সেদিন অনেক খুশি হয়েছিলাম। মা-বাবাকে ফোন করে জানালাম। মা খুশিতে কাঁদছিলেন। বান্দরবানে লাইমি পাড়ায় আমাদের বম জনগোষ্ঠীর সবাই আমার সাফল্যে সেদিন আনন্দে মেতে উঠেছিল। পাড়াজুড়ে সে কী আনন্দ! আমার বাবা প্রায়ই এই স্মৃতিচারণ করেন।

এগুলো এখন অতীতের সুখস্মৃতি ও আমার জীবনের সংগ্রামের গল্প। আমি আরো উচ্চতর পড়াশোনা করতে চাই। পরিবারের দায়িত্বও অনেক। এখন আমার স্বপ্ন ভালো মানুষ ও ভালো গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়া, যাতে নিজের সম্প্রদায়ের জন্যে, দেশের জন্যে কিছু করতে পারি। □

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৩ তম সমাবর্তন দিবসে ক্যাম্পাসে মা এসেছিলেন। মা জুমচাষ ও বাসার কাজেই সবসময় ব্যস্ত থাকেন। আর বাবার বান্দরবানের রোয়াংছড়ি থানার কচ্ছপতলি বাজারে একটি ফার্মেসির দোকান আছে। এখন আমাদের এলাকায় লেখাপড়ার বেশ চাহিদা শুরু হয়েছে। কিন্তু ২০ বছর আগে এমনটা ছিল না। আমার মা-বাবা সে-সময় লেখাপড়ার গুরুত্ব বুঝেছিলেন বলে আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করান। এলাকার অনেকের মুখে তখন বিরূপ মন্তব্য শুনলেও এখন তারাই মা-বাবাকে প্রশংসা করে বলেন, আপনারা সচেতন অভিভাবক।

কষ্টসহিষ্ণু হয়ে আমরা বেড়ে উঠেছি

চিংমং মার্মা
পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৪ সালে কোয়ান্টাম শিশুকাননে ভর্তি হয়েছিলাম। আমাদের আবাসিকের স্যার ও সিস্টারেরা আমাদের যে-রকম মমতায় আগলে রেখেছিলেন তার জন্যে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে রেবেকা সিস্টার। তিনি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের হয়েও আমাকে নিজের আপন ছোট ভাইয়ের মতো আদর-যত্ন করতেন। এছাড়া রাংকামা সিস্টার, বারহান ত্রিপুরা স্যার, শাহ আলম স্যার, বোরহানুর রহমান স্যার, মওদুদ স্যার, আলী আহসান স্যারের কাছে আমরা কোয়ান্টারা প্রকৃত অর্থে ঋণী।

প্রথম চার বছর শিশুকাননে আমি একরকম সহজ রুটিনের মধ্যেই দিন কাটিয়েছি। সকালে উঠে পড়তে বসতাম। পড়া শেষ করে মেডিটেশন। তারপর গোসল করে সকালের খাবার খেয়ে স্কুলে যেতাম। স্কুল শেষ করে দুপুরের খাবার খেয়ে আমাদের ঘুমাতে দিত। আমরা ঘুমানোর পরিবর্তে গল্প করে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আনন্দ করতাম। চোর-পুলিশ, দশ-বিশ খেলতাম। বিকেলে নিজের মনের মতো খেলতাম। তারপরে মজার মজার নাশতা খেতাম।

সন্ধ্যার আগে হাত-মুখ ধুয়ে তারপর সিস্টারদের দেখাতাম যে, আমরা ভালোমতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েছি। রাতে খাবার শেষ করে স্কুল থেকে দেয়া বাড়ির কাজের পড়া পড়তাম। রাত ১০টার আগেই ঘুমিয়ে পড়তাম।

এই রুটিনে আমূল পরিবর্তন আসে ২০০৯ সালে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। প্রথম সমাপনী পরীক্ষার জন্যে আমাদেরকে সারাদিন স্কুলেই অবস্থান করতে হতো। শুক্রবারেও ছুটি পেতাম না। পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা শেষে এবার আমাদের কুচকাওয়াজে বাড়তি মনোযোগ দিতে হলো। এজন্যে সারাদিন ক্যাম্প করে আমরা অনুশীলন চালিয়ে গেলাম। বর্তমান ইকরান ক্যাম্পাসে তাঁবু টাঙিয়ে ১৬ ডিসেম্বরের কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতার জন্যে ক্যাম্প শুরু হলো। ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে বুট জুতা পরে আমাদের মাঠে উপস্থিত হতে হতো। প্রথমে কোয়ান্টারা বুট জুতা পরে স্বস্তিবোধ করছিল না কেউ। বুট জুতার ওজন বেশি। প্রথমদিনেই অনেকের পায়ে ফোসকা পড়ে গেল। তারপরও ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ লাগিয়ে আমরা প্যারেড করেছি।

তারপর দুপুরের খাবার খাওয়ার পর বজ্রাসন শেষে মেডিটেশন করতাম। ৩টার মধ্যে মাঠে উপস্থিত হতাম। প্রথমে প্যারেড, তারপর ডিসপ্লে করে বিকেল সাড়ে ৫টায় অনুশীলন শেষ হতো। রাতের খাওয়া শেষ করে মাঠে লাইট জ্বালিয়ে একঘণ্টা প্যারেড হতো। তারপর একঘণ্টা ডিসপ্লে হতো।

তার ফলাফল ২০০৯ সালে চট্টগ্রামে এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে আমাদের প্যারেড-ডিসপ্লেতে প্রথমবারে বিভাগীয় পর্যায়ে এসেই প্রথম হওয়া। পরের বছর যোগ হলো ব্যান্ড। এই ব্যান্ডে দক্ষতা অর্জন করতে টানা চার মাস আমরা চট্টগ্রামে প্রবর্তক স্কুলে ছিলাম। এই চারটা মাস দামপাড়া পুলিশ লাইনে প্রশিক্ষণের পর ২০১০ সালে আমাদের ব্যান্ডের মনোমুগ্ধকর প্রদর্শন সেদিন স্টেডিয়ামে সব অংশগ্রহণকারী ও দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয়। আমাদের অনুজরা এখন আমাদের মতোই প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বরে লামা, বান্দরবান ও চট্টগ্রামে প্রথম হয়। আমরা কোয়ান্টারাই জানি এই প্রথম হওয়ার পেছনে কতটা

ঘাম ঝরাতে হয়। কত আবেগ, ভালবাসা রয়েছে এর পেছনে। কিন্তু এখন বুঝি ঐ বয়সের জন্যে এসব পরিশ্রম দরকার ছিল। কোয়ান্টা জীবনে কষ্টসহিষ্ণু হয়ে কীভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হয় তা ভালোমতো শিখেছি।

২০১৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমি খুব বেশি মেধাবী বা ভালো শিক্ষার্থী কখনো ছিলাম না। তবে কোয়ান্টা জীবনের দৈনন্দিন রুটিন আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছে, লেগে থাকা এবং সবর করা শিখিয়েছে। আর কোয়ান্টা জীবনের নৈতিক শিক্ষা আমাকে আজীবন পথ দেখাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ছোট থেকে আমি সবসময় সহজ সুন্দর সাবলীল পথে থাকতে চেয়েছি। যে পথে কোনোরকম কলুষতা এবং ঝালেমা থাকবে না। আমি সবসময় মেডিটেশনে প্রার্থনা করতাম যে, আমার জন্যে যা ভালো হবে সেটাই যাতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পেলাম ত্রিপিটকের ভাষা, বুদ্ধের মুখের ভাষা—পালিতে পড়ার সুযোগ।

আসলে ২০০৪-২০১৬ সাল পর্যন্ত কোয়ান্টাম শিশুকাননে ছিলাম হাসি-কান্না বেদনা আনন্দের মধ্যে। আমাদের এলাকার একমাত্র শিক্ষার্থী হিসেবে এখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ডিপার্টমেন্টে অধ্যয়ন করছি।

আমাদের পরিবারের সদস্য হলো আমার তিন বোন, মা-বাবা ও আমি। প্রত্যেক মা-বাবা চান তার সন্তান আলোকিত মানুষ হয়ে সবসময় তাদের পাশে থাকুক। আমার মা-বাবা কী মনে করে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে আমাকে কসমো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের সুফল এখন আমি প্রতিনিয়ত বুঝতে পারছি। মা-বাবা যেভাবে চেয়েছেন এই স্কুল আমাকে সেভাবেই শিক্ষা দিয়েছে। তাই তারা নিজেদের আদর-ভালবাসাকে বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে শিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে জয়ী হয়েছেন।

আমার মা-বাবার ইচ্ছে ছিল নিজের চোখে কোয়ান্টামের প্রতিষ্ঠাতা গুরুজীকে দেখবেন। কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। একদিন গুরুজী দাদুর ছবি দেখিয়েছিলাম মা-বাবাকে। সেদিন পাড়ার আরো কয়েকজন মানুষও গুরুজীর ছবি দেখেছিল। সবার মুখে একটাই কথা—লোকটা ভালো মানুষ। ভালো মানুষ বলেই এত গরিব অনাথ ছেলেমেয়ের জীবনের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। □

যা আছে তা নিয়ে শুরু করলাম

উক্যএ মার্মা
বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

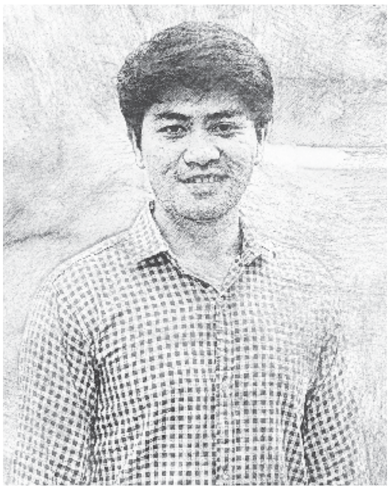

সেদিন অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল। ২০১৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি একটা সময়। বেলা সাড়ে ১২টায় এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আশানুরূপ না হওয়ায় রেজাল্টটা মেনে নিতে পারছিলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল—আরো পরিশ্রম করা উচিত ছিল!

আমি ১২ বছর (২০০৩-২০১৫) শিশুশ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পড়েছি। কিন্তু এইচএসসি-টা বাইরে কোথাও পড়ার ইচ্ছে ছিল। তাই মাকে জানালাম। তারপর নিজ এলাকা লামায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম। বাইরের পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে কষ্ট হলো। আমি ছোট থেকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে নিয়মের মধ্যে বড় হয়েছি। কঠোর পরিশ্রম করতেও শিখেছি। কিন্তু বাইরে এসে কিছুদিনের মধ্যে আমাকে দীর্ঘসূত্রিতা পেয়ে বসে। কোনো নির্দিষ্ট রুটিন নেই। আমাকে সতর্ক করার মতো পাশে কেউ নেই। এজন্যেই এইচএসসি-তে এ মাইনাস পেলাম।

২০০৯ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল প্রথমবারের মতো বিভাগীয় পর্যায়ে চট্টগ্রামে প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। স্কুলের জুনিয়র টিমের প্যারেড কমান্ডার ছিলাম আমি। তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি।

এসময় আমাকে কিছু টিউশনি করাতে হয়েছে অর্থের জন্যে। গ্রামের কয়েকজন ছাত্র আমার কাছে বাসায় এসে প্রাইভেট পড়ে যেত। এতে কিছুটা উপার্জন হতো। তা দিয়ে আমি প্রয়োজনীয় পোশাক, বই কেনার খরচগুলো চালিয়ে নিলাম। কারণ আমি তো জানি, আমার মায়ের পক্ষে সংসারের এত চাপ নেয়া সম্ভব না। আমরা দুই ভাই ও ছোটবোনের লেখাপড়াসহ বাড়ির সব খরচ চালানো তার জন্যে কঠিন। ২০১২ সালে বাবা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পর মায়ের ওপরই পুরো সংসারের দায়ভার এসে পড়ে।

যা-হোক এইচএসসি-র রেজাল্ট ভালো না হওয়ার কারণটা আমি বুঝতে পারলাম—আমি একটা বৃত্তে আটকে গেছি। এই বৃত্ত হলো দীর্ঘসূত্রিতার বৃত্ত, ভালো কিছু করতে না পারার বৃত্ত। এখান থেকে আমাকে বের হতেই হবে। তবে শুরু করাটা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। একটি অটোসাজেশনের কথা মনে পড়ল—'আমার সীমাবদ্ধতাই আমার শক্তি। আমি জানি কীভাবে সীমানা বাড়াতে হয়। আমার সীমানা বাড়তেই থাকবে'।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে থাকতে আমি ছবি আঁকা, নাচ-গান, প্যারেড-ডিসপ্লে, খো খো, কাবাডিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সবগুলোতেই প্রতিযোগিতা করে প্রথম সারিতে থেকেছি সবসময়। লেখাপড়া আর খেলাধুলা দুটাই সমানভাবে ভালো করেছিলাম। এসএসসি-তেও ফলাফল ভালো ছিল।

মনে সাহস পেলাম। ভাবলাম, এইচএসসি-তে রেজাল্ট তেমন ভালো হয় নি তো কী হয়েছে! বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে ভর্তি হতেই হবে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মনছবি করেছিলাম ছোটবেলায়। তাই আমার যা আছে আমি তা নিয়ে শুরু করলাম। উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা বই দিয়েই পড়া শুরু হলো। ঢাকায় বা চট্টগ্রামে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং করার সুযোগ হয়ে উঠল না। কারণ আমি যদি বাইরে যাই তাহলে আরো অর্থের প্রয়োজন হবে। মা হয়তো আমার কথা ভেবে চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি তো বুঝি—সংসার চালাতে মাকে কতটা কষ্ট করতে হচ্ছিল!

নিজে নিজেই ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় যারা বাইরে কোচিং করছিল, তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমি অনেক পিছিয়ে আছি। কিছুটা মন খারাপ হলো। তখনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনিয়র কোয়ান্টা জ্যাকি ভাই ফোন করে আমাকে পড়ার জন্যে উৎসাহিত করলেন। তিনি ভর্তি পরীক্ষার জন্যে কিছু বই পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আসলে সাময়িক বিরতি নিলেও কোয়ান্টামের শিক্ষা আমি ভুলে যাই নি। আবার প্রতিদিন দুইবেলা মেডিটেশন শুরু করলাম। ধ্যান আর অটোসাজেশনের প্রকৃত অর্থ কী সেটা আমি সে-সময় ভালোমতোই উপলব্ধি করেছি।

কোয়ান্টামের আরেক সিনিয়র লেংঙি ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। তিনি আমাকে ইংরেজিতে সহযোগিতা করলেন। পরম করুণাময়ের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বাংলা সাহিত্য আমার বরাবরই ভালো লাগে। গল্প-কবিতা-উপন্যাসে সমৃদ্ধ এই বাংলা সাহিত্য।

এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার শেষ প্রান্তে আছি। অনার্স শেষে মাস্টার্সে পড়ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার এই সময়টা আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলাম। এখানে এসে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। এই সৎসঙ্ঘের সাথেই আমি আজীবন থাকতে চাই। কারণ এখানে নিজের যে-কোনো নেতিবাচকতাকে জয় করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। এখন আমার মনছবি হলো, সবসময় নিজের কল্যাণের পাশাপাশি মানবকল্যাণ ও সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। □

শৃঙ্খলাই জীবন

মংপ্রু মার্মা

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, বান্দরবান সরকারি কলেজ

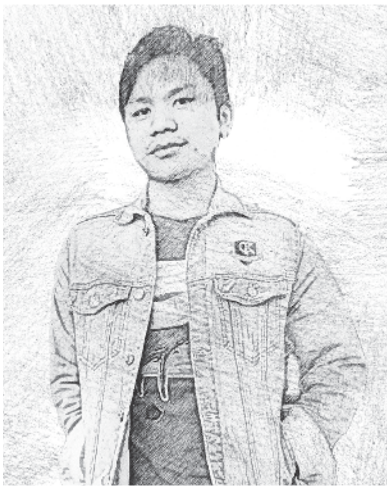

লামা রূপসীপাড়া ইউনিয়নে আমার জন্ম। আমাকে পড়ালেখা করানোর কোনো সামর্থ্য মা-বাবার ছিল না। তাই তারা চাইতেন এমন একটা স্কুলে ভর্তি করাতে যেখানে কোনো খরচ দেয়া লাগবে না। অবশেষে তারা খুঁজে পেলেন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সব খরচ বহন করবে এ আশায় আমার মা-বাবা আমাকে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

২০০৪ সালে কোয়ান্টামে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। নতুন জায়গা ও অপরিচিত মানুষ, কেউ কাউকে চিনি না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা-বাবার ইচ্ছাপূরণ করার জন্যে কষ্ট করে এখানে থেকে গেলাম। ছোট অবস্থায় মা আমাকে বুঝিয়ে ছিলেন, বাড়িতে থাকলে পড়ালেখা করতে পারব না। আর কোয়ান্টামে থাকলে শিক্ষিত হয়ে অনেক বড় মানুষ হবো। তাই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। স্কুলে আমি খো খো ও কাবাডি খেলার সাথে যুক্ত ছিলাম। ২০১২ সালে পঞ্চম জাতীয় খো খো, ২০১৩-তে অষ্টম বাংলাদেশ গেমস ও ২০১৪-তে স্বাধীনতা কাপে অংশ নিয়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম।

খো খো মাঠের একটি মুহূর্ত। নিয়মিত খেলাধুলার কারণে আমাদের চমৎকার শারীরিক ফিটনেস ছিল।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে আমি ভালো রেজাল্ট করে মাধ্যমিক সম্পন্ন করি। স্কুলে পড়া অবস্থায় বার্ষিক ছুটিতে বাড়ি গেলে মা-বাবা আমাকে পেয়ে অনেক খুশি হতেন। এলাকার অন্য অভিভাবকেরা বলতেন, আমি কোয়ান্টামে পড়ছি তা-ই ভালো মানুষ হবো। আশেপাশের সব মানুষ প্রশংসা করত। তারাও নিজেদের সন্তানদের কোয়ান্টামে রাখতে চাইতেন। কিন্তু একটা আবাসিক স্কুলে থাকতে গেলে অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সেটা অনেকে পারে না। আর কোয়ান্টামে তো দুয়েকজন না, হাজার হাজার ছাত্র। তাই অনেক নিয়নকানুন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এই নিয়মগুলো যদি সুষ্ঠুভাবে মেনে চলা হয়, তাহলে অবশ্যই আলোকিত মানুষ হওয়া সম্ভব। আসলে নিয়ম ছাড়া জীবনে কোনোকিছু করা সম্ভব নয়।

আমি এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পরে কোয়ান্টাম থেকে চলে আসি। ঐ সময় আমাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো ছিল। মা-বাবার হাতে কিছু টাকা ছিল। বাড়ির গোয়ালে অনেকগুলো গরু ছিল। তখন মা-বাবাকে বলেছিলাম, আমি তো ১০ বছর ধরে কোয়ান্টামে আছি। এখন বাইরের কোনো কলেজে পড়াশোনা করতে চাই। মা-বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়েছিলেন। ঐ সময়ে আমার মামা আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আমি ঢাকার একটি মিশনারি কলেজ

থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছি। তারপর আমি বান্দরবানে হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমি যখন তৃতীয় বর্ষে পড়ি তখন আমাদের পরিবারের অবস্থা আবার খারাপ হতে শুরু করল। আমার মা-বাবা তামাক চাষ করেন। তামাক চাষ করতে প্রচুর শ্রমিক ও খরচ লাগে। একদিকে আমাদের চার ভাইবোনের পড়ার খরচ, অন্যদিকে তামাক চাষের খরচ। সেইবারে তামাক ফলন একেবারে ভালো হয় নি। ফলে আমরা আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হই। ঐ বছর তামাক চাষ করে প্রায় চার লাখ টাকা লোকসান হয় আমাদের। মা-বাবা কষ্ট নিয়ে বললেন, তারা আমার পড়ালেখার খরচ দিতে পারবেন না। আমার লেখাপড়ার খরচ আমাকেই বহন করতে হবে। উপায় না পেয়ে আমি বান্দরবানের একটি মার্মা হোস্টেলে ভর্তি হই। লেখাপড়া খরচের জন্যে টিউশন করাতে শুরু করি। এভাবেই অনার্স শেষ করলাম।

লেখাপড়ার পাশাপাশি এখন আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে আছি। কারণ এখানে থাকলে আমি সুশৃঙ্খল একটি লাইফস্টাইল মেনে চলতে পারি। □

এ পর্যন্ত ২০ বার রক্তদান করেছি

শফিকুল ইসলাম

মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটবেলায় বাবা প্রথমে আমাকে একটি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এলাকায় তেমন কোনো স্কুল ছিল না। কিন্তু সেখানকার খরচ চালাতে অক্ষম হওয়ার কারণে ২০০৬ সালে কোয়ান্টাম শিশুকাননে ভর্তি করানোর চেষ্টা করেন—এই আশায় যে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এখানে পড়াশোনাসহ অন্যান্য আবাসিক সুযোগ-সুবিধা ছিল। কিন্তু শিশুকাননে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হতো শুধুমাত্র সূচনা শ্রেণিতে। তখন জানা গেল, কেউ চাইলে অনাবাসিকে ভর্তি হতে পারে। তখন আবাসিক এবং অনাবাসিক একসাথেই ক্লাস হতো। অনাবাসিকে ভর্তি হয়ে বাড়ি থেকে আসা-যাওয়া করে পড়াশোনা করতে থাকলাম।

কোয়ান্টাম থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব ছিল প্রায় আট কিলোমিটার। এত দূর থেকে পাহাড়ি পথে একা আসা-যাওয়া করে পড়াশোনা করা আট বছরের বালকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখন আমার এক আত্মীয় দেবদূতের মতো উদয় হলেন। মূলত তিনিই আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কারণ আমার বাবার পক্ষে খরচ চালানোর সামর্থ্য ছিল না বলে

তিনি আমাকে পড়াশোনাই করাতে চাচ্ছিলেন না। ঐ আত্মীয়ের বাড়ি ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কাছেই। তাদের গ্রাম থেকে আমার মতো অনেক ছেলে স্কুলে আসা-যাওয়া করত। তখন তিনি তাদের বাড়িতে আমাকে রেখে আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। এই মানুষটার ঋণ কোনোদিনই শোধ হওয়ার নয়। তিনি সেদিন আমাকে তার বাড়িতে রেখে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা না করলে আমার শিক্ষাজীবনের সেখানেই ইতি ঘটতে পারত।

তখন কোয়ান্টামের আবাসিক ছাত্রদের পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, প্যারেড, ডিসপ্লে এসব দেখতাম। আর নিজে নিজে ভাবতাম একদিন আমিও ওদের মতো আবাসিকে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করব, ওদের মতো খেলাধুলা করব।

সত্যিই তা আমি একদিন পেরেছিলাম। কোয়ান্টামে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই শিক্ষকদের আন্তরিকতা, মমতা, উৎসাহ আমাকে আমূল বদলে দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই ক্লাসে প্রথম হতে থাকি এবং সেই ধারা অব্যাহত ছিল দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

মমতা ভালবাসা এবং উৎসাহই মানুষের মেধাকে বিকশিত করতে পারে। ছোট থেকে 'পারি না' এসব শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। কিন্তু কোয়ান্টামে ভর্তি হয়ে নেতিবাচকতার বৃত্ত ভেঙে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসে প্রথম হওয়া—আমিই তার সত্যায়িত অনুলিপি।

আমার বড় ভাইয়ের একটা সাইকেল ছিল, সেটা চালিয়ে আমি স্কুলে যেতাম। ছোট ছিলাম বলে আমার সাইকেল চালানো দেখলে সবাই ভয় পেত, মনে করত আমি পড়ে যাব। কিন্তু আমি পড়ে যেতাম না। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমাদের পরিবার ভয়ংকর অর্থ সংকটে পড়ে। তখন আমার দায়িত্ব ছিল স্কুলে যাওয়ার সময় সাথে দুধ নিয়ে যাওয়া এবং তা বিক্রি করা। তারপর স্কুল থেকে ফেরার পথে সেই টাকা দিয়ে চাল কিনে নিয়ে বাড়িতে আসা। আমার জন্ম এমন পরিবারে যেখানে শিশুদের হাতে কলম ধরার আগেই কৃষিকাজে নামতে হতো। তাই সব ধরনের কৃষিকাজও আমি শিখেছিলাম ছোট বয়সে। এছাড়াও একটি প্রধান কাজ ছিল বাঁশ কেটে বাজারে বিক্রি করা।

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমাদের একটি বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়া হয়। বলা হয় যারা ভালো করবে তাদেরকে ঢাকাতে নিয়ে যাওয়া হবে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ঐ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার

সুযোগ পাই নি। কিন্তু ছালেহ আহমেদ স্যারের বিশেষ বিবেচনায় আমাকে কোর্সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়। আমি ছোট হলেও কোর্সের অনেক বিষয়ই আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল।

পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে ভালো ছাত্রদেরকে বাছাই করে কোচিং করানো হতো। কোচিং করানো হতো খুব ভোরে বা কখনো সন্ধ্যার পর। ঐ সময়গুলোতে কোচিং করা আমার পক্ষে অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আমার সৌভাগ্য যে, আমি শিক্ষকদের অনেক ভালবাসা পেয়েছিলাম। এ সময়ের কয়েকজন শিক্ষককে আমি কখনোই ভুলতে পারব না। বনানী দেবনাথ ম্যাডাম, সাইদার রহমান স্যার, কামরুল স্যার এবং আমাদের ইনচার্জ ছালেহ আহমেদ স্যার।

ছালেহ আহমেদ স্যার আমার পড়াশোনার যাতে কোনো ধরনের বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্যে তিনি আবাসিক হলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে আল্লাহর রহমতে আমি পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিলাম। এরপরই আমার কসমো স্কুলে আবাসিকে ভর্তি হওয়ার স্বপ্নপূরণ হয়েছিল। আমাকে আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি করানো হয়।

আমি অষ্টম শ্রেণিতে জেএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস এবং ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিলাম। ২০১৫ সালে এসএসসি-তে ৪.৮৯ এবং

২০১৭ সালে জিপিএ-৫ পেয়ে সফলতার সাথে এইচএসসি পাশ করেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় গ ইউনিটে মেধা তালিকায় চান্স পেয়েছিলাম এবং ঘ ইউনিটে মেধাতালিকায় ১৫ তম স্থান অর্জন করেছিলাম।

কোয়ান্টাম আমার জীবনটা বদলে দিয়েছে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার আগে আমার পরিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই শোনে নি। কোয়ান্টাম আমাকে এমনই এক পরিবেশ থেকে তুলে এনে বড় স্বপ্ন, বড় পৃথিবীর সাথে পরিচয় করে দিয়েছে। শিখেছি কীভাবে মানুষের জন্যে কাজ করতে হয়। কীভাবে সেবা করতে হয় এবং কীভাবে দান করতে হয়। যখন আমার বয়স ১৮ বছর, তখন থেকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আমি একজন নিয়মিত রক্তদাতা। এ পর্যন্ত আমি ২০ বার রক্তদান করেছি। চার মাস পর পর রক্ত দেয়ার সময় হয়ে এলে আমি রক্তদান না করে থাকতে পারি না। ভেতর থেকে অনুভব করি আমার এক ব্যাগ রক্তে চারটি প্রাণ বাঁচবে। আমি মনে করি প্রত্যেক তরুণকেই রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত।

আরো শিখেছি কীভাবে দেশকে ভালবাসতে হয়। 'নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম' কথাটি কোয়ান্টাম থেকেই শিখেছি। গুরুজী দাদুর কথাগুলো আমার মধ্যে আশাবাদের সঞ্চার করেছে। আমি ভালবাসি কোয়ান্টামকে, ভালবাসি আমার প্রিয় গুরুজী দাদুকে। পৃথিবীর যেখানেই যাই আমৃত্যু কোয়ান্টামের সাথেই থাকব। কারণ আমি কোয়ান্টামের সাথে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য মনে করি। কোয়ান্টামের স্বপ্নই আমার স্বপ্ন, কোয়ান্টামের লক্ষ্যই আমার লক্ষ্য। আর কসমো স্কুলের সুশৃঙ্খল জীবনই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। □

তরুণ সমাজকে ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে মুক্ত করতে চাই

সুইঅং থোয়াই মার্মা

নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমার নামটা রেখেছেন আমার মা। আসলে আমার নামের একটা সুন্দর অর্থ রয়েছে। মার্মা ভাষায় সুই অর্থ সোনা, অং মানে জয় লাভ করা এবং থোয়াই হলো আলোকিত করা। অর্থাৎ স্বর্ণজয়ী এক আলোকিত মানুষ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমার এই নাম রাখাটা অর্থবহ হবে যখন আমি ভালো কিছু করার চেষ্টা করব। পরিশ্রম করব।

২০০৩ সালে আমাকে কোয়ান্টাম শিশুকাননে ভর্তি করানো হয়। তখন কোয়ান্টামে ভর্তি নিয়ে অনেকের মা-বাবার মতো আমার মা-বাবার মধ্যেও অনেক বিরোধ ছিল। আমার বাবা আমাকে ভর্তি করাতে চাইতেন। কিন্তু আমার মা ভর্তির বিরোধী ছিলেন। মা বিরোধী থাকা সত্ত্বেও ভাইভা ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলাম কোয়ান্টামে।

যেদিন আমি কোয়ান্টামে এসেছি সেদিন বাবা আমাকে অন্য ছাত্রদের সাথে ভাত খেতে বললেন। পরে তিনি অন্যান্য অভিভাবকদের সাথে খাবেন

বলে অন্যদিকে চলে গেলেন। আসলে বাবা আমাকে বুঝতে দিতে চাচ্ছিলেন না যে, তিনি আমাকে রেখে চলে যাবেন। আমি অনেক ছোট ছিলাম তাই এত কিছু চিন্তা করলাম না। খাবারের কথা শুনে খেতে গেলাম। কিন্তু দেখলাম একটা ঘরে আমার মতো অনেক ছোট বাচ্চাকে আনা হয়েছে। সেখানে আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম। খেয়াল করলাম সেখানে আমাদের কোনো অভিভাবক নেই। যেহেতু বাঁশের বেড়া তাই আমরা যে রুমে ছিলাম, সে ঘরে থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সামনে পেছনে কী হচ্ছে তা দেখা যেত। আমি দেখতে পেলাম আমার বাবা চলে যাচ্ছেন।

আমি প্রায় আধা ঘণ্টা কান্না করলাম। তারপরে দুপুরের খাবার। আমরা বাড়িতে ফুলকপি খাই অনেক ছোট ছোট টুকরো করে। কিন্তু এখানে কপির টুকরোর সাইজ অনেক বড় মনে হলো। প্রথম দিনের এই দৃশ্য আমার চোখের সামনে এখনো ভেসে ওঠে।

স্কুলের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগত মুভিয়ান কার্যক্রম (শুক্রবার সন্ধ্যায় মুভি দেখা)। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ শেষ। আমি এখন বুঝতে পারি যে, কোয়ান্টামে আমাদেরকে যে মুভিগুলো দেখানো হতো, সেগুলো বাস্তব জীবনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। আসলে দায়িত্বশীলেরা বাছাই করে ভালো ভালো মুভিগুলো আমাদের দেখাতেন।

স্কুলে পড়া অবস্থায় বিশ্বাসই করতে পারতাম না আমি ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাব। প্রথম যখন বীর বাহাদুর ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে দেখালেন, তখন আমার ভেতরে একটা বিশ্বাস জন্মাল যে, আমিও তো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে পারি। আমার মনে হয় মানুষ দুইভাবে শেখে। দেখে শেখে এবং শুনে শেখে। আমার ক্ষেত্রে দুইটারই প্রভাব ছিল। আমার রেজাল্ট মোটামুটি ভালো হতো। তবে আমি সবসময় চেষ্টা করতাম, কখনো হাল ছাড়তাম না। স্কুলে কয়েকজন বন্ধু দুষ্টুমির ছলে বলত, এত পড়ে কী হবে! রেজাল্ট তো ভালো করতে পারবি না। আমি বলতাম, চেষ্টা করে তো দেখা যেতে পারে। আসলে লেগে থাকার জন্যেই এত দূর আসা।

আমাদের এলাকা থেকে আমি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। আমার আগে দুইজন ডিগ্রি পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। এলাকায় আমার বয়সী অনেক বন্ধু আছে, যারা অনেক আগেই ঝরে গেছে। তাদের সাথে আমার পার্থক্যটা শুধু এখানেই যে, আমি লেগে ছিলাম আর তারা চেষ্টাই করে নি।

ছোটবেলায় কবিতা আবৃত্তি করতাম

এখন আমি এলাকায় গেলে ছাত্রদের সাথে বসি। তাদের ফ্রি-তে পড়াশোনা করাই। এলাকায় আমার একটা লাইব্রেরি আছে। করোনার লকডাউনে যখন এলাকায় লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিল, তখন শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার সাথে যুক্ত রাখতে আমি লাইব্রেরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

আসলে লাইব্রেরি দেয়ার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। সারাদেশে লকডাউনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে আমার কাছে যত বই ছিল সব বই নিয়ে আমি বাড়ি চলে যাই। আমাদের গ্রামে তখনো পুরোপুরি লকডাউন হয় নি। সপ্তাহে একদিন স্কুল হতো। আমি ভাবলাম এভাবে চললে আমরা পড়ালেখায় অনেক পিছিয়ে পড়ব। তখন আমি লাইব্রেরির কথা ভাবলাম। লাইব্রেরির উদ্যোগকে প্রথমদিকে সবাই ভালো দৃষ্টিতে নেয় নি। নানারকম মন্তব্য শুনেছি। বলত—ফালতু কাজ, এটা দিয়ে কী হবে! আমি কোনো মন্তব্যকে পাত্তা দিতাম না। কারণ আমার লক্ষ্য হচ্ছে ভালো কিছু করার।

আমি স্কুলে থাকতে গল্পের বই কম পড়লেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর অনেক বেশি গল্পের বই পড়তে শুরু করি। গল্পের বই আমার ভালো লাগে। বন্ধুদের থেকে বই নিতাম এবং পড়তাম। নিজেও বই কিনতাম। প্রতি মাসের হাত খরচ থেকে টাকা জমিয়ে একটা দুইটা বই কিনতাম। এখন আমার কাছে ৩০-৪০টির মতো বই আছে। বাংলা এবং আমাদের মার্মা ভাষারও কিছু বই আছে। মার্মা ভাষার বইগুলো গ্রামের মুরুব্বিরা পড়েন। লাইব্রেরির মাধ্যমে এলাকার শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা আর জ্ঞান অর্জনের মধ্যে থাকে এতেই আমার আনন্দ। লাইব্রেরির সব বই আমার অর্থায়নে কেনা।

এছাড়া আমি দেখেছি লকডাউনের সময় এলাকায় অনেক ছেলে বিভিন্ন অনলাইন গেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। আমি সবসময় এসবের বিরোধিতা করেছি। এলাকার ছাত্ররা অহেতুক সময় নষ্ট না করে ভালো কাজে মনোযোগী হোক সেজন্যে চেষ্টা করেছি। প্রথমে তারা আমার কথা শুনত না। অভিভাবকের সামনে ছেলেদের বোঝাতাম। মাঝে মাঝে অভিভাবকরাই আমার বিরোধিতা করত। বলতেন—তোমার ছেলে নাকি? আমি বলতাম—আমার ছেলে না হোক, আমার ছোট ভাই তো।

আমি অভিভাবকদের বোঝাতাম আপনি কি চান আপনার ছেলে বিপথে যাক? আপনাদের ছেলে গেম খেললে প্রথমত সময় নষ্ট। তারপর গেমের পেছনে যে টাকাপয়সা খরচ হয় তা-ও নষ্ট। এরপর অনেকেই সচেতন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের বন্ধুরাও বিভিন্ন অনলাইন গেম খেলে। ওরা সামাজিক জগতের চেয়ে ভার্চুয়াল জগতে বেশি সময় কাটায়। এই চিত্র এখন সারাবিশ্বের চিত্র। আমি সবসময় গেম থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

আমার উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন আছে। আমি সবসময় আমাদের ডিপার্টমেন্টের বন্ধুমহলে বলি, চাকরি যদি আমি করি আমার এক পরিবারের ভরণপোষণ হবে, বেশি হলে আমার ভাইবোনকে কিছু দিতে পারব। কিন্তু অন্যেরা বঞ্চিত হবে। এজন্যে এমন কিছু করতে চাই যাতে অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

আর একটি কথা না বললেই নয়। কোয়ান্টামের একটা বাণী, 'স্বপ্নের জন্যে রক্ত যখন ঘাম হয়ে ঝরে, সেই নোনা পানিতে সাফল্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়'—এটাই আমার জীবনের মন্ত্র। তাই আমার পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন আমি সবসময় লেগে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাব। □

কঠিন যুদ্ধেও আমি পরাজয় মানতে শিখি নি

উক্যচিং মার্মা
বি.এ. শিক্ষার্থী, লামা সরকারি মাতামুহুরী কলেজ

বান্দরবান লামার রূপসীপাড়া ইউনিয়নের টিয়ারঝিরি গ্রামে আমার জন্ম। নিবিড় নৈসর্গের মাঝে আমার শৈশবটা অসাধারণ ছিল। নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি, বনবাদাড়ে ঘুরাঘুরি এগুলো ছিল আমার নিত্যদিনের কাজ।

আমার বাবা কিছুটা পড়াশোনা জানতেন বলে তিনি পড়াশোনার খুব মূল্যায়ন করতেন। বাবা বলতেন, পড়াশোনা করলে অনেক বড় মানুষ হওয়া যায়। ২০০০ সালে পাঁচ বছর বয়সে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন দূরের একটি স্কুল—দরদরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের গ্রাম থেকে এই স্কুলে পাঁচ জন ছাত্রের মধ্যে আমি একজন। স্কুল যেহেতু দূরে তাই বাসা থেকে যাওয়া-আসা করা সম্ভব নয়। তাই স্কুলের নিকটস্থ বৌদ্ধ শ্রমণদের সাথে তাদের বিহারে আমার বসবাস শুরু হলো। দুটো বছর আমার সেখানেই কাটে। বড় ভান্তের (বিহারের অধ্যক্ষের) সেবাযত্ন করতাম। উৎসবে বা বিশেষ দিনে বিহার সাজসজ্জার কাজ করতাম। ভান্তে কবুতর পুষতেন। এগুলো দেখভাল করাটাও

ছিল আমাদের দায়িত্ব। ছোটদের দেখাশোনা করা আর বিহারের সবার জন্যে রান্নাটাও আমরাই করতাম।

যা-হোক একদিন শুনলাম আমাকে অন্য কোনো এক স্কুলে ভর্তি করানো হবে। আমি অবুঝ ছিলাম। শৈশবটা তো এমনই হয় তাই না! অভিভাবকের হাত ধরেই তখন আমাদের সমস্ত জীবন।

শুরু হয় শৈশবের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। সেটা আর অন্য কোনো স্কুল নয়, আমার প্রিয় 'কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ'। শুরুতে এর নাম ছিল কোয়ান্টাম শিশুকানন। মন মাতানো সুন্দর পরিবেশ। ২০০৪ সালে বাবা আমাকে শিশুকাননে নিয়ে আসেন।

তখন আধো আধো বাংলা জানতাম। ঠিকমতো বাংলা বলতে পারতাম না। সেখানকার পুরনো কিছু কোয়ান্টা আমার দোভাষী হয়ে কাজ করল। আর বাংলা ভাষা শেখাল। এভাবে একসময় শুদ্ধ বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে নিলাম। কোয়ান্টামে এসে আবারো সূচনা ক্লাস থেকে পড়াশোনা শুরু করি। যদিও তখন আমার বয়স আট কি নয় বছর।

কোয়ান্টামে পোশাক থেকে শুরু করে সবকিছু ছিল বিনামূল্যে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, নাচ-গান সবই শেখার সুযোগ হয় এখানে। ডিসপ্লে-প্যারেডে নিয়মিত অংশ নিতাম।

সবে অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছি। পরিচয় হয় কামাল আরিফ নামে একজন বাংলা শিক্ষকের সাথে। একাধারে কবি ও সাহিত্যিক। ক্লাসে এলেই কবিতা পড়াতেন। খুব ভালো লেগেছিল তাকে। সেখান থেকেই আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। স্যারের পড়ানোর ধরন, চালচলন, কথাবলার ভঙ্গি আমাকে অনুপ্রাণিত করে। লক্ষ্য ঠিক করলাম আমিও কামাল স্যারের মতো একজন কবি-সাহিত্যিক হবো। দেখতে দেখতে দশম শ্রেণিতে পদার্পণ করলাম। একটা নিয়মের ভেতর আমার জীবনটা ভালোই চলছিল।

এসএসসি পরীক্ষা শেষ করতেই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। বের হওয়ার তেমন কোনো কারণ ছিল না যদিও। সবাই মানা

করলেন। তবুও বাইরের জগৎ দেখার বাহানায় বেরিয়ে পড়লাম। কোয়ান্টামে থাকার সময় সাহিত্যের একটা গ্রুপ ছিল। কিন্তু বাইরের জগতে এসে সেই গ্রুপটা আর পেলাম না। বাইরের জগতটা সম্পূর্ণ আলাদা। কারোর মাঝে কোনো স্বপ্ন, আশা-প্রত্যাশা বা লক্ষ্য দেখি নি আমি। দেখেছি শুধু নেতিবাচকতা। ইন্টারনেট অপব্যবহার যার অন্যতম কারণ।

সবার সাথে তাল মেলাতে কষ্ট হচ্ছিল। ওদের মতো আমি চলতে পারি না। একা থাকাটাই শ্রেয় মনে হলো। তারপর ভর্তি হলাম লামার সরকারি মাতামুহুরী কলেজে। সেখানে খালার বাড়িতে থাকতাম। দেখতে দেখতে কলেজের সময়টাও পেরিয়ে গেল।

২০১৯ সাল। চাকরির সন্ধানে চলে এলাম চট্টগ্রামে। শুরু হলো জীবনযুদ্ধ। এই যুদ্ধে লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম শিল্প কারখানায়। পার্ট টাইম চাকরি নিলাম। কঠিন যুদ্ধেও আমি পরাজয় মানতে শিখি নি। পাশাপাশি একই কলেজে বিএ ডিগ্রি-তে পড়াশোনা করছি।

এখন আমি জীবনে কিছু একটা না হওয়া পর্যন্ত পিছপা হবো না। জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আমি এগিয়ে যাব। বর্তমানে সাহিত্যচর্চাই আমার সাধনা। ইরানের কবি শেখ সাদীর একটি কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি—'ঊষর মরুর ধূসর বুকে বিশাল যদি শহর গড়ো, একটি জীবন সফল করা তার চেয়ে অনেক বড়।' □

পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ব

হারুন অর রশিদ

শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আড়াই কি তিন বছর বয়সে ২০০৩ সালে আমি কোয়ান্টামে আসি। তারপর দীর্ঘ ১৬ বছর আমি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেছি।

আমার আব্বা আমাকে কোয়ান্টামে নিয়ে আসেন। কারণ আমাদের অঞ্চলটা (কোয়ান্টামমের নিকটবর্তী) তখন শিক্ষাদীক্ষায় সবদিকে খুব পিছিয়ে ছিল। এছাড়া শিশুবয়সে আমার জীবনের একটা ট্র্যাজেডি আছে। আমি টানা একবছরের মতো জ্বরে ভুগেছিলাম। কী অসুখ হয়েছে কেউ বুঝতে পারছিল না। ডাক্তাররা ধরে নিয়েছিলেন আমি আর বাঁচব না। আমার করুণ পরিস্থিতি দেখার জন্যে পাড়ার লোকেরা ভীড় করতে শুরু করল আমাদের বাসায়। কোন ভরসায় বা কী বুঝে অচেনা একজন আব্বাকে পরামর্শ দিলেন, তোমার ছেলে তো কিছুই খায় না, ছেলেকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে ওকে কোয়ান্টামে দিয়ে দাও! আর যদি তোমাদের কাছে রাখতে চাও এই ছেলে বাঁচবে না। আমার বাবাও কী মনে করে কোয়ান্টামে দিতে রাজি হলেন। যদিও কিছুদিন পর আমি সুস্থ হতে শুরু করলাম।

একদিন আমার ভাইসহ আমাকে আব্বা নিয়ে গেলেন কোয়ান্টামে। একজন স্যার জিজ্ঞেস করলেন, বড় ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে? আমার আব্বা জানতেন না ভাই কোন ক্লাসে পড়ত। মা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বড় ছেলেটা ওয়ান পাশ করে ক্লাস টু-তে উঠবে আর ছোটটা এখনো পড়াশোনা করে না। কিন্তু আব্বা বললেন, বড়টা ক্লাস টু শেষ করে থ্রি-তে উঠল। স্বাভাবিকভাবে বড় ক্লাসের পড়া বলতে বলায় আমার ভাই কিছুই পারল না। তাকে আর ভর্তি নেয়া হলো না। আমাকে কিছু ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হলো। তারপর আমাকে ভর্তি করিয়ে দিতে বলা হলো। তখন থেকেই আমার কোয়ান্টা জীবন শুরু।

খেলাধুলায় আমি ভালো করতাম। ব্যান্ড টিমের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম। ঢাকায় জাতীয় কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় আমাদের স্কুলের ব্যান্ড টিমের পারদর্শিতা বরাবরই সবাইকে মুগ্ধ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে এই ব্যান্ড দলে দুবছরে দুই বার ব্যান্ড মেজর হয়ে আমি পারফর্ম করি। স্মৃতি থেকে এটা কখনো মুছে যাবে না। একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি আমি বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে খুব পছন্দ করতাম। লেখাপড়াতেও আমি ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা করেছি।

আমি যখন ভার্সিটির প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন বলে রেখেছিলাম আমি শুধু ঢাকা ভার্সিটিতে পরীক্ষা দেবো। আর যদি চান্স না পাই তাহলে পড়াশোনা এখানেই শেষ! প্রয়োজন হলে স্থানীয় কলেজে অনার্সে ভর্তি হবো, তবুও অন্য ভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দেবো না। তখন স্যারেরা মনে করেছিলেন আমি এসব এমনি বলছি। আমি ঢাকা ভার্সিটিতে চারুকলা নিয়ে পড়ব—এটা আমি নবম শ্রেণিতে থাকার সময় ঠিক করে রেখেছিলাম। কারণ আমার ছবি আঁকতে খুব ভালো লাগত।

কিন্তু কলেজের অনেকেই প্রথমে তা মানতে রাজি হন নি। কারণ আমি কমার্সে অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট ভালো ছিলাম। তারা চেয়েছিলেন আমি কমার্সে কোনো একটা সাবজেক্টে অনার্স করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি শুধু চারুকলার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম।

তারপর শুরু হলো ভর্তি পরীক্ষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট বের হলো। আমার রোল পাওয়া গেল অপেক্ষমাণ তালিকার শেষের দিকে।

কী আর করা! মন খারাপ। এত শেষে থেকে আমার চান্স না পাওয়ার সম্ভাবনাটা প্রায় একশ পার্সেন্ট বলা চলে। আমি লামায় চলে গেলাম। তখন অধ্যক্ষ স্যার বললেন, হারুন এখন কী করবে? চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে পরীক্ষা দাও। আমি বললাম, না স্যার! আমি আর কোথাও পরীক্ষা দেবো না। স্যার সাথে সাথেই আর কিছু বললেন না। কিন্তু এরপর তিনি ও অন্যান্য স্যারেরা মিলে আমাকে বোঝাতে লাগলেন যেন পরীক্ষাটা অন্তত দেই। তারা আমাকে বলে বুঝিয়ে কোনোরকমে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে চারুকলায় থিউরি পরীক্ষা দেয়ালেন এবং পরবর্তী ধাপ প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্যে মনোনীত হলাম। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল আমি এখানে চান্স পেয়ে যাব। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিলাম না। কারণ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ছাড়া পড়ব না।

এই খবর কসমো স্কুলের সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কারো সাথে দেখা হলেই বলত, তুমি কেন অন্য কোথাও পরীক্ষা দেবে না? হঠাৎ গুরুজী দাদুকে আমাদের ক্যাম্পাসে একদিন দেখতে পেলাম। ভাবলাম দাদুর সামনে না পড়াই ভালো হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্যবশত ধরা পড়ে গেলাম। আর দাদু আমার সমস্যাটি সমাধান করলেন। তার পরামর্শ অনুযায়ী কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ব্যান্ড টিমে কোয়ান্টাদের ব্যান্ড শেখানোর সাথে যুক্ত হলাম। পাশাপাশি চট্টগ্রামের বারো আউলিয়া কলেজে ম্যানেজমেন্টে অনার্সে ভর্তি হলাম। এভাবে একমাস পার হলো। ডিসেম্বর মাস এলো। হঠাৎ অধ্যক্ষ ছালেহ স্যার ফোন করে বললেন, হারুন কিছুক্ষণের মধ্যে স্কুল অফিসে চলে আসো।

আমি স্যারের অফিসে গেলাম। স্যার বললেন, আচ্ছা হারুন! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমার রেজাল্টটা আর একবার দেখে নিই। আমি বললাম, দেখে কী হবে স্যার, সময় তো পার হয়ে গেছে। স্যার বললেন, আরে দেখি না কী হয়! আমার রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে পুনরায় চেক করা হলো। অপেক্ষমান তালিকা থেকে এবার আমি সিলেক্টেড।

আমি নির্বিকার। কোনো অনুভূতি কাজ করছে না আমার। আসলে আমি আগের ট্রমা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি। পরদিন ঢাকায় যেতে হবে। রাতে ব্যাগ না গুছিয়ে রুমের বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তারপর ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে গেলাম।

পরে শুনেছি, ছালেহ স্যার জুনিয়র কোয়ান্টাদের আমার ঘটনা বলে উদাহরণ দিতেন। বলতেন, দেখ! যদি লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চাও, তাহলে তোমাদের হারুন ভাইয়ের দিকে তাকাও। তার একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না হয় সে কোনো ভার্সিটিতেই পড়বে না। সে সেটা পূরণ করতে পেরেছে।

কোয়ান্টামের সাথে আমি এখনো আছি। আর কোয়ান্টামও আমার পাশে সবসময় আছে। আমার কাছে কোয়ান্টাম একটি চেতনা—যে চেতনা ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়। কোয়ান্টামে আমার সবচেয়ে ভালোলাগার ব্যাপারটা হলো এখানকার নিঃস্বার্থতা।

আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে, চারুকলায় মাস্টার্স শেষ করে আমি পিএইচডি করব। তারপর আমি যে শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করছি সেটাকে এগিয়ে নিতে চাই। মিশরীয় সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার শিল্পচর্চার ইতিহাস যেমন প্রাচীন, তেমনি আমাদের দেশের শিল্পচর্চার ইতিহাসও কম প্রাচীন নয়। অন্যান্য দেশে যেভাবে নিজেদের সভ্যতাকে পুরো বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, আমরা কিন্তু সেটা এখনো পারি নি। আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ খুব কমই জানে। আমি আমার শিল্পচর্চার মাধ্যমে নিজের দেশকে, সংস্কৃতিকে, ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চাই। □

কীভাবে পেরোতে হয় স্বপ্নের সীমানা—তা জেনেছি

জিয়াবুল হক
লোক-প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

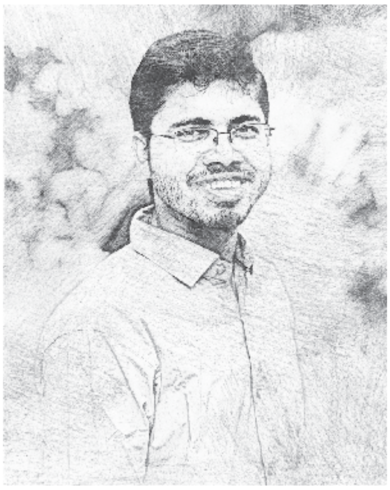

আমার বাড়ি লামার লম্বাখোলা মসজিদের পাশে। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের খুব কাছে। ২০০১ সালে কোয়ান্টাম শিশুকানন যখন শুরু হয় তখন এ অঞ্চলে একটি ছোট পাঠশালা ছিল। সেখানে তেমন কোনো পড়াশোনা হতো না বললেই চলে। আমি সেই স্কুলেই ভর্তি হয়েছিলাম শিশুকালে। কোয়ান্টামের শিক্ষকেরা আমার বাবাকে বলতেন যেন আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু যখন এই এলাকায় কোয়ান্টাম প্রথম এসেছিল, স্থানীয় মানুষদের মনে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা ছিল। একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, এই স্কুলে পড়লে ছাত্ররা তাদের ধর্ম ভুলে যাবে। এই জন্যে আমাকে বাবা শিশুকাননের অনাবাসিক শাখায় ভর্তি করালেন। আমি বাসা থেকেই যাওয়া-আসা করতাম।

আসলে স্থানীয় ছাত্রদের জন্যে কোয়ান্টাম সর্বপ্রথমে আমাদের এই সুযোগটি দিয়েছিল, হোস্টেলে না থেকেও ছাত্ররা যেন পড়তে পারে। পরে তা

বন্ধ হয়ে যায়। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এখন পুরোপুরি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্যে কোয়ান্টাম একটি অনাবাসিক স্কুল (বোধিছড়া পাবলিক স্কুল) চালু করেছে। সেখানেও রয়েছে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ।

২০০৪ সালে আমি কোয়ান্টাম শিশুকাননে ভর্তি হই। আমি শুরুতে পায়ে হেঁটে লম্বাখোলা থেকে স্কুলে আসতাম। একটা সময় বাবা সাইকেল কিনে দিলেন। আহ! আমি কী খুশি! তখন একটি সাইকেল মানে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছি। ছোটবেলার আনন্দগুলো আসলে এমনই হয়।

কিন্তু তখন আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রদের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। বিশেষভাবে আবাসিকের ছাত্রদের বই, খাতা, পোশাক, খাবার সবকিছুই ফ্রি ছিল। আবার তারা পড়ালেখার পাশাপাশি প্যারেড ও ডিসপ্লে করত। আমাকে বই ছাড়া সবকিছুই বাড়ি থেকে আনতে হতো। আমি স্কুল শেষে মাঠে চলে যেতাম আবাসিক ছাত্রদের প্যারেড ও ডিসপ্লে দেখার জন্যে। কী সুন্দর সুসজ্জিত প্রদর্শনী! এগুলো দেখে আমার ঈর্ষা হতো। মনে হতো, আমিও যদি হোস্টেলে থেকে কোয়ান্টামে পড়ালেখা করতে পারতাম!

পঞ্চম শ্রেণিতে আমাদের ভালো ও খারাপ রেজাল্টের ভিত্তিতে গ্রুপে ভাগ করা হলো। আমি শেষ গ্রুপে ছিলাম। কারণ আমি একদমই ভালো ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু একটা সুখবর শুনি যে, যারা পঞ্চম শ্রেণিতে ভালো ফলাফল করবে তাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে আবাসিক ছাত্র হিসেবে পড়ালেখার সুযোগ দেয়া হবে। আমি তখন ভালোমতো পড়ালেখা শুরু করি। আমার অবস্থান শেষ থেকে প্রথমে চলে আসে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করি এবং তা অর্জন করি।

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে আমি পুরোপুরি আবাসিক ছাত্র হয়ে পড়ালেখার সুযোগ পাই। খুশিতে আমি আত্মহারা। অন্যদের মতো আমিও প্যারেড-ডিসপ্লেতে অংশ নিতে পারব। বাবা আমার খুশি দেখে আর আপত্তি করেন নি। আবাসিক ছাত্র হওয়ার পর আমার লেখাপড়া আরো ভালো হতে থাকে। আমি জেএসসি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে লামা থানায় দ্বিতীয় হলাম। এরপর থেকেই বাবা-মায়ের ধারণা হলো যে, তাদের ছেলে সবসময় ভালো রেজাল্ট করবে।

কোয়ান্টামের শিক্ষকেরা এত যত্ন নিয়ে আমাদের সবকিছুর দেখাশোনা করতেন যেন তারাই আমাদের অভিভাবক। প্রয়াত আবাসিক দায়িত্বশীল শোভন স্যারের কথা না বললেই নয়। তিনি সহজেই সকল স্তরের মানুষের

মাঝে মিশে যেতে পারতেন। নিজের সুখ-দুঃখের কথা তার সাথে শেয়ার করতাম আমরা। আসলে এরকম স্যার পাওয়াটা দুর্লভ। একবার রাতে ঘুমানোর সময় এক শিশু কোয়ান্টা বিছানায় টয়লেট করে দেয়। তখন তিনি নিজেই বালতি নিয়ে পানি এনে বিছানা, কম্বল পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। কোনো কোয়ান্টা কোনো ভুল করলে তাকে আলাদা করে ডেকে বোঝাতেন।

যখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বড় ভাই বীর বাহাদুর ত্রিপুরা প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেল, তখন জানতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কিছু আছে। তার আগে জানতাম স্কুলের পর শুধু কলেজ। এরপর যখন আরো কয়েকজন কোয়ান্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়, তখন আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হতে শুরু করে যে, আমরাও পারব। কেননা তাদের আমরা সরাসরি দেখেছি।

কলেজে উঠে আমাদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমার প্রস্তুতির পুরোটাই ছিল বিবিএ কেন্দ্রিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি অংশের পারফরমেন্স খারাপ হওয়াতে আমার আর ভর্তির সুযোগ হলো না। ক্ষণিকের জন্যে হতাশ হলাম। আর একসপ্তাহ পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। হতাশা ভুলে দিনরাত প্রায় ২০ ঘণ্টা প্রস্তুতি নিলাম।

সে-সময় আমার একটাই লক্ষ্য—আমাকে পড়তে হবে এবং চান্স পেতে হবে। চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে বি এবং ডি ইউনিটে মেধাতালিকায় সুযোগ পেলাম। এই খবর মা-বাবাকে জানালাম। তারা বললেন, আমরা জানতাম তুই চান্স পাবি। আসলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তারা সে-রকম কিছুই বোঝে না। অনেকদিন পর্যন্ত এলাকার লোকজনও তেমন বুঝত না। তারা মনে করত চট্টগ্রামে কোনো একটা কলেজে হয়তো পড়ছি।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ হলো আমার বিশ্বাস। আমার সাথে আমাদের এলাকার কিছু ছাত্র এই স্কুলে পড়ত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা ঝরে পড়ে। আমিও তাদের মতো হয়ে যেতে পারতাম, দোকান করতাম, গাড়ি চালাতাম, নয়তো দিনমজুর হয়ে কাজ করতাম। বড়জোর কাজ করতে বিদেশে চলে যেতাম। আমার অঞ্চলের কালচারটাই এমন। আমাদের স্বপ্নের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। কোয়ান্টাম আমাকে দেখিয়েছে কীভাবে পেরোতে হয় স্বপ্নের সীমানা।

আমার মূল পরিবর্তনটা ঘটেছে আসলে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর। মেডিটেশন, মনছবি ও অটোসাজেশন এই বিষয়গুলো আমি বুঝতে পারি। আগে একটা বিষয় বহুবার পড়েও মুখস্থ করতে পারতাম না। মেডিটেশনে ভিজুয়ালাইজ করার পরে খুব দ্রুত পড়া শেষ করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও যেটা আমার কাজে লেগেছে। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির একজন সক্রিয় কোয়ান্টিয়ার ছিলাম। তাই ক্লাসে সবাই আমাকে কোয়ান্টাম বলেই ডাকত। বিষয়টি আমার ভালোই লাগত।

আমার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জন্যে কিছু করা। একটা বড় ইচ্ছে আছে আমার—কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের মতো একটা স্কুল তৈরি করা। □

হ্যান্ডবলে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মনছবি করলাম

শরিৎ চাকমা
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৩ সালে প্রথম চাকমা হিসেবে আমাদের এলাকার সঞ্জয় চাকমা কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়। তখন আমাদের বাড়ি আলীকদমে। একবছর পর ২০০৪ সালে মা-বাবা আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি করিয়েছিলেন। আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের দ্বিতীয় চাকমা কোয়ান্টা।

ভর্তির পর থেকে আমার আর আলীকদমের বাড়িতে যাওয়া হয় নি। কারণ বান্দরবানের আলীকদম থেকে সরে গিয়ে লামার লুলেংয়ে মা-বাবা বসবাস শুরু করেন। তারা লুলেংয়ে তিন বছর ছিলেন। তারপর আবার মা-বাবা বান্দরবানের টংকাবতী হেডম্যান পাড়াতে চলে যান। বর্তমানে সেখানে একটা চাকমা পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাই আমি মাঝে মাঝে ভাবি বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করলে বার বার আবাস বদলের জন্যে ঠিকমতো হয়তো পড়ালেখা করতে পারতাম না।

মা-বাবা সবসময় কোয়ান্টামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই শিশুকাল থেকে আমার লেখাপড়াসহ সমস্ত খরচ কোয়ান্টাম বহন করেছে। মা-বাবা জানেন যে, বাড়িতে তারা কোয়ান্টামের মতো এত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবে না।

২০০৯ সালে আমি পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলাম। আর ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণিতে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে বৃত্তি পেয়েছি। ডিসেম্বরের ২৭ তারিখ অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। আমি ঐদিন বার্ষিক ছুটিতে বাড়িতে ছিলাম। অনেক খুশি হয়ে মা-বাবাকে রেজাল্ট বলেছিলাম। কিন্তু তারা গোল্ডেন এ প্লাস কী সেটা জানেন না। তাই বলেছিলাম আমার পরীক্ষার রেজাল্ট ভালোর চেয়ে ভালো, অনেক ভালো হয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকেও আমি ভালো রেজাল্ট করেছি।

লেখাপড়ার পাশাপাশি আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের হ্যান্ডবল দলের একজন খেলোয়াড় ছিলাম। ২০০৬ সালে প্রয়াত জাহিদ স্যারের হাত ধরে আমাদের স্কুলে খো খো ও হ্যান্ডবলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমি ২০১০ সাল থেকে হ্যান্ডবলে নিয়মিত পারফর্ম করতে শুরু করি। আমাদের সৌভাগ্য যে, জাহিদ স্যারের মতো একজন চৌকস প্রশিক্ষককে পেয়েছিলাম। স্যার ছিলেন আমাদের অভিভাবকের মতো।

জাহিদ স্যারের সবকিছু অনুসরণ করার মতো ছিল। দৈনন্দিন রুটিন, কঠোর পরিশ্রম করার প্রবণতা, ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মতো গুণাবলি যেমন তার ছিল, তেমনি প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তিনি তা অর্জনে অনুপ্রাণিত করতেন। স্যারই প্রথম আমাদেরকে হ্যান্ডবলে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মনছবি দেখিয়েছিলেন। আমরা স্যারের সেই মনছবি পূরণ করেছিলাম।

এরপর আন্তঃস্কুল জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমরা টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। প্রথম ডিভিশন হ্যান্ডবলেও আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল প্রিমিয়ার লীগের খেলা চলা অবস্থায় স্যারের দূরদর্শিতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমাকে আজও বিস্মিত করে।

সেই বছরই এক দুর্ঘটনায় স্যার পরপারে চলে যান। আমি সবসময় স্যারের আত্মার শান্তি কামনা করি। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের খেলাধুলায় স্যারের অভাব অপূরণীয়।

মেডিটেশন আমার জীবনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। আমার কল্পনা শক্তি বাড়াতে, রোগ নিরাময়ে ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে মেডিটেশন আমাকে সাহায্য করে সবসময়। খেলার আগেও আমি মেডিটেশন করি। তাই ভালো খেলতে পারি এখনো।

কোয়ান্টামমে আমরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই একসাথে মিলেমিশে থেকেছি। আমরা অনেক ছোট বয়স থেকে দীর্ঘ ১২-১৪ বছর একসাথে ছিলাম। তাই কে চাকমা, কে বাঙালি, কে মার্মা সেটা কখনো গুরুত্ব পায় নি। আমরা সবাই ভাই ভাই, এক পরিবার। এই বন্ধন কোয়ান্টাম ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না।

উচ্চ মাধ্যমিকের আগেই আমি ঠিক করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ-তে পড়ব। কিন্তু আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলাম না। আমার মন ভেঙে গেল।

ঐ সময় আমি প্রতিদিন মেডিটেশনে বিশ্বাস বাড়ানোর জন্যে অটোসাজেশন চর্চা করতাম। তারপর বিশ্বাস নিয়ে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলাম। আমি দুইটা বিশ্ববিদ্যালয়েই মেধাতালিকায় চান্স পেলাম। পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগকে বেছে নিয়েছি। এখন আমি তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করছি। আমার আজকের অবস্থানের জন্যে এই স্কুলের অবদানকে আমি আজীবন মনে রাখব। এখানে লেখাপড়ার সুযোগ না পেলে বিশ্ববিদ্যালয় তো অনেক পরের কথা হয়তো স্কুলের গণ্ডিও পার করতে পারতাম না। □

স্কুল জীবন থেকেই দেশ নিয়ে ভাবতাম

রুবেন ত্রিপুরা
ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

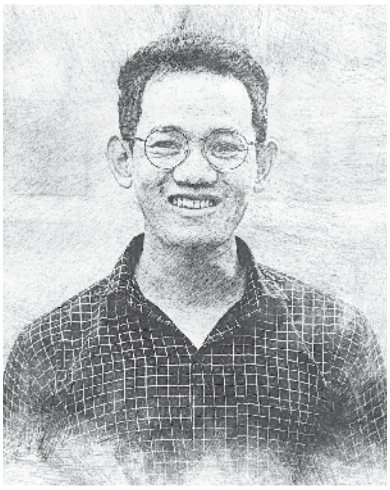

অনুভূতি যদি বলি অনেক বলা যাবে। কারণ কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে কাটানো ১৪ বছর তো আর কম সময় নয়। আমার জীবনের অনেক গল্প এ স্কুলকে ঘিরেই। আমার বহু অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা আর ভালবাসার সবটাই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। আর তা হলো, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন—কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ।

শিশু থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পার করি কোয়ান্টামে। এর মধ্যেই কারাতে, খো খো, কুংফু, জিমন্যাস্টিক্স, হ্যান্ডবল, টেবিল টেনিস, আর্চারি, নাচ, গান সবগুলোতেই অংশগ্রহণ করি দক্ষতার সাথে। যদি এই স্কুলে না পড়তাম তাহলে এই খেলাগুলোর সাথে পরিচিত হতাম না। বঞ্চিত হতাম কত বহুমুখী মেধাবিকাশের সুযোগ থেকে!

আমার মতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ উন্নত চিন্তাধারার একটি নিঃস্বার্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানে সহজেই একটি শিশু নিজেকে বিকশিত করতে পারে। কৈশোরও কেটেছে কোয়ান্টামের মমতা, ভালবাসা আর স্নেহের

স্পর্শে। সত্যি আমার কখনো মনে হয় নি আমি আমার বাবা-মার থেকে মাইলের পর মাইল দূরে আছি।

আজও আমি কোয়ান্টামের সেই নিঃস্বার্থ স্নেহ, মমতা, ভালবাসার আঁচলে আছি। কারণ আমি চাই না আমার এই বন্ধনটাকে ছিন্ন করতে। আমি আজও সে-সব কর্মবীরদের স্মরণ করি যারা আমার মতো চার বছরের শিশুকে মা-বাবার মতো ভালবাসা দিয়ে আজ এমন অবস্থানে তুলে ধরেছেন।

আমার জন্ম পার্বত্য চট্টগ্রামে বান্দরবান জেলার রুমা থানার জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্জুন পাড়াতে। এখানে তেমন শিক্ষার আলো পৌঁছাতে পারে নি। আর স্থানীয় বাসিন্দাদের কোনো যানবাহন ছাড়াই প্রায় আড়াই ঘণ্টা পায়ে হাঁটা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয় বাজার করতে অথবা বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজ করতে। আজ আমি নিজেকে একজন গর্বিত পাহাড়ি সন্তান বলতে চাই। কারণ আমি বাংলাদেশের এক স্বনামধন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

স্কুল জীবন থেকেই দেশ নিয়ে ভাবতাম। তাই আমার ডায়েরি থেকে সে-সময়ে লেখা একটি কবিতা আজ তুলে দিলাম—

হে তরুণ তোমাকে অভিবাদন

একটি পতাকা পড়ে আছে, সবুজে বিস্তৃত মাঠে;
তারই পাহারায় এক জনপদের, দিবস রাত কাটে।
পতাকাটি অচেনা নয়, লাল-সবুজের পতাকা;
যারই অর্জনে লেখা হয়ে গেছে, শত রক্তক্ষয়ীর কথা।
আমি পথিক হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি—
কেউ আসে নি পতাকা তুলতে,
নয় ব্যবসায়ী, নয় কেরানি, নয় কোনো অট্টালিকা হতে।
ব্যস্ত যদি তবে হায়! কেন আজ ভূপাতিত স্বাধীনতা?
ধিক্কার! তোমাদের এই কেমন মনুষ্যত্বের দীনতা?

অস্তিত্বহীন কবি আমি—
তোমাদের এই লাঞ্ছিত সমাজে,
তবুও এই স্বাধীনতার হেলায়, হৃদয় আমার কাঁদে।
গর্বিত এই স্বাধীনতার ইতিহাস, আমাদের অহংকার,
তবে কেন আজও শুনি আকাশে বাতাসে, তারই বেদনার হাহাকার?
আজও সাক্ষী হয়ে আছি, মুজিবের সেই জ্বালাময়ী ভাষণের;
স্বাধীন জনতা যখন চেয়েছিল, একটি পতাকা উত্তরণের।
অনেক অপেক্ষার প্রান্তরে এসে আমি, দেখেছি এক তরুণকে;
ললাটে তার কুঞ্চিত বেদনা আর মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে এগিয়ে আসতে।
এসো হে তরুণ—
নত আমি তোমারই অভিবাদনে,
দুর্দমনীয় যৌবন শক্তির আবেগে তোমার, স্পর্শ ভূপাতিত নিশানে।
কর্মই তোমার উত্তম প্রেরণা আর দুর্মর পথ তোমার ধর্ম।
হে কর্মবীর,
হও কর্ণধার তুমি, আর উঠাও তোমার সত্যের বর্ম।
পরাজিত নয়নে চেয়ে আছে শত লক্ষ কোটি জনতা, তোমারি আগমনে।
হে তরুণ, তুমিই আগামীর পাঞ্জেরী হেতু,
মোরা শ্রদ্ধানত তোমারি অভিবাদনে।

□

এখন আমি নিজ এলাকায় ট্যুরিস্টদের নিয়ে কাজ করি

রানা খিয়াং

উদ্যোক্তা

২০০৪ সালে খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর প্রথম কোয়ান্টা হিসেবে আমি কোয়ান্টাম শিশুকাননে ভর্তি হয়েছিলাম। বান্দরবানের রোয়াংছড়ির সুদূর খামতাং পাড়া থেকে আমার ভাইসহ মোট পাঁচ জন কি ছয় জন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেইবার। যদিও আমি ছাড়া আর কেউ ভর্তি পরীক্ষায় টিকতে পারে নি। আমাদের এলাকায় লেখাপড়ার কোনো সুব্যবস্থা ছিল না। সে-সময় প্রায় সবাই নিরক্ষর বলা যায়। আমার অবস্থাও হয়তো সে-রকম হয়ে যেত। বাবা নিশ্চিত ছিলেন যে, এলাকায় থেকে আমার লেখাপড়া সম্ভব নয়। তাই মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ভর্তি করালেন।

কোয়ান্টামে ভর্তির আগে আমি বাংলা একটুও পারতাম না। আমাকে কোয়ান্টামে নিয়ে যাওয়া হবে—একথা শুনে আমি যাতে বাংলা বুঝতে পারি সেজন্যে বাড়িতে বড় ভাইয়েরা বাংলা শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। যেমন এটাকে আয়না বলে, ওটাকে চিরুনি বলে, এটা সবজি ইত্যাদি। এখনো

এই স্মৃতিগুলো মনে পড়ে।

ঐ সময় কোয়ান্টামকে নিয়ে অনেক আজগুবি গল্প প্রচলিত ছিল। মা সেগুলো বিশ্বাস করতেন। আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি করিয়ে বাবা বাড়িতে ফিরলে মা বাবাকে বলেন, ছেলেকে কোথায় বিক্রি করে এসেছ। কাউকে চিনো না, জানো না! এখন আমার ছেলেকে দিয়ে যদি ওরা ব্যবসা করে। পরে শুনেছি সেদিন মা-বাবার মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছিল। মায়ের একই কথা, ছেলেকে তুমি বিক্রি করে দিয়েছ!

কোয়ান্টামে ভর্তি হয়ে গেলাম। বাবা বলেছিলেন, কোয়ান্টামে একটা ম্যাডাম আছে, তার সাথে তুমি খিয়াং ভাষায় কথা বলতে পারবে। কোয়ান্টামে এসে দেখি আমার মতো অনেক শিশু। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি কী করব! পরে সেই ম্যাডামকে খুঁজে পাই। কষ্ট করে হলেও একসময় মানিয়ে নিয়ে থেকে গেলাম।

একবছর পর বার্ষিক ছুটিতে বাবা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মা আমাকে দেখে হাসবেন না কাঁদবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। একবছর ছেলের সাথে দেখা নেই, কথা নেই। ডিসেম্বরে বাড়িতে এসেছে তা-ও আবার মাত্র ১০ কি ১২ দিনের জন্যে। কিন্তু কী আনন্দ! তারপর ছুটি শেষে আবার কোয়ান্টামে ফিরে গেলাম। এভাবে কয়েক বছর কেটে যায়। এখন যারা কোয়ান্টামে আছে ছোটবেলায় আমরা তাদের মতো ছিলাম না। আমাদের আবাসনের অবস্থা এখনকার মতো ভালো ছিল না। চাদর, কম্বল, বালিশ পর্যাপ্ত ছিল না। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এখনকার মতো নিয়মিত এত মাছ-মাংসের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হতো না।

এরপর আস্তে আস্তে একসময় সুযোগ-সুবিধা বাড়তে থাকে। কোয়ান্টা এবং শিক্ষকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। আবাসনের অবস্থাও ভালো হয়। খাবারের মান ভালো হয়। এভাবে আমার শৈশব ও কৈশোর কেটে গেল।

কোয়ান্টা থাকাকালীন লেখাপড়ার পাশাপাশি ছোট থেকেই প্যারেড, ডিসপ্লে শেখার সুযোগ পেয়েছি। প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় সবার সাথে আমি অংশ নিয়েছি। আর ডিসপ্লে-তে

অংশ নিতাম দলনেতা হয়ে। ২০১০-২০১৫ এ পাঁচ বছর আমি আমাদের স্কুলের ব্যান্ড টিমের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম।

এরপর কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করলাম। এখন উদ্যোক্তার জীবন শুরু করেছি। নিজ এলাকায় ট্যুরিস্টদের নিয়ে কাজ করছি। আমি যেহেতু প্রায় একযুগ ধরে কোয়ান্টামে ছিলাম, তাই আমার মধ্যে কোয়ান্টামের প্রভাব অনেক বেশি।

কিন্তু বাইরে এসে কসমো স্কুলের সুবিধাগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। এটা স্কুলে থাকার সময় বুঝতেই পারি না আমরা। আমি বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করছি এখন। এটাই আসলে জীবনের নিয়ম। মানুষ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভুলতে পারে। কিন্তু স্কুল জীবনের কথা ভুলতে পারে না। মানুষ ছোটবেলার স্মৃতি ভুলতে পারে না। স্কুল জীবনের বন্ধুদের সাথে কাটানো বিভিন্ন সময়গুলো মিস করি। তাদের সাথে এখনো যোগাযোগ হয়। □

জাহিদ স্যার বললেন, প্র্যাকটিসকে কখনো 'না' বলবে না

লাংসাই খুমী
বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়

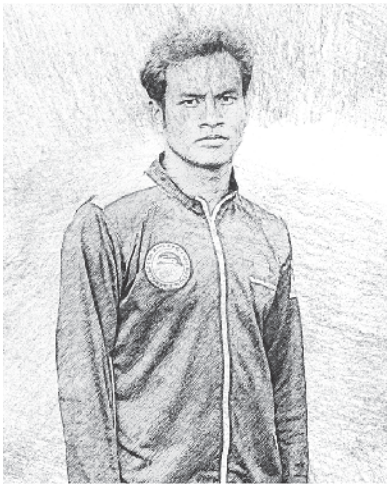

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি থেকে পাহাড়ি জঙ্গলের পথ ধরে প্রায় দুই ঘণ্টা পায়ে হেঁটে আমাদের গ্রামে যেতে হয়। আমার জন্মের সময় আমাদের পাড়ার আশেপাশে কোনো লোকালয় ছিল না। সে-সময় পাড়া বলতে মাত্র আটটি বাড়ি। আমার বাবা নিরক্ষর হলেও আমাকে শিক্ষিত করে তুলতে তিনি কোনো প্রতিবন্ধকতাকে পাত্তা দিতে চান নি। পড়ালেখার জন্যে একমাত্র উপায় ছিল রোয়াংছড়ি শহরে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়া।

কিন্তু শহরে বাসা নিয়ে লেখাপড়া করানোর সামর্থ্য বাবার ছিল না। এমন সময় কোয়ান্টামে ভর্তির খবর পেলেন তিনি। ২০০৩ সালের নভেম্বরে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে নিয়ে গেলেন বাবা। এরপর ২০০৪ সালে শিশুকাননে আমি ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। এই সংবাদ আমার মা-বাবার মনে নতুন এক আশা জাগিয়ে দিল। নির্দিষ্ট দিনে বাবার হাত ধরে চলে এলাম। দেখলাম আমার মতো আরো অনেক শিশু।

কিছুক্ষণ পর আমাদের রুমের বাইরে আনা হলো। বের হয়ে দেখি আমাদের মা-বাবারা চলে গেছেন। এই দেখে শিশুরা কান্না শুরু করে দিল। আমি একটুও কাঁদি নি। ছোটবেলা থেকেই আমার মধ্যে কান্নাকাটির প্রবণতা কম ছিল। কিন্তু একসময় আমিও আমার কান্না আটকে রাখতে পারি নি।

পর পর চার বছর বাসা থেকে আমাকে কেউ নিতে আসে নি। প্রতিবছর ডিসেম্বরে সব ছাত্ররা বাসায় যেত, আর আমি আমার আবাসনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হতো এবার আমাকে কেউ নিতে আসবে। কিন্তু আমার বাবার কোনো খোঁজ নেই। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। এভাবেই আমার শৈশব কেটে গেল। একারণে শিশুকানন হলো আমার ভালবাসার জায়গা।

তখন আমি তৃতীয় শ্রেণিতে। আমি আমার মায়ের ভাষা খুমীর চেয়ে বাংলা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আবার ডিসেম্বরের ছুটি এলো। যথারীতি জানালা ধরে আমি তাকিয়ে আছি। দেখি এবার বাবা এসে উপস্থিত। নিজের চোখে বিশ্বাস হচ্ছিল না। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জাপটে ধরলাম। বাবা সেদিন অনেক খুশি মনে আমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন—নিজের সন্তান এখন পড়তে শিখেছে, লিখতে শিখেছে।

চার বছর আমাকে বাড়িতে না নেয়ার কারণ সেদিন জানলাম। আমি যাতে এই স্কুলে অভ্যস্ত হয়ে যাই তার জন্যেই বাবা ইচ্ছে করে এমন করেছেন। আর পাহাড়ি পথে আসা-যাওয়া অসুবিধা ছিল। যাতায়াত খরচও অনেক বেশি লাগত। মানুষজন তখন বুঝতও কম। আর সে-সময় খুমী সম্প্রদায় পড়ালেখায় এতই পিছিয়ে ছিল যে বলার মতো না। এখনো পিছিয়ে আছে। তবে আমরা যারা কোয়ান্টামে সুযোগ পেয়েছি তারা সত্যিই সৌভাগ্যবান।

আমি বরাবরই দুরন্ত স্বভাবের ছিলাম। ছোটবেলায় লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী থাকলেও বড় হওয়ার সাথে সাথে লেখাপড়ার থেকে খেলাধুলাটা বেশি আকর্ষণ করত। স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম আমি একজন বিশ্বসেরা খেলোয়াড় হবো।

চতুর্থ শ্রেণি থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি শুরু হলো আমার খেলোয়াড়ি জীবন। ২০০৯ সালে ঢাকায় খো খো আন্তঃস্কুল টুর্নামেন্টে সবচেয়ে কনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে আমি অংশ নিই। সেবার আমরা ঢাকাতে প্রথমবার গিয়েই প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করি। এই বছরই চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে প্যারেড-ডিসপ্লেতে আমাদের স্কুল প্রথমবার এসেই প্রথম হয়। সবকিছু মিলিয়ে ২০০৯ ছিল আমার ও আমাদের স্কুলের বাঁকবদলের বর্ষ।

২০১৪ সালে ঢাকায় স্বাধীনতা কাপ খো খো-তে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। কোচ প্রয়াত কায়সার আহমেদ জাহিদ স্যারসহ উচ্ছ্বসিত আমাদের দল।

২০১০ থেকে স্কুলের খেলাধুলা বিভাগকে অন্যভাবে সাজানো হয়। আর শিশুকাননের নাম পরিবর্তন হয়ে তখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ করা হয়। ২০১০ সালে আমি পিইসি সম্পন্ন করলাম।

আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি কারণ আমাদের খো খো ও হ্যান্ডবলের কোচ হিসেবে জাহিদ স্যারকে পেয়েছিলাম। গভীর কৃতজ্ঞতায় এ মানুষটিকে আমি সবসময় স্মরণ করি। তিনি আমার জীবনের আদর্শ। দুঃখের সাথে জানাতে হয় তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। ২০১৮ সালের ৬ অক্টোবর তিনি না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। কোয়ান্টাদের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালবাসা। বর্তমানে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের নাম শুনলে আমাদের সামনে খেলাধুলায় সাফল্যময় একটি স্কুলের চিত্র ভেসে উঠে। এ সাফল্যের নেপথ্য কারিগর ছিলেন আমাদের প্রিয় জাহিদ স্যার।

স্যারের সাথে আমার অনেক স্মৃতি। একদিন জাহিদ স্যার আমাকে ডেকে আলাদা করে বুঝিয়ে বললেন, লাংসাই! তুমি যদি সত্যিই জাতীয় পর্যায়ে ভালো কিছু করতে চাও, তাহলে প্র্যাকটিসকে কখনো না বলবে না। চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগ হিসেবে নেবে।

স্যারের 'না বলবে না!' এই কথাটার পর আমি নতুন প্রত্যয়ের সাথে খেলাধুলায় মনোযোগ দিতে পেরেছি। কিছুদিনের মধ্যে প্রতিটি ম্যাচে অনেক ভালো পারফর্ম করতে লাগলাম।

পরিশ্রম করলে সফল হওয়া সম্ভব তার প্রমাণ আমি ২০০৯ সালেই পেয়েছি। এরপর এই বিশ্বাসকে সাথে নিয়েই আমি সবসময় কঠোর অনুশীলন করেছি। এপর্যন্ত যত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি প্রায় সবগুলোতেই প্রথম হয়েছি। নয়তো দ্বিতীয়। আসলে জাহিদ স্যারের উপদেশ মেনে সেদিনের পর থেকে ভালো কোনোকিছু যতই কষ্টের হোক, আমি 'না' উচ্চারণ করি নি।

খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও আমি লেখাপড়াকে ভুলে যাই নি। ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমাদের স্কুলের সিস্টেমটাই ছিল সে-রকম। পড়াশোনার সময় পড়াশোনা করতেই হতো। বাণিজ্য বিভাগ থেকে আমি এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করলাম। ভর্তি হলাম সাভারে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে আমি বাংলা বিভাগে অনার্সে পড়ছি।

এখনো কিন্তু আমি খেলাধুলার সাথেই আছি। ২০২০ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়া গেমসে খো খো-তে বাংলাদেশের হয়ে আমাদের দল দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। নিজের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব সেদিন আমি উপলব্ধি করি।

খেলাধুলা ও লেখাপড়ার পাশাপাশি আমি পার্টটাইম কাজ করছি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। কারণ আমার পড়ালেখার খরচ আমাকে বহন করতে হয়। তারপর হাতে কিছু বাড়তি টাকা থাকলে বাড়িতে পাঠাই। বাড়িতে উপার্জন করার মতো শুধু বাবা একাই। আমি আমার জীবনে বাড়ি থেকে সব মিলিয়ে ছয় হাজার টাকার বেশি এখনো নিই নি।

ঈশ্বরের কৃপায় মা-বাবা, ছোট ভাইবোনকে নিয়ে আমাদের সুখী পরিবার। আমার জীবনের যা অর্জন, শূন্য থেকে শুরু হওয়ার যে গল্পটি আজ বললাম—সবকিছুর জন্যে আমি কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ জানাই। অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই গুরুজী দাদুকে, যার মহান উদ্যোগের ফলেই আমি আজকের এই অবস্থানে আসতে পেরেছি।

আমি এখন একজন ভালো খেলোয়াড় ও ভালো মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমার খুমী জাতির জন্যে কিছু করার স্বপ্ন দেখি। কারণ ছোটবেলাতেই আমার ভেতর ভালো ও বিশ্বাসী মানুষ হওয়ার বীজটা অঙ্কুরিত হয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০১৯ এই ১৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের যে মানুষগুলো আমাকে লালনপালন করে এত দূর নিয়ে এসেছেন তাদের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। □

মেডিকেলে পড়ার স্বপ্নটাই ছিল দুঃসাহস

কামরুল ইসলাম
বিডিএস শিক্ষার্থী, রংপুর মেডিকেল কলেজ

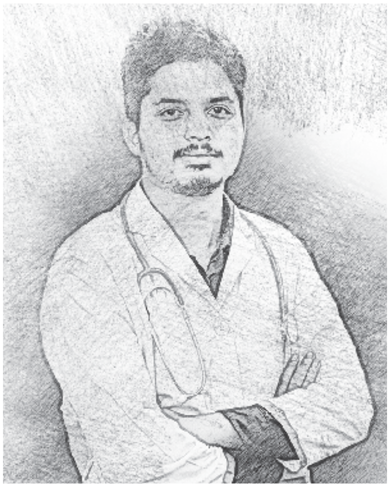

বান্দরবান লামার প্রত্যন্ত এক পাড়া বৈক্ষম ঝিরিতে আমার জন্ম। ২০০৫ সালে হঠাৎ করেই আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন আমার বাবা। পাঁচ বছর বয়সে এই স্কুলে আমার পড়ালেখার হাতেখড়ি। কসমো স্কুলের ছাত্র আবাসনে আমাকে রেখে আসতে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছিল সেদিন। তারপরও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার তীব্র ইচ্ছা এবং কোয়ান্টামের প্রতি বিশ্বাসের কারণে আমাকে ভর্তি করিয়ে দেন। যদিও তখন কোয়ান্টামকে ঘিরে এলাকার মানুষের মনগড়া নেতিবাচক ধারণা ছিল। চারপাশের মানুষের শত নেতিবাচক কথা পাত্তা না দিয়ে এবং উৎকণ্ঠা ও সংশয় উপেক্ষা করে তিনি আমাকে রেখে গেলেন।

আমাদের এলাকায় তখনো কেউই স্কুলের গণ্ডি পার করতে পারে নি। শত শত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় স্বপ্নটা ছিল শ্রমিক ভিসায় দেশের বাইরে যাওয়া। আধুনিকতার এই যুগেও তাদের স্বপ্ন খুব একটা বড় হচ্ছে না! এখনো

২০০৭ সালে বান্দরবান স্টেডিয়ামে বিজয় দিবসের জুনিয়র দলে আমি প্যারেড কমান্ডার ছিলাম

তাদের সর্বোচ্চ স্বপ্ন এলাকার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক কিংবা কোনো সশস্ত্র বাহিনীর কনস্টেবল।

এমন একটি এলাকায় মেডিকেলে পড়ার স্বপ্নটাই ছিল দুঃসাহস। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়ে ধীরে ধীরে শিখতে শুরু করলাম কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়, কীভাবে নিজেকে চেনা যায়। জানলাম মেধার কোনো জাত, ধর্ম, বর্ণ নেই। যে-কেউ যে-কোনো অবস্থান থেকে মেধাকে বিকশিত করতে পারে, যদি তাকে সেই পর্যায়ে সুযোগ এবং পরিবেশ দেয়া হয়। আমার মেধা বিকাশের সেই সুযোগ এবং পরিবেশের ব্যবস্থা করেছে এই স্কুল।

পঞ্চম শ্রেণিতে থাকাকালে ৩০০ তম ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে বুঝতে পারলাম যে, মনছবি দেখা আমার পক্ষেও সম্ভব। হাজার হাজার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব। স্বপ্ন বুনলাম ডাক্তার হওয়ার। তখন থেকেই নিজেকে সাদা অ্যাপ্রনে অবলোকন করতে থাকলাম।

২০১৫ সালে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ঢাকার কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ প্রথমবার গিয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে। আমি সেই কুচকাওয়াজে প্যারেড কমান্ডার ছিলাম। পড়াশোনার পাশাপাশি একজন দক্ষ আর্চার ছিলাম। জাতীয় পর্যায়ে সোনা-রুপা-ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছি। এছাড়া ছিলাম স্কুলের বিজ্ঞান ক্লাবের

একনিষ্ঠ সদস্য। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে একহাতে এত কিছু সামলাতাম কীভাবে? আমি বলব আত্মবিশ্বাস, অনুশীলন ও সুস্থিরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাই আমাকে সবসময় ব্যস্ত রাখত নতুন কিছু করার জন্যে। আর আমার অর্ন্তগত এই শক্তির নেপথ্যে রয়েছে নিয়মিত মেডিটেশন।

কসমো স্কুলে পেয়েছি মেধাকে শতধারায় বিকশিত করার সুযোগ। আর কো-কারিকুলামগুলো আমার মেধাকে আরো শাণিত করেছে।

নিজের বোনা স্বপ্ন আর হাজারো মানুষের দোয়ার ওপর ভর করে ক্রমাগত শিক্ষকদের দেখানো পথ অনুসরণ করতে করতে কখন যে মেডিকেলের দরজায় এসে পৌঁছে গেছি বুঝতেই পারি নি। এ পর্যায়ে এসে বুঝতে পারছি শিক্ষকদের প্রতিটি নির্দেশনা, প্রতিটি ডিসিপ্লিন কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন ভাবতেই ভালো লাগে যে, আমার উপজেলায় হাতে গোনা চার জন মেডিকেলের ছাত্র— আমি তাদের একজন। এভাবে বীজ থেকে হাজারো স্বপ্ন এবং এগুলোর বাস্তবায়নের পেছনে রয়েছে কোয়ান্টামের মানুষের অবদান। এই মানুষগুলোর ঋণ কোনোদিনও পূরণ করা সম্ভব নয়। □

আমার গল্পটা আনন্দের, সংগ্রামের

সুজন ত্রিপুরা

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বান্দরবানের লামার কেয়াজু হেডম্যান পাড়ায় আমার জন্ম। অন্য শিশুদের মতোই আমার দিনগুলি হেসে-খেলেই কাটছিল। পাড়ায় ছোট একটি মাঠ আছে। একদিন কোয়ান্টামের ছাত্ররা সেখানে প্যারেড করতে এসেছিল। সেদিন ভেবেছিলাম আমিও যদি প্যারেড করার সুযোগ পেতাম! তখনো জানতাম না আমি কোয়ান্টামে পড়ব।

এই ঘটনার ঠিক পরের বছর, ২০০৫ সাল। এলাকায় পড়াশোনার তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। বাবা বললেন, তোমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাঠাব। আমি খুশি মনে রাজি হয়ে গেলাম। ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্যও হলাম। জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে কোয়ান্টামে গেলাম নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে। আমার সাথে সেদিন অনেকেই এসেছিল। তাদের সে কী কান্না! কিন্তু সেদিন আমি একটুও কাঁদি নি।

এরপর এক বড় ভাই এসে আমার জিনিসপত্র সব নিয়ে গেল। তারপর

ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখাতে আমাকে নিয়ে বের হলো। পার্কে ঘুরলাম, দোলনায় চড়লাম। বর্তমানের যেটি লামা সেন্টার সেটি ছিল আমাদের প্রথম ক্যাম্পাস। তখনকার ঘরগুলো ছিল সব বেড়ার আর টিনের। ঘরও ছিল হাতে গোনা কয়েকটা। বিদ্যুৎ বা সোলারও ছিল না। ছিল জেনারেটর, নয়তো হারিকেন।

তখন যানবাহনের ব্যবস্থা ভালো ছিল না। আমাদের বাজার আনতে দূরে যেতে হতো। তারপরও কষ্ট ছিল না। খুব আনন্দ নিয়েই দল বেঁধে বাজার আনতে যেতাম আমরা। যে রাস্তা দিয়ে আমরা বাজার আনতে যেতাম সে রাস্তা কখনো কখনো বন্ধ করে দেয়া হতো। স্থানীয় লোকজন প্রথমে কোয়ান্টামকে সেভাবে গ্রহণ করতে চায় নি। কারণ বিভিন্ন ধর্মের ও জনগোষ্ঠীর মানুষ একসাথে কীভাবে থাকে, এটা অনেকের পছন্দ ছিল না। কিন্তু আমরা কখনো বাগবিতণ্ডায় যাই নি। মাঝে মধ্যে বিকল্প হিসেবে পাহাড়ি ঝিরি পথে আমরা যেতাম বাজার আনতে। এরপর রান্নার জন্যে লাকড়ি কুড়াতাম রাবার বাগানে। শুক্রবারে দল বেঁধে ঘুরতে যেতাম, মাছ ধরতাম, সাইকেল চালাতাম। কত আনন্দই না করেছি! এখানে এসেই শিখলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গুছিয়ে থাকার বিষয়গুলো।

দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে আমাকে নাচ-গান শেখানো হলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে আমি অংশ নিতাম। আমার মতো লাজুক প্রকৃতির ছেলের পক্ষে এসব কখনোই সম্ভব হতো না যদি এখানে না আসতাম। সেই বিশ্বাসই তৈরি হতো না। সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠতাম দেশাত্মবোধক গান শুনে। মাঝে মাঝে পিকনিকের আয়োজন থাকত। বছরে দুবার ছুটি পেতাম। এপ্রিলে আর ডিসেম্বরে। ডিসেম্বর মাস অনেক আনন্দের হতো। প্যারেড ও ডিসপ্লে করতাম ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের জন্যে।

পঞ্চম শ্রেণির একটি ঘটনা আমার আজও মনে পড়ে। আমি তখন পিইসি পরীক্ষার্থী। তাই এপ্রিলে ছুটি ছিল না। কিন্তু আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল। আমাদের ইনচার্জ স্যারের কাছে একবার বায়না ধরলাম। স্যার, বাড়ি যাব। আমার সাথে কয়েকজনও যেতে চেয়েছিল। স্যার রাজি হলেন না।

আমিও ক্লাস না করার জেদ ধরলাম। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে সিদ্ধান্ত হলো আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে। এটা শুনে স্যারের কাছে ক্ষমা

চাইলাম। কিন্তু পরদিন সকালে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো। সাথে একজন দায়িত্বশীল ছিলেন। সেদিন অনেক কেঁদেছিলাম এই ভেবে—সত্যিই কি আমার আর ফেরা হবে না কোয়ান্টামে? বাড়ি পৌঁছে বাবাকে সেই দায়িত্বশীল বুঝিয়ে বললেন যে, আমাকে যেন আবার বিকেলে কোয়ান্টামে নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর বাবা আমাকে বিকেলের দিকে আবার স্কুলে পৌঁছে দিলেন। তখন ইনচার্জ স্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হেসেছিলেন। আসলে স্যার সেদিন বুদ্ধি করেই আমার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছেটা পূরণ করেছিলেন।

আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি ২০১০ সালে। তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। যদিও এর আগে থেকে নিয়মিত মেডিটেশন করানো হতো আমাদের। কোর্স করতে যাওয়ার সুবাদে ঢাকার মিরপুর চিড়িয়াখানা, সামরিক জাদুঘর, নভোথিয়েটার দেখার সুযোগ হলো।

আমরা ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস শুরু করি নতুন ক্যাম্পাস, গিরি ফিকরানে। বিভিন্ন খেলাধুলা ও কার্যক্রম শুরু হলো। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে নিয়মিত গল্পের বইয়ের পাঠক হয়ে গেলাম। তিন গোয়েন্দা বেশি ভালো লাগত আমার। নিজেকেই তখন কিশোর চরিত্রে কল্পনা করতাম।

২০১৩ সালে আমি জেএসসি পরীক্ষার্থী। সেই বছর কোয়ান্টাম মেথড কোর্স রিপিট করার সুযোগ পেলাম। এরপর থেকেই নিয়মিত মন থেকে মেডিটেশন চর্চা করি। আসলে প্রথম কোর্স যখন করেছিলাম তখন বয়স কম থাকায় তেমন মনোযোগ দিতে পারি নি। এবার তা পারলাম।

ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞান বিভাগে পড়ব। কিন্তু তখনো স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয় নি। কিন্তু জেএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের পর স্যারেরা বললেন, এবার থেকে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হবে। যেহেতু জেএসসি-তে এ প্লাস পেয়েছিলাম তাই সহজেই বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সুযোগ পেলাম। আমরাই ছিলাম বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম ব্যাচ। মাত্র ১৩ জনকে নিয়েই শুরু।

আমরা একসাথে মুভি দেখতাম। তখন মুভি দেখার মজাই ছিল আলাদা। মিস্টার বিন, হ্যারি পটার আরো কত মুভি! সত্যিই অসাধারণ ছিল সময়গুলো।

গিরি ফিকরান ক্যাম্পাস থেকে আমরা খেলতে যেতাম গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান মাঠে। আমি সৌভাগ্যবান যে, ২০০৯ সালে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা দিবসের শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজে আমাদের স্কুল প্রথম অংশ নেয়। সেই প্যারেড দলের আমিও একজন ছিলাম। ২০১৪ সালে আমি

নবম শ্রেণিতে। তখন আমার নতুন একটা অভ্যাস তৈরি হলো, যখনই মন খারাপ হতো প্রকৃতির মাঝে চলে যেতাম। মেডিটেশন করতাম আর গাছের সাথে কথা বলতাম। গিরি ফিকরান ক্যাম্পাসে যখন দেবকাঞ্চন ফুল ফুটত, এর সুঘ্রাণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তখন আমার মনটাও খুব ভালো থাকত। এখনো চোখ বন্ধ করলে আমি ঐ ফুলের ঘ্রাণ অনুভব করি।

সেই বছর শেষের দিকে শুনলাম নতুন ক্যাম্পাস ভ্যালি হিকমানে যেতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ গিরি ফিকরান ক্যাম্পাসটা আমার অনেক প্রিয় ছিল। কত স্মৃতিই না জমে আছে সেখানে! মাঝে মাঝে বিকেলে কোচিং ফাঁকি দিয়ে বন্ধুরা মিলে মার্বেল খেলতাম। যে হেরে যেত সে বিজয়ী বন্ধুকে খাবারের সময় তার ভাগের ডিম দিয়ে দিত।

আর ঈদের সময় তখন ঢাকা থেকে মেহমান, গুরুজী ও মা-জী দাদু আসতেন। সবার সাথে ঈদ উদযাপন হতো। ধ্যান উৎসব হতো।

হ্যান্ডবল খেলায় আমার কিছুটা পারদর্শিতা ছিল। ২০১৫ সালে হ্যান্ডবল খেলার জন্যে সিলেট ও দিনাজপুর যাওয়ার সুযোগ হলো। এরপর ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। তারপর কলেজ শুরু হলো। প্রায় সময় কোয়ান্টামমের আরোগ্যশালায় পাথরে বসে আমি মেডিটেশন করতাম। এটি আমার প্রিয় একটি স্থান।

২০১৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। এরপর ইউনিভার্সিটি ভর্তির যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে আশানুরূপ ফল এলো না। দুটোতেই অপেক্ষমাণদের তালিকায় ছিলাম। আমি সবসময় বিশ্বাস করতাম স্রষ্টা যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

সে বছরই অক্টোবর মাসে কোয়ান্টাম থেকে চলে এলাম বাসায়। আসার আগের দিন রাতে খুব কেঁদেছিলাম। বিদায়ের ঘণ্টা বেজেছে ভেবেই বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। ২০১৯ সালের পুরোটা সময় ছিলাম বান্দরবানে। বান্দরবান থেকেই কম্পিউটার ও ইংরেজি কোর্স করি, পাশাপাশি টিউশনি করাতাম।

সংগ্রাম যে কী জিনিস তা কোয়ান্টাম থেকে বেরিয়ে বুঝতে পেরেছি। কোয়ান্টামে থাকতে খাবার, পোশাক, চিকিৎসার কোনো চিন্তা করতে হয় নি। না চাইতেই সবকিছুই পেয়েছি। ছিলাম ইতিবাচক বলয়ে। চারদিকে শুধু ইতিবাচক কথাই শুনতাম। ফলে বিশ্বাস ও মনোবল দুটোই দৃঢ় ছিল। কিন্তু কোয়ান্টাম থেকে বেরিয়ে বুঝলাম কতটা নেতিবাচকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ।

যা-হোক এরপরের জীবনটা ছিল সংগ্রামের জীবন। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা টিউশনি করাতাম। দুপুরে কম্পিউটার ও ইংরেজি কোর্স। সিদ্ধান্ত নিলাম রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবো। সেই অনুযায়ী রাতে যে সময়টুকু পেতাম তখনই পড়তাম। একঘণ্টার পথ পায়ে হেঁটে টিউশনি করাতে যেতাম আবার হেঁটে আসতাম। কখনো বাসায় ফিরতাম বৃষ্টিতে ভিজে। তারপরও অনেক আনন্দ ছিল মনে।

কোয়ান্টামে থাকতে সাদাকায়নের আলোচনায় স্যারেরা বলতেন, মানুষের জীবনে কষ্ট আসতেই পারে, কিন্তু নৈতিকতা আর মনোবল না থাকলে সে হাল ছেড়ে দেয়। কখনো হয়তো নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

তখন চলছিল আমার কষ্টের সময়। মাঝে মাঝে টিউশনের নাশতাটাই ছিল আমার খাবার। এমন সব পরিস্থিতির মধ্যে আমি ২০১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক ইউনিটে পরীক্ষা দিলাম। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চান্স পেলাম। বর্তমানে এখানেই অধ্যয়নরত আছি আমি।

আমি গর্ববোধ করি, আমার পাড়া থেকে আমিই একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। আমার এলাকায় ছাত্রছাত্রীরা কলেজ শেষ করতে পারলে আশেপাশে কোনো কলেজে ডিগ্রিতে পড়ার স্বপ্ন দেখে। তাদের মনে কখনো উদয় হয় না যে, তাদের পক্ষেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সম্ভব।

তার অবশ্য কারণ আছে। সেখানে প্রতিনিয়ত শুনতে হয়—এত পড়ে কী করবে? সব বাদ দিয়ে ছোট কোনো একটি চাকরি করো।

এসব এড়িয়ে গিয়ে লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে সংগ্রাম করে যাওয়া কেবল দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেই সম্ভব, যা কোয়ান্টামে ১৪ বছর থাকার ফলে লাভ করেছি। আমি নিজস্ব একটি সফটওয়্যার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যার নাম হবে Heaven, এই লক্ষ্যেই আমি এগোচ্ছি, সংগ্রাম করে যাচ্ছি। □

আমার পথ চলায় মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি

রেংতম ম্রো
ইংরেজি বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিটি মানুষের গল্প ভিন্ন। আমার গল্পটাও তেমন। ২০০১ সালে লামার টংকাবতি হেডম্যান পাড়ায় আমার জন্ম। শিশু অবস্থায় আমি খুব অসুস্থ ও দুর্বল ছিলাম। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, আমি মারা গেছি বলে সবাই ধরে নিয়েছিল। আমাকে কবরে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি কান্না করে উঠেছিলাম। তখন আমার বয়স হয়তো দুই বছর। যার কারণে আমি ছোটবেলায় সবার কাছ থেকে বেশি আদর পেয়েছি। দাদির কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি আদর পেয়েছিলাম।

আমরা তিন ভাই এক বোন। ভাইদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বড়। আমার মা-বাবা জুমচাষ করেন। আমার এই পথ চলায় আমার মায়ের অবদান অনেক বেশি। আমার মা আসলে অসাধারণ একজন নারী। আমার জন্যে তার ত্যাগ বলে শেষ করা যাবে না। নিজে না খেয়ে দিনমজুরির কাজ করে হলেও

আমাদেরকে ভালো রেখেছেন। তিনি নিজের খরচ বাঁচিয়ে আমাদের জন্যে খরচ করেন। কারো সাথে তার তুলনা হয় না।

আমার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমার পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হবে। তারপর অনেক খোঁজ করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সন্ধান মিলল। আমি যখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের এখানে ভর্তি করাতে চাইত না। কেননা তখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলকে ঘিরে নানারকম গল্প প্রচলিত ছিল। অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের ভর্তির কয়েকদিন পর আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

আমার মা বলতেন, 'আমি অশিক্ষিত, কিন্তু আমার সন্তানেরা যেন অশিক্ষিত না থাকে। আমি যেমন অবহেলিত ছিলাম আমার সন্তানেরা যেন এরকম অবহেলার শিকার না হয়।' আসলে এই আশা থেকেই আমাকে এই স্কুলে ভর্তি করানো হয়। আর আমাদের এলাকায় তখন স্কুলও ছিল না।

প্রথমদিকে আমার খুব খারাপ লাগত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা আমার একঘেয়েমি লাগত। পড়ালেখায় মন বসত না। আমার প্রাইমারি স্কুলের জীবনটা এভাবেই কেটে গেল।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমাদের একজন নতুন ইংরেজি শিক্ষক এলেন। তার মাধ্যমে আমি পড়ালেখায় আরো উৎসাহিত হলাম। আমি ইংরেজিতে খুব দুর্বল ছিলাম। ইংরেজি বিষয়টি আমার ভালো লাগত না। নাজমুল স্যারের সহযোগিতায় আমি ইংরেজিতে ভালো করতে লাগলাম। নবম শ্রেণিতে বাংলা ক্লাস খুব ভালো লাগতে শুরু করে। বাংলা ক্লাস নিতেন কামাল আরিফ স্যার।

আমি এই সময় স্ব-উদ্যোগে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব চালু করেছিলাম। আমি একাই টানা চার বছর ক্লাবটি পরিচালনা করেছি। ছাত্ররা আসুক বা না-ই আসুক, আমি নিজে স্যারদের ডেকে এনে ক্লাবটি চালু রেখেছিলাম। সপ্তাহে দুই দিন শুক্রবার এবং মঙ্গলবার আমাদের ক্লাস হতো। আমি খুব উৎসাহের সাথে ক্লাস করতাম। এমনও দিন গেছে আমি একা ক্লাসে ছিলাম। স্যারকে তার বাসা থেকে ডেকে আনতাম। স্যারদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পরে একসময় প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই ক্লাব চালু হয়ে যায়। এখনো ক্লাবটি চালু আছে।

তারপর আমি কলেজে উঠলাম। কলেজে ক্লাস করে আমি আরো মজা পেয়েছিলাম। কলেজে সাইফ স্যার ইংরেজি ক্লাস নিতেন। স্যারের মাধ্যমে আমি আমার লক্ষ্যের দিকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে ১৪ বছর কাটিয়েছি। এসময়ে আমি আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো পেয়েছি। সেখানে রুটিন অনুসারে সব হয়। বাইরের পরিবেশ তেমনটি না হওয়ায় খাপ খাইয়ে নিতে আমার অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

আজ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকেই একটি স্কুলে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করি। এছাড়াও আমি টিউশনি করি। এভাবে আমি নিজের খরচের টাকা নিজে রোজগার করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বন্ধুদের সাথে আমি সাভারে একটি মেসে থেকে লেখাপড়া করছি। প্রথমদিকে আমি কোনো টিউশনি পাচ্ছিলাম না। অনেক বড় ভাইদের কাছে বলাবলি করেও আমার কোনো টিউশনি হচ্ছিল না। ঐ সময়টা আমাকে অনেক কষ্ট করে চলতে হয়েছিল। পরে আমি লিফলেট ছাপানো শুরু করলাম। লিফলেট ছাপানোর চার-পাঁচ দিনের মাথায় আমার চারটা টিউশনি হয়ে গেল। কলেজের দুই জন ছাত্রকে পড়ানো শুরু করলাম, ইংরেজি আর অ্যাকাউন্টিং। তারপর অষ্টম-নবম শ্রেণির ছাত্র পেলাম।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যে বন্ধুমহল তৈরি হয়েছে তা স্কুল জীবনের মতো না। স্কুল জীবনের বন্ধু আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমি এখনো সেই ছোটকাল থেকে একসাথে বেড়ে ওঠা বন্ধুদের মিস করি। মাঝে মাঝে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ক্যাম্পাসে যেতে খুব ইচ্ছে করে।

আমাদের পাড়া থেকে কলেজে পড়াশোনা করেছে আমিসহ মাত্র দুই জন। আমি আর আমার এক চাচা। সেখান থেকে এই পর্যায়ে উঠে আসতে পেরে আমি ঈশ্বরের কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এলাকার মানুষের জন্যে কিছু করার ইচ্ছাই আমার সামনে এগিয়ে চলার শক্তি। জীবনে আমি একজন ভালো শিক্ষক ও সমাজসেবক হতে চাই। আমি আমার পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে চাই। □

আমি পারি আমি পারব

ক্যথোয়াইপ্রু মার্মা ঝিঝি
লোক-প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি আঁধারে নিমজ্জিত রুগ্ণ আলোহীন সমাজ হতে এক আলোর পথের দেখা পেয়েছিলাম। সেই আলোর পথটা ছিল সুস্পষ্ট ও সুন্দর। সেই পথে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। শঙ্কিত ছিলাম মায়ের মমতার অভাব, বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আহত হবো। কিন্তু না, সুনিবিড় ও মমতাময় পরিবেশ আমার আমিত্বকে নতুন করে চিনতে সহায়তা করেছিল।

আমি অনুভব করেছিলাম আমার মাঝে সুপ্ত প্রতিভা আছে। আমি সত্যিই আপ্লুত হয়েছিলাম। প্রতিনিয়ত কম্পিত করছিল হৃদয়কে—আমি পারি আমি পারব। নিজেকে পারব বদলাতে। পেরেছিলামও বটে। প্রতিভা নামক এক সুপ্ত লাভা উদ্‌গিরণ করতে পেরেছিলাম এক শিক্ষালয়ে—সেই মায়াময়, জ্ঞানালয় আমার হৃদয়ের মধ্যমণি হলো কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।

দীর্ঘ একযুগেরও বেশি সময় এই স্কুলে লালিত হয়েছি। কোয়ান্টামমের রূপ, গন্ধ, চিরচেনা ছন্দগুলো আজও ভুলতে পারি নি আমি। কত যে স্মৃতিময় মুহূর্ত ঐখানে কেটেছে, সেগুলো লিখতে গেলে এক মহাকাব্যের রূপ নেবে।

সময়ের বিবর্তনে আমাদের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের অনেক পরিবর্তন লক্ষ করেছি। ক্যাম্পাসের পরিধিও বেড়েছে কয়েক গুণ। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে।

আমি ২০০৬ সালে কসমো স্কুলে ভর্তি হই। পারিবারিক অবস্থা ও মেধা দুটোই ভালো ছিল না। দুষ্টামি করাই ছিল আমার শখ। যখন ভর্তি হয়েছিলাম তখন অ আ ক খ বলতে ও লিখতে পারতাম। কিন্তু বানান করে পাঠ করতে পারতাম না। আমাদের ব্যাচের মধ্যে আমিই সবার শেষে ভর্তি হয়েছিলাম। যা-হোক স্কুলে থাকাকালীন আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা প্রায় মনে পড়ে।

আমি খামখেয়ালি আর খাপছাড়া স্বভাবের ছিলাম। ঘটনাটি আমার হাত ভেঙে যাওয়া ও প্রথম বানান করে বাক্য পড়তে পারার ঘটনা। শিশুশ্রেণিতে সদ্য ভর্তি হওয়া ছাত্র ছিলাম। পার্ক ছিল আমার প্রিয় জায়গা। সন্ধ্যা হলেই পার্কে ছুটে যেতাম। আর স্লাইড রাইডটি ছিল আমার সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয়। দৌড়ে স্লিপারে উঠতাম আর স্লিপ খেতাম। এভাবে একদিন স্লিপিং করতে দৌড়ে উঠেছিলাম আর যেই না নামতে যাব, তখন দেখি এক ছেলে স্লিপারের মাঝ পথে ব্লক করে রেখেছে। পরোয়া না করে স্লিপিং করতে গেলাম আর অমনি ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যাই। তারপর আমার কী হয়েছে সেটা সঠিক মনে নেই। পরে দেখি আমার হাত ভেঙে গেছে। মানিক স্যারের সাথে চট্টগ্রামে গিয়ে হাত ব্যান্ডেজ করা হলো। কয়েকদিন পর চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসালয় শাফিয়ানে ভর্তি থাকলাম।

এর মাঝে একদিন শৈক্য নামে রোগা এক ছেলে মাথায় ব্যান্ডেজ অবস্থায় শাফিয়ানে ভর্তি হলো। শৈক্য এখন বুয়েটে পড়ছে। কিছুদিন পর উসেন নামে সুন্দর অমায়িক ছেলে একটা ফোঁড়া নিয়ে ভর্তি হয়। উসেন এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। আমি ফোঁড়াকে খুব ভয় পেতাম। তাই উসেনের কাছ থেকে দূরে থাকতাম। একদিন শৈক্যের পাশে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ শৈক্যকে বানান করে করে কবিতা পাঠ করতে শুনি। এরপর খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকি। আর বানান করে পুরো বাক্য পড়ার পদ্ধতিটা বুঝতে চেষ্টা করি এবং বোধহয় তখন থেকেই আমার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ জন্মে। তারপর অনেক আয়ত্ত করে ফেলি একসময়। পরে শৈক্যের থেকে বইটা নিয়ে আমি পড়তে শুরু করি ঠিক যেভাবে শৈক্য পড়ছিল। আর তখন থেকেই আমি মোটামুটি বাক্য

পড়তে পারি। বোধহয় তখন থেকেই আমার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ জন্মে। তারপর অনেক দিন কেটে যায়।

একবার কোনো কারণে মায়ের কথা খুব মনে পড়ছিল। কিন্তু তখনো আমার অভিভাবক আসতে অনেক দেরি। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার মা এসেছেন আমাকে দেখতে। আমাকে দেখামাত্রই মা কেঁদে ফেলেন। আমিও কাঁদতে থাকি। তখন থেকেই দুষ্টামি করার শখটা বোধহয় উবে গেল। এরপর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলো। আমি ভাবতে লাগলাম, আমাকে মানুষ হতে হবে। বড় হতে হবে। মায়ের কান্নার উত্তম উপহার দিতে হবে।

আমার লেখা একটি কবিতা—

কোয়ান্টা

কোয়ান্টা মোরা আলোর কণা,
সত্যের অভিসারী।
জ্ঞানের আলোয় আলোকিত মোরা,
ন্যায়ের অভিযাত্রী।
কোয়ান্টা মানে প্রস্ফুটিত আর দৃঢ়বন্ধন।
হাজারো ফুলের সুগন্ধির সংমিশ্রণ।
কোয়ান্টা মানে শান্ত হ্রদের পানির কলরব।
নিবিড় আঁধারের প্রদীপের স্থির শিখা।
কোয়ান্টা মানে শৃঙ্খল আর ছন্দের দৃঢ় তাল।
দৃঢ় প্রত্যয় আর মনোবলের আধার।
কোয়ান্টা মানে গভীর বিশ্বাস আর অতুল মমতার বান।
একতার আর ঐক্যের মিলনায়তন।
কোয়ান্টা মানে ঝিনুক মোড়ানো উজ্জ্বল মণিমুক্তা।
আগ্নেয়গিরির ঐ সুপ্ত জ্বলন্ত লাভা।
পূর্ব আকাশের লাল সূর্যের আভা।

□

আমার ধ্যানজ্ঞান জুড়ে শুধুই আর্চারি

ভানরুম বম
পুলিশ আর্চারি ক্লাবের খেলোয়াড়

নিজেকে একজন আর্চার বলে পরিচয় দিতে আমি যতটা আনন্দবোধ করি, ততটা আমি অন্য কিছুতে পাই না। কারণ এর মাঝেই আমি আমার ভেতরের সত্তাকে খুঁজে পেয়েছি। আর এই জীবনের লক্ষ্যটা আমি নির্ধারণ করেছিলাম আমার প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা নিজেকে গড়ে তোলার জায়গা যা-ই বলি না কেন—সেই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে।

২০০৫ সালে আমি এখানে ভর্তি হয়েছিলাম। এই স্কুলের একজন সিস্টার টুয়ান বম আমার বাবার পরিচিত ছিলেন। তার কাছেই বাবা এই স্কুল সম্পর্কে জেনেছিলেন। বাবা আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেলেন। বাবা সেদিন আমাকে প্রথমে টুয়ান সিস্টারের কাছে কিছুক্ষণ থাকতে বললেন। তারপর সিস্টার আমাকে একটি রুমে নিয়ে গেলেন। আর এই ফাঁকে বাবা দিলেন রওনা। আমার তো কান্নাকাটি শুরু হলো। সিস্টার আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে গোসল করাতে নিয়ে গেলেন। তারপর কিছুদিন বাড়ির কথা মনে করে খুব

কেঁদেছিলাম। বাবার প্রতি অভিমানও ছিল। কেন আমাকে তিনি দিয়ে গেলেন? কিন্তু এখন বুঝতে পারি তিনি কেন আমাকে সেই ছোট বয়সে এই স্কুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন যেন আমি শিক্ষিত হতে পারি। মানুষ হতে পারি।

২০১৮ সাল পর্যন্ত আমি এই প্রতিষ্ঠানে ছিলাম। তারপর বাইরের জগতে পা দেই। বুঝতে পারি আমাদের স্কুল অন্য সব স্কুল থেকে আলাদা। কারণ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও ছাত্রাবাসের সবকিছু একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হয়। কিন্তু স্কুলে থাকা অবস্থায় তা উপলব্ধি করতে পারি নি। আমাদের চমৎকার একটা রুটিন ছিল। সকাল ৫টায় ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে পানি খেয়ে মাঠের দিকে রওনা হতাম। মাঠে গিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট বের করে নিজের ওয়ার্ম আপ সেরে নিতাম। তারপর ভেজানো কাঁচা ছোলা খেয়ে অনুশীলন শুরু করতাম। তারপর আবাসনে এসে ফ্রেশ হয়ে সকালের খাবার খেয়ে স্কুলে যেতাম। দুপুর পর্যন্ত স্কুল চলত। স্কুল থেকে এসে ড্রেস চেঞ্জ করে জার্সি পরে ডাইনিংয়ে খেতে যেতাম। ৩টার মধ্যে দুপুরের খাবার ও বজ্রাসন শেষ করে মেডিটেশন করতাম। তারপর আবার মাঠে।

বিকেলে মাঠে অনুশীলন শেষ করে খুব ঘেমে যেতাম। তাই আবার গোসল করতাম। ৭টার আগেই রাতের খাওয়া শেষ হতো আমাদের। তারপর সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত রিক্রিয়েশন ক্লাস করতাম। ক্লাস শেষে বাদাম

খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। এই ছিল আমাদের প্রতিদিনের রুটিন। প্রতিদিন মানে প্রতিদিন। তখন অনেক সময় বিরক্ত লাগত—একই রুটিন বার বার। কিন্তু সত্যি এখন মিস করি এই রুটিনের দিনগুলো। শহরের ছেলেদের দেখে এখন মনে হয়, এমন রুটিন কয়জনের ভাগ্যে জোটে!

আমাদের কসমো স্কুল ও কলেজে বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী আছে। সবার সাথেই আমি মিলেমিশে থেকেছি। যার সুবাদে প্রায় প্রত্যেকটি নৃ-গোষ্ঠীরই আমি কিছু না কিছু শব্দ জানি।

আমি সবসময় একাডেমিক পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলাকে বেশি পছন্দ করতাম। এখনো তা-ই আছে। একাডেমিক শিক্ষা প্রয়োজন বলে পড়ছি। তাই স্কুলে থাকতে আমি পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায় দক্ষতা অর্জন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আমি প্রথমে খো খো, তারপর হ্যান্ডবল, তারপর কারাতে এবং সবশেষে ২০১২ সালের শেষের দিকে আর্চারি খেলা শুরু করি। তারপর থেকে আমার ধ্যানজ্ঞান জুড়ে শুধুই আর্চারি।

বসে বসে বড় ভাইদের চর্চা করা আর্চারির বেসিক টেকনিকগুলো দেখতাম। একসময় আমারও আর্চারি শেখার সুযোগ হয়ে গেল। ঢাকা থেকে আসা প্রশিক্ষকের কাছে একসপ্তাহ ট্রেনিং নিলাম আমরা কয়েকজন। ট্রেনিংয়ের কিছুদিন পরেই আমাদের স্কুলে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হলো। সেখানে নবাগত হয়েও আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। ২০১৩ সালে অষ্টম বাংলাদেশ গেমসে আর্চারি র‍্যাংকিংয়ে আমি এগিয়ে ছিলাম। ২০১৮ সাল পর্যন্ত যতদিন কোয়ান্টামে ছিলাম ততদিনে আমি জাতীয় পর্যায়ে পাঁচটি মেডেল পেয়েছি। তার মধ্যে একটি গোল্ড, দুইটি সিলভার এবং দুইটি ব্রোঞ্জ।

এখন আমি বাংলাদেশ পুলিশ আর্চারি ক্লাবের একজন খেলোয়াড়। আমার মনছবি আমি বাংলাদেশের একজন বড় আর্চার হবো। সেই উদ্দেশ্যে আমি এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আর মেডিটেশন আমাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য তখনো করেছিল, এখনো করে। আর্চারিতে ভালো করার উদ্যম ও খেলায় নতুন নতুন মাত্রা আমি মেডিটেশনের মাধ্যমেই পাই। কারণ আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, খেলার সময় মাথা ঠান্ডা রাখার প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। একারণে বর্তমানে আমাদের দেশে আর্চারি জাতীয় টিমের খেলোয়াড়দেরও মেডিটেশন করানো হচ্ছে। □

আমার উপজেলায় বমদের মধ্যে আমিই প্রথম মেডিকেলে পড়ছি

লালসেপঠা বম
এমবিবিএস শিক্ষার্থী, জামালপুর মেডিকেল কলেজ

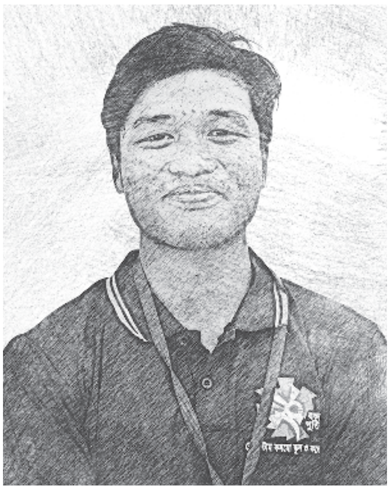

প্রত্যেকেরই একটি পরিচিত বলয় থাকে। সেই জায়গাটিতে সে নিরাপদ অনুভব করে সবচেয়ে বেশি। পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন সে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে, তখন সেটা তার জন্যে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল ২০০৫ সালে। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। আমার বাবা আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।

আমাদের ব্যাচে ৩৫ জনের মতো কোয়ান্টা ছিল। আমার কিছু ব্যতিক্রমী আচরণ সবার থেকে আমাকে আলাদা করে দেয়। সবসময় মুখ বন্ধ করে বোবা হয়ে থাকা, কেউ আমাকে কিছু বললে কোনো প্রতিক্রিয়া না করে ফ্যাল ফ্যাল করে হাসা, একসাথে খাবারের প্রার্থনার সময় চোখ বন্ধ না করে হা করে তাকিয়ে থাকা!

তখন থেকেই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স ধীরে ধীরে মনের মধ্যে জমতে শুরু করল। হীনম্মন্য হয়ে পড়লাম আমি। নিজেকে সবার কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়ার

প্রয়াসই থাকত সবসময়। এজন্যেই পেছনের সারির বেঞ্চ আমার সবচেয়ে পছন্দের একটা জায়গা ছিল। ক্লাস সিক্সে বার্ষিক পরীক্ষায় খারাপ করলাম।

তারপর ক্লাস সেভেন। আমার উত্তরণের সময়। কারণ এ সময় আমাকে নাজমুল স্যার আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তিনি আমাদের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাকে ইংরেজি গ্রামারের strong verb & weak verb খুব ভালোমতো বুঝিয়ে দিলেন।

একবার কীভাবে যেন আমি ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে গেলাম। আসলে স্যারের পড়ানোর ধরন আমার জন্যে সুবিধার ছিল। তখন থেকেই ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস বাড়তে শুরু করল। একটা সময় উপলব্ধি করলাম, ইংরেজির মতো কঠিন বিষয়ে যেহেতু ভালো রেজাল্ট করতে শুরু করেছি সেহেতু অন্য বিষয়েও তো চেষ্টা করে দেখতে পারি। চেষ্টা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে দেখলাম সবকিছুই আমার অনুকূলে আসতে শুরু করেছে। বার্ষিক পরীক্ষায় গোল্ডেন এ প্লাস পেলাম।

কিন্তু এবার আমার আত্মবিশ্বাস আত্মগর্বে পরিণত হলো। অধ্যবসায় কমিয়ে দিলাম। দেখা গেল ক্লাস নাইনে আমি লেখাপড়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ফলস্বরূপ বার্ষিক পরীক্ষায় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, হায়ার ম্যাথ ও ইংরেজি—এই চারটায় খুব ভালোমতোই ফেল করলাম!

পরের বছর এসএসসি পরীক্ষা। হাতে সময় একবছর। দুবছরের পড়া একবছরে কীভাবে পড়ব বুঝতে পারছিলাম না। মনস্থ করলাম—আমি এবার পড়ব। আমি পারব।

এমন দিন গেছে—ঈদের আগের দিন সারারাত গণিত করেছি। এজন্যেই হয়তো এসএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পেরেছিলাম।

যখন একাদশ শ্রেণিতে উঠলাম তখন মনে হলো সুদূরপ্রসারী একটা লক্ষ্য স্থির করা উচিত। এ নিয়ে আমার জীবনের একটি অভিজ্ঞতা আমার লক্ষ্য স্থির করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফুটবল খেলতে গিয়ে আমার বাম হাতের শোল্ডার জয়েন্ট ডিসলোকেটেড হয়ে যাওয়াতে আমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তার আমার হাতটা জোড়া

লাগানোর সময় আমার সাথে খুব সুন্দরভাবে গল্প করলেন। আমি অনুভব করলাম একজন ডাক্তার রোগীর মনে খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পারেন।

পরে ক্যাম্পাসে গিয়ে বন্ধুদের সাথে এসব বিষয় শেয়ার করেছি। তখনো লক্ষ্য স্থির হয় নি। কিন্তু গল্পটা বার বার শেয়ার করাতে মনের অজান্তেই মেডিকেলে পড়ার প্রতি একটা ভালোলাগা কাজ করতে শুরু করল। আসলে আমরা মনে মনে যা চিন্তা করি সেটা বাস্তবে প্রতিফলন ঘটে। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। একটা সময় মেডিকেলে পড়ব এটা শতভাগ স্থির হয়ে গেল। পড়ার প্রতিও আগ্রহ বেড়ে গেল আমার।

কিন্তু সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল এইচএসসি রেজাল্ট। জিপিএ পেলাম ৪.৬৭। ভর্তিযুদ্ধ আমার জন্যে কঠিন হয়ে গেল। আমি চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। এসময় আমাদের ভর্তি কোচিংয়ের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড় ভাই এসেছিলেন। তিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং বলতেন—লালসেপঠা, তুমি অবশ্যই পারবে!

ঐ তিন মাস আমার অন্যরকম কাটল। পড়ার জন্যে খাওয়া-দাওয়ায় প্রচুর অনিয়ম করেছি, ঘুম ঠিক ছিল না। একপর্যায়ে অসুস্থ হয়ে গেলাম। সন্দেহ ছিল আমার চান্স হবে কিনা। তাই যখন রেজাল্টের পর জামালপুর মেডিকেলে আমার নামের লিস্ট এলো, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সত্যিই আমি চান্স পেয়েছি! জানতে পারলাম, আমি আমার উপজেলা রোয়াংছড়ির বম জাতির মধ্যে মেডিকেলে প্রথম চান্স পেয়েছি।

২০০৫-২০১৮ দীর্ঘ ১৪ বছর কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে ছিলাম। কখনো কখনো মনে হতো জীবনটা এরকম না হয়ে অন্যরকম তো হতে পারত! ক্লাস ফাঁকি দিয়ে শুধু খেলতে এবং ঘুমাতে মন চাইত। মাঝেমধ্যে কিছুই ভালো লাগত না। রসকষহীন একটা জীবন। মনে হতো বাইরের ছেলেরা কত মজা করে, আর আমরা এখানে বন্দি! মনে মনে স্যার, ম্যাডামদের প্রচুর মন্দ কথা বলেছি, সমালোচনা করেছি।

কিন্তু এখন অনুভব করি তারাই আমাদের ছায়া দিয়ে রাখতেন। খুব মিস করি প্রিয় স্যার, ম্যাডামদের। আমি কোনো কালেই মেধাবী ছাত্র ছিলাম না। যেখানে একটি পড়া পড়তে অন্যদের একঘণ্টা লাগে, সেখানে আমার লাগত দুই-তিন ঘণ্টা। কিন্তু ভালো লেগে গেলে আমার মধ্যে একমনে অধ্যবসায় করার বিষয়টি রয়েছে। এই শক্তি আমার চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করতে সাহায্য করে। আমার পরিবার থেকে শুধু আমিই না, আমার ছোট ভাইও

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ভোকেশনাল থেকে এসএসসি পাশ করেছে।

যারা আমার এই সাফল্যের পেছনে সময়, শ্রম, মেধা দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারব না। আমার জীবনে শুধু এটুকু অর্জনই যথেষ্ট নয়। সামনের পথগুলো আরো কঠিন এবং প্রতিকূল, তা আমি জানি। কিন্তু সেগুলো অতিক্রম করার সাহসও আমার আছে।

প্রিয় অনুজদের কিছু বলছি, একটি বাঘ যখন হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে লাফ দিবে তখন সে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে লাফটা দেয়, যাতে সে বেশি দূরত্বে লাফ দিতে পারে। তেমনিভাবে তুমি তোমার জীবনে বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে যেতে পারো। তারপরও বাঘের মতো কিছুটা পিছিয়ে যেয়ে লাফ দেয়ার চেষ্টা করো। ভালো রেজাল্টের জন্যে তোমার মেধাবী হওয়ার দরকার নেই। শুধু আগ্রহ ও নীরবে একটানা পরিশ্রম করার প্রয়াস থাকাটাই যথেষ্ট। আর তোমার ভালোলাগার বিষয়গুলো নিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে শিখো। □

আমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে

হালিরাম ত্রিপুরা

ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

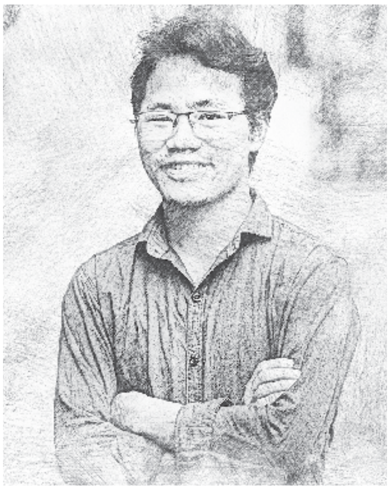

মা-বাবা, চার ভাই ও এক বোনকে নিয়ে আমাদের পরিবার। আমার বাড়ি লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের বেকছড়া পাড়ায়। বাবা জুমচাষ করতেন একসময়। কিন্তু বাবার চোখে সমস্যা থাকায় মাকেই সব কাজ করতে হয় এখন। তবে ২০১৪ সাল থেকে পরিবারের হাল ধরেন আমার বড় ভাই। তিনি কোয়ান্টামেই চাকরি করেন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাকি দুই ভাই স্কুলে পড়ছে। আর আমি সেই শিশুকাল থেকেই বাড়ির বাইরে আছি, প্রথমে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, তারপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

২০০৬ সালে পাঁচ বছর বয়সে বাবা আমাকে শিশুশ্রেণিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। আসলে ঐ সময় আমাদের এলাকায় পড়ালেখার কোনো সুযোগ বা ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে এলাকার যে প্রাইমারি স্কুলটি আছে, তখন সেটার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল মাত্র। কসমো স্কুলে আসায় মা-বাবা এতটুকু নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তাদের সন্তান নিরক্ষর থাকবে না। তাই আবাসিক একটি স্কুলে পাঠাতে তারা ভয় পান

নি। আর সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল আমার আত্মীয় রাংকামা ত্রিপুরা। তিনি তখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একজন সিস্টার ছিলেন। এখনো তিনি সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন। এভাবেই শুরু হলো আমার স্কুল জীবন।

কোয়ান্টামে আমার স্পোর্টস ছিল খো খো। আমরা সবাই মিলে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতাম। বাইরে অনেকে খো খো নামে কোনো খেলা আছে তা জানে না। পাশাপাশি আমি ফুটবল খেলতে পছন্দ করি। প্রতি শুক্রবার আমরা স্যারের অনুমতি নিয়ে হ্যান্ডবল দিয়ে ফুটবল খেলতাম। ছোটবেলায় খুব মজা করেছি।

আমি কৃতিত্বের সাথে প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে হাই স্কুলে উঠলাম। একদিন ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমার বাবা কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি ভালো একটি স্কুলে পড়ো, কোয়ান্টামে পড়ো, তোমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। সেদিনের ঐ কথাটা এখনো মাঝে মাঝেই আমার মনে পড়ে। কোয়ান্টামের প্রতি বাবার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

আসলেই মানুষের মতো মানুষ হওয়ার হাজারো সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম কোয়ান্টামে। দেশবরেণ্য অনেক ব্যক্তিদের কাছ থেকে দেখার এবং তাদের মূল্যবান কথা শোনার সুযোগ হয়েছে আমাদের। বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এম শমশের আলী স্যারের কথা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল যে, 'তোমরা শুধু এই অঞ্চলের সন্তান নও, তোমরা সমগ্র বাংলাদেশের সন্তান।' এই কথাটি আমাকে এখনো অনুপ্রাণিত করে।

ধাপে ধাপে স্কুল ও কলেজ শেষ করলাম। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পালা। কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট আশানুরূপ না হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির তীব্র ইচ্ছা থাকলেও আমি পরীক্ষা দিতে পারি নি। আসলে আমি খেলাধুলায় একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছিলাম। কিন্তু কষ্ট পেলাম যখন জানলাম এইচএসসি-র পয়েন্ট কম থাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও স্পোর্টস সায়েন্স ছাড়া অন্য কোথাও আমার ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ নেই। প্রথমে কিছুদিন হতাশ ছিলাম। দুশ্চিন্তা আর বিষণ্নতা আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। তবে আমি সৌভাগ্যবান যে, মেডিটেশনকে ছোট বয়স থেকে পেয়েছি। সেই সুবাদে নেতিবাচকতা বেশিদিন আমাকে বন্দি করে রাখতে পারল না।

একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিমাত্র বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে আমি মেধাতালিকায় চান্স পেলাম। পরম প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা যে, আমি ছোটবেলা থেকে কোয়ান্টামের মতো এক অনন্য সঙ্ঘের ছায়া পেয়েছি। এলাকার অন্য দশ

জন ছেলে আর আমার মধ্যকার পার্থক্যই তা প্রমাণ করে।

তাই আমার নিজের গ্রামকে আলোকিত করার মনছবি দেখি। আমাদের গ্রামে এখনো শিক্ষার আলো ঠিকমতো পৌঁছায় নি। এ কারণে অধিকাংশই মনে করে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ মানে যথেষ্ট লেখাপড়া হয়েছে। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে পড়ছি তখন পাড়ার প্রধান বলেছিলেন, 'তোমার তো লেখাপড়া শেষ। তোমার বাবার চোখের সমস্যার জন্যে কাজ করতে পারেন না। কোনোমতে একটা চাকরি করে সংসার দেখো!' আসলে তাদের ধারণাই নেই যে, উচ্চ মাধ্যমিকের পরও লেখাপড়া আছে। আর সেই পড়া শেষ করে আরো ভালো কিছু করা সম্ভব।

গ্রামের কিছু মানুষ এখনো আমাকে অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখে। কারণ আমি শহরে গিয়ে পড়াশোনা করি। যদিও আমি নিয়মিত চেষ্টা করি আমার লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু না কিছু উপার্জন করে পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। আসলে গ্রামের লোকের প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। সময় হলে তারা বুঝতে পারবে। পরিবারকে সুখী সুন্দর সাবলীল জীবন দিতে আমার মতো ছেলেরাই সবচেয়ে বেশি মমতার হাত বাড়িয়ে দিতে সক্ষম সেটা আমি প্রমাণ করে এলাকার মানুষের ভুল ভাঙাতে চাই। তারাও যাতে তাদের ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয় আমি সেটা কামনা করি। □

মনছবি ছিল বুয়েটে পড়ব

শৈক্যচিং মার্মা
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

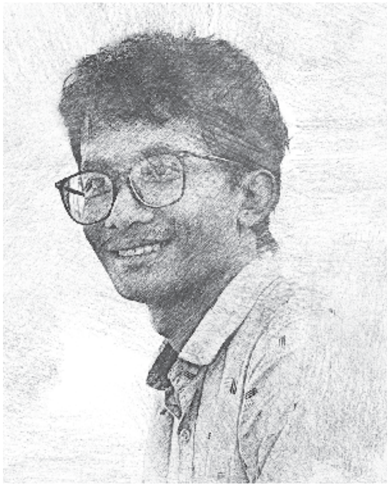

২০০৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত আমার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জীবন। শৈশব এবং কৈশোরের নানান স্মৃতি আছে এই প্রাণপ্রিয় ক্যাম্পাসে। এত এত স্মৃতির ভিড়ে কয়েকটি স্মৃতি বাছাই করা খুব কঠিন। ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার আনন্দটা ছিল অন্যরকম। অনেক গল্প নিয়ে বাড়ি ফিরতাম। ১৩ বছর ধরে এই ডিসেম্বর ফিরে আসত বার বার পেন্ডুলামের ববের মতো, এসময় একটা আবেগ কাজ করত।

আজ আমি বলব আমার সেই ছোটবেলার কথা। কারণ আমার শৈশব ও কৈশোরে বোনা স্বপ্নগুলোর প্রতিফলিত রূপ বর্তমানের এই আমি। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যেত। দীর্ঘ এক মাস ক্যাম্পিং এবং ১৬ ডিসেম্বরের প্যারেড পারফরমেন্স শেষে ১৭ ডিসেম্বরে বাড়ি যেতাম।

সারাবছরের গল্প শোনাতাম বাবাকে, মাকে, দাদাকে, ভাইদের, চাচাদের। রেজাল্ট কী? পরের বছরে কী কী পড়তে যাচ্ছি, কোন স্যার কেমন পড়ান। যদিও গল্পগুলো ছোট ভাই দুইটার সাথেই বেশি হতো। ভাইদের আগ্রহ বেশি

যে। আরও কত কী! সন্ধ্যায় ভাইদের নিয়ে বসতাম। গল্প করতে করতে অনেকটা সময় কেটে যেত।

কী হতে চাই বাবা-চাচারা জিজ্ঞেস করতেন। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন উত্তর। যেহেতু বছরজুড়ে দেশবরেণ্য মানুষেরা আসতেন আমাদের ক্যাম্পাসে, তাদের মতো হতে চাওয়াটাও একেবারে স্বাভাবিক ছিল। তাদের বলা গল্পগুলো মনে গেঁথে যেত। তাদের মতো হতে চাইতাম। এক চাচা প্রায়ই আমাকে আইনজীবী হতে বলতেন। চাচার আশা যদিও রক্ষা করতে পারি নি। কারণ আমার ভালো লাগত অন্য কিছু।

স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে প্রচুর পড়তাম। গল্পের বইগুলোর কিছু চরিত্র মনে গেঁথে যেত। ভাইদের সেই গল্প শোনাতাম। ভালো লাগত রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দা সিরিজের কিশোর চরিত্রটিকে। কিশোরের চুল উস্কোখুস্কো ছিল। চাইতাম আমার চুল উস্কোখুস্কো থাকুক। করতে চাইতাম কাজী দা-র মাসুদ রানার মতো সব সমস্যার সমাধান। হতে চেয়েছিলাম শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত।

ক্লাস নাইনে থাকতে সুনীলের *প্রথম আলো* পড়ে রবীন্দ্রনাথ হতে চেয়েছিলাম। তখন জেনেছিলাম বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সাথেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। একজন কবি ও একজন বিজ্ঞানীর বন্ধুত্ব যে কত গাঢ় হতে পারে সেটা আমাকে অবাক করেছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়* পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্যে কান্না করেছিলাম। ছোটবেলায় জানতাম তিনি অনেক মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন। কিন্তু নাইনে এসে জানতে পারলাম, ঈশ্বরচন্দ্র তার সময়ে অনেক মানুষের কটাক্ষ শুনেছেন, স্বয়ং তার পরিবারের মানুষজনের কাছেও।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *পার্থিব* পড়েও কেঁদেছিলাম অনেক। হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের অ্যালান কোয়েটারমেইন হতে চেয়েছিলাম আফ্রিকা ঘুরব বলে। শার্লক হোমসের উপন্যাস পুরোটাই পড়েছিলাম খো খো খেলার মাঠে। হোমসের মতো যে-কোনো জিনিসে খুব মনোযোগ দিতাম। এমনকি কেউ আমার সাথে কথা বলতে এলেও তার কথা অনেক মন দিয়ে শুনতাম, যদিও আগে এমনটা করতাম না।

মুহম্মদ জাফর ইকবালের তপু হয়ে গণিত অলিম্পিয়াডে সেরাদের সেরা হতে চেয়েছিলাম। তপুর মতো হতে গিয়ে ক্লাস এইট থেকে আর কখনো গণিত মুখস্থ করি নি। বুঝে বুঝে করার চেষ্টা করতাম। না বুঝলে লাইব্রেরিতে চলে যেতাম। জাফর ইকবালের রাশা যেন আমার প্রয়াত ছোটবোন। *বাচ্চা ভয়ংকর কাচ্চা ভয়ংকর* বইটা পড়ে কোনোদিনও আর কোনো পিচ্চিকে অবুঝ মনে করি নি। ওরা সব বোঝে।

বিখ্যাত শিকারি জিম করবেট ক্লাস সেভেনে আমার আইডল ছিল। মন্টে ক্রিস্টর মতো প্রতিশোধ পরায়ণ হতে চেয়েছিলাম। টম সয়্যার আর হাকল বেরি ফিনের মতো ডাকাতের হাত থেকে গুপ্তধন কেড়ে নিতাম স্বপ্নে।

রবিনসন ক্রুসোর মতো কোনো এক দ্বীপে একা থাকার ইচ্ছা হয়েছিল অনেক। হেরমান হেসের সিদ্ধার্থ হয়ে গৃহত্যাগ করার বাসনা জেগেছিল। লক্ষ্যের প্রতি তার যে, অবিচল থাকার প্রয়াস সেটা মনে দাগ কেটেছিল। আমার ছোট ভাইদের সব গল্প শুনিয়েছি। ওরা অনেক পছন্দ করত। আমি ভাগ্যবান যে এত এত বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল স্কুলে থাকতে এবং এই প্রত্যেকটা বই আমার চিন্তা, মনন ও স্বপ্ন তৈরিতে অনেক সাহায্য করেছে। স্কুলে বোনা স্বপ্নগুলোই বাড়ি যেত, আমি নই।

এভাবেই সময় পার হয়ে যায়। আমি একে একে ওপরের ক্লাসে উঠতে থাকি। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় চলে আসে। আমি শুরু থেকে বুয়েটের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কারণ আমার মনছবি ছিল বুয়েটে পড়ার। স্রষ্টার কৃপায় চান্স পেয়ে গেলাম। এজন্যে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আর আগামীর পথ চলতে যেন আরো যোগ্য হতে পারি এ প্রার্থনাই করি। নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখি, যে মানুষটি মানুষকে নিয়ে ভাববে এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে। □

সঠিক নিয়মে পরিশ্রম করলে সবই সম্ভব

উচেনা মার্মা
ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাবা সবসময় চাইতেন আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করাতে। কারণ কোয়ান্টামের নিয়মকানুন বাবা খুব পছন্দ করতেন। সেই সূত্র ধরে কোয়ান্টামে আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু হয়। ২০১৪ সালে অষ্টম শ্রেণিতে এই স্কুলে ভর্তি হই।

প্রথমে কোয়ান্টাম সম্পর্কে এত কিছু চিন্তা করি নি, যা হবে দেখা যাবে এমন একটা মনোভাব নিয়েই ভর্তি হয়েছিলাম। কারণ বাবা খুব করে চাইতেন আমি এখানে পড়ি। নতুন ক্যাম্পাসে এসেই যে জিনিসটা মন কেড়ে নিল সেটা হলো—কোয়ান্টামের কর্মীরা খুবই যত্নশীল। সেখানে যাওয়ার একদিন পরই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। গলায় একটা ফোঁড়া, সম্ভবত আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে। ব্যাপারটা একজন শিক্ষককে জানিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখি যেদিকে যাই সবাই আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছে। আমি ঠিক আছি কিনা, চিকিৎসা করিয়েছি কিনা। সেখানকার সুচিকিৎসার মাধ্যমে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে পরিপূর্ণ সুস্থ হই।

আর যে জিনিসটি আমার সবচেয়ে মনে পড়ে সেটা হলো, গুরুজী দাদুর সাথে বেশ কয়েকবার সরাসরি কুশল বিনিময় এবং দোয়া নেয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। তার আলোচনা, বিশেষ করে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমাকে অনুপ্রাণিত করে সর্বক্ষেত্রে।

মোটামুটি দশম শ্রেণি থেকেই ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আমার মনে একটা ধারণা চলে আসে। বড় ভাইয়েরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাচ্ছে। আমরা একই রুমে ঘুমাই, একসাথে খাবার খাই। তাদের দেখে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেত যে—তারা পারলে আমিও তো পারব। এভাবে যত বড় হই, ততই আমার লক্ষ্য মজবুত হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকে।

কিন্তু আমার এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে ভীষণ জ্বর হয়েছিল, আমার রেজাল্ট তেমন একটা ভালো হলো না। এবারও ভরসা দিল ক্যাম্পাসের ভাইয়েরা। চোখের সামনে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাওয়া কোয়ান্টাদের অনেকেই তো এতটা মেধাবী ছিল না, শুধু পরিশ্রম করত। অনেকেই এসএসসি, এইচএসসি-তে এ প্লাস পায় নি, তবু তারা চান্স পেয়েছে। তার মানে সঠিক নিয়মে পরিশ্রম করলে সবই সম্ভব।

এভাবেই আমি নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে পরিশ্রম করেছিলাম এবং আমি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি। বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগে অনার্স করছি। এই সাবজেক্টটি এখন আমার বেশ পছন্দের। এটা নিয়েই সামনে ভালো কিছু করতে চাই। □

স্বপ্নে বাবা বললেন, আল্লাহ চালাবেন

এখতিয়ার উদ্দিন

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, বাংলা কলেজ, ঢাকা

আমার বাড়ি নোয়াখালীর হাতিয়ায়। আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি তখন আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথা হতো। মোটেই পড়াশোনা করতে পারতাম না। খুব কষ্ট হতো। ব্যথা উঠলে মা আমার মাথায় পানি ঢালতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। তবুও ব্যথা কমত না। একসময় আমার টেস্ট পরীক্ষা শুরু হলো। কিন্তু আমি পড়াশোনা করতে পারছিলাম না। আমি ডিপ্রেশনে পড়ে গেলাম। মাথাব্যথা আরো বেড়ে গেল।

অনেকবার ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। অনেক ওষুধ খেয়েছি। কিন্তু সমাধান হয় নি। এভাবেই টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। ভালো রেজাল্ট করতে পারি নি। এসএসসি পরীক্ষার আর মাত্র দুই মাস বাকি কিন্তু আমার প্রস্তুতি শেষ হয় নি। এর মধ্যে বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আমি মানসিকভাবে আরো ভেঙে পড়ি। পুরো পরিবারের তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। তারপরও পরীক্ষা দিলাম। পাশও করে গেলাম।

এরপর পড়াশোনা করব কি করব না, তা নিয়ে খুব অনিশ্চিত ছিলাম। কারণ পরিবারের যিনি উপার্জন করতেন, তিনি তো পৃথিবীতে নেই। পড়াশোনা করলে খরচ কে চালাবে—এসব নিয়ে ভাবতাম। একদিন আমি বাবাকে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে বাবাকে জিজ্ঞেস করছি, আমার পড়াশোনার খরচ কে চালাবে? বাবা বললেন, আল্লাহ চালাবেন।

আমরা চার ভাই এবং এক বোন। বড় ভাই বিয়ে করেছেন। তার পরিবার এবং নিজের খরচ চালাতে গিয়ে আমাদের সেভাবে সাপোর্ট দিতে পারেন না। আমার মা আমাকে সবসময় পড়াশোনা করাতে চাইতেন। কিন্তু পরিবারের আনুষঙ্গিক খরচ চালিয়ে আমার লেখাপড়ার খরচ বহন করা তার জন্যে খুব কষ্টকর হয়ে পড়ল। অর্থ উপার্জনের আশায় ছোট ভাই চলে গেল চট্টগ্রামে কাজ করতে। কারণ আমি যদি পড়াশোনা করি, পরিবারের হাল ধরবে কে!

আর আমার নতুন ঠিকানা হলো কোয়ান্টাম। যারা বঞ্চিত, দুস্থ, অবহেলিত তাদেরকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে লেখাপড়া করানো হয়। পরিচিত এক ভাইয়ের পরামর্শেই মূলত ২০১৭ সালে একাদশ শ্রেণিতে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম।

নবম-দশম শ্রেণিতে আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলাম। এসএসসির রেজাল্ট ৪.১৮। কলেজে আমি বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হলাম। কলেজের দায়িত্বশীল আসাদ স্যারের সাথে দেখা করলাম। খুব ভালো মানুষ। তিনি আমাকে ক্লাসে নিয়ে গেলেন। বিজ্ঞান থেকে ব্যবসায় এসে কিছু কথা শুনতে হয়েছে যে নবম-দশমে ব্যবসা নিয়ে পড়েও একাদশ-দ্বাদশে হিসাববিজ্ঞান পারে না আর তুমি কীভাবে পারবে! আমি বলেছিলাম, আমি পারব। হিসাববিজ্ঞান বুঝতে আমার কষ্ট হলেও আমাদের রূপালী ম্যাডাম আমাকে গাইড করতেন। পরে আর আমার বুঝতে সমস্যা হয় নি। ক্লাসের অন্য কোয়ান্টাদের সহযোগিতায় আমি সহজে পড়া বুঝতে পারছিলাম। এই কলেজে এত ভালোভাবে পড়ানো হয় যে, বিজ্ঞান থেকে এসেও আমি ব্যবসায় শিক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। পরবর্তীকালে কয়েকজন ছাত্রকে আমি হিসাববিজ্ঞান পড়িয়েছিলাম।

বর্তমানে আমি সরকারি বাংলা কলেজে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। পড়াশোনার পাশাপাশি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে খণ্ডকালীন কাজ করছি। নিজের খরচের পাশাপাশি পরিবারকেও সাপোর্ট করতে পারছি। আসলে ফাউন্ডেশনের সব কার্যক্রম আমার ভালো লাগে। করোনার সময় দাফন কার্যক্রমে অংশ নেয়ার

সুযোগ হয়েছে। দাফনসেবা নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই।

মৃত দেহের প্রতি আমার অসম্ভব রকমের একটা ভয় ছিল। এলাকায় কোনো মানুষ মারা গেলে আমি রাস্তা দিয়ে একা হেঁটে যেতে ভয় পেতাম। মনে হতো হঠাৎ ঐ মৃত লোকটা আমার সামনে চলে আসবে। কোয়ান্টামে এসে দাফন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! করোনার সময় আমরা মুগদা হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, আজগর আলী হাসপাতাল, ডিএনসিসি-সহ আরো অনেক হাসপাতালে রাতদিন করোনায় মৃতদের গোসলের কাজ করেছি। ভয় একদম কেটে গেছে। কারণ আমার সহযোগীরা আমাকে সাহস জোগাতেন।

আমার মনছবিই হলো মানবকল্যাণ বা মানবসেবা। তাই এই সঙ্ঘের সাথে থেকেই সমাজের কল্যাণে আমি অংশ নিতে চাই। কারণ যখন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি, সে-সময় মেডিটেশন করে আমার মাইগ্রেনকে বিদায় করতে পেরেছি। যে মাথাব্যথার কারণে এত ভুগেছি, রেজাল্ট খারাপ হলো, তা থেকে মুক্ত হলাম কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে। তখনই আমি মনছবি ঠিক করি যে, এমন মহৎ সঙ্ঘেই আমি থেকে যাব। আমি প্রতিদিন দুই বেলা মেডিটেশনে নিজেকে একজন দক্ষ সেবক হওয়ার মনছবি দেখি। গুরুজী দাদুকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আমার জীবনবোধের এই রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তার আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত। □

মনছবি ও মেডিটেশন আমার সাফল্যের গতিপথ রচনা করেছে

নাঈমুর রহমান

মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

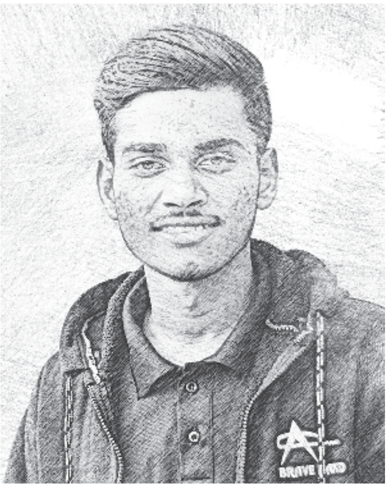

'কোয়ান্টাম কসমো স্কুল
শত ফুল ফুটিয়ে তোলার স্বর্গরাজ্য'

কোয়ান্টামমে মানুষের সাথে মানুষ আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখানে এসে যে শান্তি পেয়েছি, অনেকেই হয়তো এই শান্তির জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চট্টগ্রামে নিজের এলাকাতেই আমার পড়ালেখা। চাচ্চুর শাসনে যতটুকু পড়া, ঐ ততটুকুই। এর বাইরে ভালো পড়ালেখার তাড়না বা পরিবেশ কোনোটাই আমার ছিল না। তাই অষ্টম শ্রেণি পাশ করলাম কোনোভাবে।

চাচ্চু লোকমান হাকিম কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কথা আমার মাকে বলেন। তিনি ও মা মিলে একদিন আমাকে নিয়ে রওনা হলেন লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করার জন্যে। তখন এখানে আসা নিয়ে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু এখন উপলব্ধি করতে পারি তার এই সিদ্ধান্ত আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তার কাছে আমি আজীবন ঋণী হয়ে থাকব।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। যদিও এই স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষার্থী শিশুশ্রেণি থেকে এখানে থাকছে, পড়াশোনা করছে। তাই নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম। রাতে ঘুমাতে গেলে কত না মন খারাপের কারণ মনে পড়ত!

কিছুদিন যেতে না যেতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম এই পরিবেশের সাথে। খুব ভালোভাবে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কী সুন্দর দৈনন্দিন রুটিন, দিন কীভাবে যে কেটে যেত বুঝতেই পারছিলাম না। লেখাপড়া, খেলাধুলা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা—ভালোই কেটেছে দিনগুলো। শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুলের দায়িত্বশীলেরা তাদের ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে আমার মনের মাঝে স্থান করে নিয়েছিল।

হঠাৎ লেখাপড়ায় একটা গতি খুঁজে পেলাম। যেই ছেলে আগে কোনোরকমে পাশ করে ক্লাস টপকানোর চিন্তায় থাকত, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে সেই ছেলে লেখাপড়ায় নিজেকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন বুনতে থাকল। একপর্যায়ে সেই ছেলেই মনছবি ঠিক করল দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া করার।

একাগ্র পড়াশোনা চালিয়ে গেলাম। মেডিটেশন করতাম নিয়মিত। আগে আমার রেজাল্ট তেমন ভালো ছিল না। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে যে পরিবেশটা পেয়েছিলাম, সেটা আমাকে পড়াশোনায় আগ্রহী করে তোলে। তাই দশম শ্রেণিতে মনছবি দেখতে থাকলাম এসএসসি-তে ভালো রেজাল্ট করেছি। পরিশ্রমও করেছিলাম সেই অনুযায়ী। কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য না পেয়ে আমি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ি। হয়তো আমার পরিশ্রম সঠিক উপায়ে হয় নি, নয়তো ভাগ্যে ছিল না।

এরপর কলেজে সবকিছু নতুন করে শুরু করলাম। প্রতিদিন ক্লাসে মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত পড়া শেষ করার চেষ্টা করতাম। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ ও সিনিয়র ভাইয়েরা মাঝে মাঝে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করতেন। আমিও নিজের মনছবিকে সামনে রেখে পরিশ্রম অব্যাহত রাখলাম।

কলেজের পরীক্ষাগুলোতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো রেজাল্ট আসা শুরু করল। নিজের মনছবি, কাজ এবং ফলাফলের মধ্যে তখন একটু একটু করে মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। তখন মনের মধ্যে এক অন্যরকম প্রশান্তি কাজ করছিল। আল্লাহর কাছে সবসময় এর জন্যে শুকরিয়া আদায় করতাম এবং সামনে যেন এই সাফল্য ও প্রশান্তির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলতে পারি এজন্যে দোয়া

করতাম। এইচএসসি শেষ করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। এইচএসসি রেজাল্ট বের হলো। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো করলাম। জীবনে প্রথমবারের মতো পাবলিক পরীক্ষায় এ প্লাস পাওয়ার আনন্দে সেদিন চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ব এই লক্ষ্যে পরিশ্রম আরো বাড়িয়ে দিলাম। অ্যাডমিশনের বিভিন্ন মডেল টেস্ট নিতেন শিক্ষকেরা। প্রথমদিকে মোটামুটি রেজাল্ট হচ্ছিল। কিন্তু অ্যাডমিশনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, মডেল টেস্টের রেজাল্ট তত খারাপের দিকে যাচ্ছে। আবার হতাশ হয়ে যেতে লাগলাম। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছিল। নিজেকে শান্ত রাখা ও পড়াশোনায় আরো মনোযোগী হওয়ার জন্যে মেডিটেশনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম।

ফলে আমার নিজের প্রতি বিশ্বাস এতটা বেড়ে গেল যে, আমি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফরম ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফরম নিই নি। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফবিএস বিল্ডিংয়ে আমার পরীক্ষার সিট পড়ল। পরীক্ষার সময় বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর শেষ করে লিখিত পরীক্ষার জন্যে রোল আর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ফিলআপ করছিলাম, এর মধ্যে আমি একটা নম্বর ভুল ভরাট করে ফেলি। আরো কয়েকজন আমার আগে ভুল করে হা-হুতাশ করছিল। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে আমি একটুও না ঘাবড়ে একটু চোখ বন্ধ করে লম্বা দম নিয়ে নিজেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে উপস্থিত শিক্ষকদের সহায়তায় সমস্যার সমাধান করে ফেললাম। পরীক্ষা শেষ হলো, এরপর থেকে আমার শুধু মনে হচ্ছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেছি।

পরীক্ষার একসপ্তাহ পরে রেজাল্ট বের হলে জানতে পারলাম, আমি যেই বিল্ডিংয়ে বসে পরীক্ষা দিলাম সেটাই আমার ডিপার্টমেন্ট হবে। সেখানেই বসে ক্লাস করার সুযোগ আমি পাব। আমি এখনো মাঝে মাঝে পরীক্ষার ঐ দিনটার কথা স্মরণ করি আর ভাবি আমি নিজেকে এতটা স্বাভাবিক কীভাবে রাখলাম! আমার মনে হয় মেডিটেশনের মাধ্যমে এই স্থিরতা অর্জন করতে পেরেছিলাম। নিজের মনছবির পূরণ হওয়ার মতো আনন্দের প্রাপ্তি খুব কমই আছে মনে হয়। আমার এই যাত্রায় সৃষ্টিকর্তা, আমার পরিবার, শিক্ষক ও কোয়ান্টামের সাথে যুক্ত সকল মানুষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

লেখাপড়ার পাশাপাশি কসমো স্কুলে খুব সুন্দর খেলাধুলার আয়োজন ছিল, যা নিজেকে ফিট রাখতে ও মানসিক প্রশান্তির জন্যে খুব সহায়ক ছিল। এছাড়াও

কোয়ান্টামে পেয়েছি আমি জীবন গড়ার সকল শিক্ষা। একজন মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো নৈতিকতা। এর চেয়ে বেশি কী চাওয়ার থাকে মানুষের জীবনে!

নিয়মিত সাদাকায়ন এবং অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো ছিল নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার হাতিয়ার। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ও কোয়ান্টায়নে (মৌন সাধনার একটি প্রোগ্রাম) পেয়েছি জীবনকে আরো উন্নত করার সূত্র। এই আত্ম উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করেছি নিজের মানবিক সত্তার, অন্তরতম শক্তির। মনছবি, মানবতা, সদাচার ইত্যাদি বিষয়গুলো নিজেকে খুব নাড়া দিয়েছে। শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে যে মনের তৃপ্তি ও আনন্দ সৃষ্টি হয় তা আমি কোয়ান্টামে এসে জেনেছি। আগে কখনো শুকরিয়ার গুরুত্ব সেভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি।

আসলে আমার মনছবি ছিল আমার সাফল্যের গতিপথ। মানুষ যদি নিজের শক্তি সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে তার পক্ষে যে-কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়।

শুকরিয়া! এখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে পড়ছি। যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাই, সেদিন আমার মায়ের আনন্দমাখা কান্না আমি এখনো ভুলতে পারি না। আমিও কেঁদেছিলাম লুকিয়ে। আমি একজন ভালো মানুষ হতে চাই। ভালো কাজ করতে চাই। আমার মাকে একটু শান্তিতে রাখতে চাই। আর দেশ নামক মাকেও একটু শান্তি দিতে চাই। □

শিক্ষকেরা শুধু শিক্ষক নন, তারা আমাদের অভিভাবক ছিলেন

সজিব চাকমা

অর্থনীতি বিভাগ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ

জীবনের বাঁকবদল হয়েছিল হঠাৎ করে। আমি দুর্গম এলাকায় বড় হয়েছি। আমার গ্রামের নাম বাঘ্যাপাড়া, উপজেলা লক্ষ্মীছড়ি, জেলা খাগড়াছড়ি। ছোটবেলা থেকেই খুব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। ছয় কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হতো। আমাকে ভালো কোনো স্কুলে পড়ানোর মতো সচ্ছলতা আমার পরিবারের ছিল না। মা-বাবা ছিলেন দিনমজুর। ছোট থেকেই দেখেছি বাবা রোজ সকালবেলা কাজে যেতেন, আর ফিরে আসতেন সন্ধ্যায়।

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি, তখন বাবা টাকা ধার নিয়ে একটি মোটর সাইকেল কিনলেন। কারণ আমাদের এলাকায় তখন এটা ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন ছিল না। তাই লোকজন বেশিরভাগই মোটর সাইকেলে করে চলাচল করতেন। তখন থেকে বাবা মোটর সাইকেল দিয়ে যাত্রীসেবা দিতেন। সেখান থেকে যা আয় হতো তা দিয়ে সংসার চলত।

বাবা মোটর সাইকেল কেনার পর থেকে আমার তেমন পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে হয় নি। বাবা বেশিরভাগ সময়ে মোটর সাইকেলে করে স্কুলে পৌঁছে দিতেন। যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠলাম, তখন উপজেলা সদরে লক্ষ্মীছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের গ্রামের অনেক বন্ধুরা ভর্তি হয়। আমিও সেখানে ভর্তি হলাম। তখন থেকে প্রতিদিন বন্ধুদের সাথে গল্প করে স্কুলে যেতাম। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত এভাবে আমি স্কুলে গিয়েছি।

সেই বছরে আমাদের ইউনিয়নে প্রথম হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাড়ি থেকে কাছে হওয়ায় সেখানে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। কাছে হলেও যাতায়াতের রাস্তা ভালো ছিল না। নতুন স্কুল, শিক্ষক নেই বললেই চলে। অনেক কষ্ট করে জেএসসি পাশ করেছিলাম। শিক্ষাব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় জেএসসি পাশ করার পর নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে অন্য একটি ভালো স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার।

কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারলাম না। প্রায় শিক্ষকবিহীন স্কুলটিতেই মানবিক বিভাগে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। এভাবে কোনোরকম পড়ালেখা চালিয়ে গেলাম সেই স্কুলে। অনেক কষ্ট করে ২০১৭ সালে এসএসসি পাশ করলাম। পরীক্ষা শেষে বাড়ির কাজগুলো করতাম। কলেজে কোথায় ভর্তি হবো সেটা নিয়ে মায়ের সাথে আলোচনা করতাম।

হঠাৎ একদিন রাতে আমার বাবা মোবাইলে একটি ভিডিও পেলেন। সেটি ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের একটি ভিডিও চিত্র। ঢাকায় ২৬ মার্চে কুচকাওয়াজে প্যারেড করার ডকুমেন্টারি। তখনই কোয়ান্টাম সম্পর্কে আগ্রহ বেড়ে গেল আমার। আমি বাবাকে কোয়ান্টাম সম্পর্কে খোঁজ নিতে বললাম। বাবা খোঁজ নিয়ে একটা ফরম সংগ্রহ করে ফেললেন এবং ভর্তি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিতে বললেন।

এপ্রিল মাসে এসএসসি রেজাল্ট দেয়া হয়। তখন একটু হতাশ ছিলাম। কারণ পরীক্ষা তেমন ভালো হয় নি। তাই একটু ভয় কাজ করছিল কিন্তু পাশ করলাম। পাশ করার পরেও আরেকটা বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিলাম কারণ কোয়ান্টামে ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট তখনো আসে নি।

তখনকার সময় আরেকটা ভয় ছিল—খারাপ পথে যাওয়ার ভয়। গ্রামের পরিবেশ তেমন ভালো না হওয়ার কারণে ছিল এই আশঙ্কা। এসএসসি রেজাল্টের দুদিন পর কোয়ান্টাম থেকে ফোন করে জানাল, আমি কোয়ান্টামে

ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। শুনে অনেক খুশি হয়েছিলাম। তারপর ভর্তির জন্যে আমার বাবা প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র ব্যবস্থা করে প্রস্তুতি নিলেন।

অবশেষে ২০১৭ সালের ১৩ মে যখন কোয়ান্টামের উদ্দেশ্যে রওনা দেবো, ঠিক সেদিন আমার মন অনেক খারাপ হয়েছিল। কারণ ছোটবেলা থেকে মা-বাবা, ছোট ভাইকে ছেড়ে কোথাও যেতাম না। তাদেরকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সব মায়া ত্যাগ করে জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরোলাম। কোয়ান্টামে এসে মানবিক বিভাগে ভর্তি হলাম। বাবা বললেন, ওখানে তুমি নিরাপদ আশ্রয় পাবে।

সেদিন থেকে শুরু হলো আমার কোয়ান্টা জীবন। ভর্তি হওয়ার পর পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে হতো। আমাকে ব্যান্ড দলের ড্রাম সেকশনে দেয়া হয়। ড্রাম বাজানোর মধ্যে একটা আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলাম। ২০১৮ সালের ২৬ মার্চের ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ। ব্যান্ড, প্যারেড কী জিনিস আগে কখনো জানতাম না। এখানে এসে কয়েকদিনের মধ্যে জানতে পেরেছি এবং পুরস্কার অর্জন করেছি। এটা আমার কাছে আনন্দের একটি স্মৃতি। কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হতে পেরে জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো পেয়েছি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মেডিটেশন ও নৈতিক শিক্ষা।

আসলে কোয়ান্টামের নিয়মগুলো যে-কোনো শিক্ষার্থীকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম। একজন কোয়ান্টা সেখান থেকে যদি ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, তাহলে বাইরে এসে তা খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারবে। কারণ কোয়ান্টামে যে জ্ঞান বা নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা যায়, তা বাইরের পরিবেশে অর্জন করা সম্ভব নয়। আমি নিজেই তার প্রমাণ পেয়েছি।

যদি আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে পড়ার সুযোগ না পেতাম, তাহলে এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারতাম না। কারণ আমার গ্রামের বন্ধুরা ঐ বছরে কেউ পাশ করতে পারে নি। এর মধ্যে আমি এ গ্রেড পেয়েছি। উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে এখন আমি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অর্থনীতি বিভাগে স্নাতক করছি।

আমার কলেজের শিক্ষকেরা শুধু শিক্ষক নন, তারা আমাদের অভিভাবক ছিলেন। তাই আমি নিজের বাড়ি থেকে অনেক দূরে আছি বলে কখনো মনে করতাম না। সবসময় মনে করতাম নিজের বাড়িতে পরিবারের সাথে আছি।

ছাত্র আবাসনের দায়িত্বশীল শ্রদ্ধেয় শোভন স্যারকে খুব মনে পড়ে। তার মতো মমতাময় শিক্ষক আগে আমি কখনো পাই নি। কোনোদিন ভাবতেও পারি নি যে, পৃথিবী থেকে তিনি এত অল্প বয়সে চলে যাবেন। আমাদের সাথে স্যারের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণগুলো আজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে।

মনছবি কী—সে সম্পর্কে আমার কখনোই কোনো ধারণা ছিল না। কোয়ান্টামে এসেই আমি জেনেছি মনছবি কীভাবে দেখতে হয়, কীভাবে লক্ষ্যের ছবিকে হৃদয়ে লালন করতে হয়। কোয়ান্টামের সাথে একাত্ম থাকতে পেরে আমি নিজের জীবনকে সার্থক মনে করি। □

ভাবনাটা রাখতে হবে শুধু পারা'র প্রতি

এমংসিং মার্মা

প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বাড়ি বান্দরবানের বাকিছড়ার তুংখ্যং পাড়ায়। আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দেই তখন মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করি, এরপর আমাকে দিয়ে কী করাবে? মা বলল, এসএসসি পরীক্ষার পর তো আর পড়ালেখা করানোর মতো সামর্থ্য নেই, তাই পড়ালেখা বন্ধ করে দাও। সেদিন মাকে বলেছিলাম, আমাকে শুধু ভর্তির টাকাটা দাও বাকিটা আমি ম্যানেজ করে নেব। এর আগে জেএসসি পর্যন্ত একটা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা চালিয়েছি প্রায় বিনামূল্যে। এককথায় প্রচুর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। বড় বড় শহরের ছেলেদের যখন দেখি, মা-বাবার অঢেল টাকা পেয়ে বেখেয়ালে চলছে, তখন খুব অবাক লাগে!

জেএসসির পর আমাকে বাড়িতে ফিরতে হলো। ক্লাস নাইনে ভর্তি হলাম বালাঘাটা বিলকিস উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমার ইচ্ছে ছিল কমার্স নিয়ে পড়ার। কিন্তু ভর্তির কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে সায়েন্স নিতে বাধ্য করেন স্যারেরা। কারণ যাদের জিপিএ ৪-এর উপরে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে সায়েন্স নিতে হবে। না হলে টিসি দিয়ে দেবে।

ভর্তি বাতিলও করতে পারছিলাম না। ভর্তি ফি ছিল ৫০০ টাকা। অনেকের কাছে এটা কিছুই না। কিন্তু তখন আমার কাছে ছিল সেটা অনেক টাকা! যেটা মা-বাবা অনেক কষ্ট করে যোগাড় করেছিলেন। আবার সায়েন্সে পড়লে কোচিং করতে হবে, সেটা আরেকটা ভয়। তাদের সাথে কথা বললাম, কী করা যায়? এখানে না পড়লে ভোকেশনালে যেতে হবে, সেখানেও সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে, আর সেটাও যদি না পড়তে চাই তাহলে বান্দরবান সদরে এসে পড়তে হবে। তা আরো কঠিন হয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে সায়েন্স নিয়েই পড়লাম।

ভর্তির প্রথম দুই বছর আমি বাড়ি থেকেই ক্লাস করেছি। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে আমাকে স্কুলে যেতে হতো। যাওয়ার পথে কখনো কখনো কেউ আমাকে তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিত। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব প্রায় ছয় কিলোমিটার। এমন দিনও গেছে সকালে খেয়েছি, আর দুপুরে খাওয়া হয় নি। বিকাল ৪টা পর্যন্ত টানা ক্লাস হতো। বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। বাসায় পৌঁছে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ফ্রেশ হয়ে পড়ার টেবিলে বসতে পারতাম না। ঘুম চলে আসত। এভাবে এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট হলো ৩.৫৯।

এসময় পরিচিত এক মামা আমাকে কোয়ান্টামের খবর দেন। ছেলে ভালো কিছু করবে—এক বুক আশা নিয়ে বাবা আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে রেখে গেলেন। ২০১৭ সালের ১৩ মে আমি একাদশ শ্রেণিতে মানবিক বিভাগে ভর্তি হলাম।

প্রায় দেড় বছর আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ছিলাম। এইচএসসি সম্পন্ন করলাম ২০১৯ সালে। পরীক্ষার পরে এই কলেজে ভর্তি কোচিংয়ের জন্যেও বাছাই পরীক্ষা হয়। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, আমি টিকে যাব এবং ঐখানে কোচিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাব। আমরা ছিলাম ৭২ জন। কোচিংয়ের জন্যে ৩০ জনকে রাখা হলো। আমি চান্স পেলাম।

নিয়মিত মেডিটেশন করতাম। 'শিথিলায়ন' আমার পছন্দের মেডিটেশন। এটা আমার মনকে শিথিল রাখত। ফলে পড়ালেখা সহজেই মনে রাখতে পারতাম। মনছবি দেখতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি। কোয়ান্টামের দেখানো গাইডলাইন, মোটিভেশন, প্রত্যেকটা শিক্ষকের আন্তরিকতা ও মমতা আমার খুব ভালো লেগেছিল। এছাড়াও কোয়ান্টামে যাওয়ার আগে আমি যে-কোনো বিষয়ে একটুতেই রেগে যেতাম। কিন্তু এখন আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সহজেই যে কারোর সাথে মানিয়ে নেয়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে।

যা-হোক আমি ছবি আঁকতে পছন্দ করতাম। কিন্তু ছবি এঁকে যে উচ্চশিক্ষা বা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করা যায় তা জানতাম না। এই ক্যাম্পাসে এসে বড় ভাইদের সাথে কথা বলেই তা জানতে পারি। কোচিং করার সময় মাঝে মাঝে আলসেমি চলে আসত, তখন পাশের বন্ধুকে পড়তে দেখে অনুপ্রাণিত হতাম।

এইচএসসির রেজাল্ট বের হলো। আমি পেলাম জিপিএ ৪.৬৭। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। চান্স পেলাম কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য চারুকলায়। সাবজেক্ট পেলাম প্রাচ্যকলা।

আসলে আমার ছবি আঁকার আগ্রহ তৈরি হয়েছিল ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু কারো কাছ থেকে যে দেখে শিখব বা কারো কাছে গিয়ে শিখব এই সুযোগটা ছিল না। যখন ক্লাস থ্রি-তে পড়তাম, স্কুলে একজন স্যার ছিলেন। আমরা সবাই উনাকে দাদু স্যার বলে ডাকতাম। স্কুলের স্যারদের মধ্যে বয়সে তিনি প্রবীণ ছিলেন। স্যারের ক্লাস আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে করতাম। স্যার আমাদের খুব ভালবাসতেন এবং অনেক যত্ন সহকারে পড়াতেন। পড়ালেখার পাশাপাশি আমাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে উপদেশমূলক গল্প, কৌতুক শোনাতেন এবং সংখ্যা দিয়ে ছবি এঁকে দেখাতেন। মূলত সেখান থেকে আমার ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মাধ্যমিকে হোস্টেলে থাকার সময় গাইড বইয়ের যে লেখকদের ছবি দেয়া থাকত তা অনুকরণ করতাম। এছাড়াও চারু ও কারুকলা বই থেকেও আমি ছবি আঁকতাম। এটা আমার খুব পছন্দের বই ছিল। যেহেতু এটা আমার পছন্দের বই, তাই এই বিষয়ে জেএসসি পরীক্ষায় আমি এ প্লাস পেয়েছিলাম। নবম-দশম শ্রেণি বিজ্ঞানে নিজের প্র্যাকটিক্যাল খাতার ছবিগুলো আঁকতাম। পাশাপাশি বন্ধুদের খাতায়ও এঁকে দিতাম।

আমি সবসময় মনে করি, একজন মানুষকে বিকশিত করতে হলে প্রথমে তার মনোজগতে পরিবর্তন আনতে হয়। বিশেষত যারা অন্যদের তুলনায় সমাজে পেছনের কাতারে পড়ে আছে, এই পিছিয়ে পড়া কিশোর এবং তরুণরা নিজের সম্পর্কে খুবই নিচু ধারণা পোষণ করে। এই ধারণা কখনো তার নিজের সৃষ্টি করা, নয়তো সমাজ তাকে এভাবে ভাবতে শেখায়। আমি আমার চিত্রকলা অথবা লেখনির মাধ্যমে তাদের ভাবাতে চাই—তুমিও পারবে! শুধু ভাবনাটা রাখতে হবে পারা'র প্রতি। তাহলে সব সম্ভব। □

স্মার্টফোন আসক্তি থেকে মুক্ত হলাম

নোমেন চাকমা
পরিসংখ্যান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। কিন্তু নবম শ্রেণিতে আমার হাতে স্মার্টফোন চলে এলো। এ যেন ছিল আমার ধ্বংসের বীজ। এর ফলে আমি যে এতটা বদলে যাব ভাবি নি। আমার লাইফস্টাইল, আচরণ সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেল। গেম, ফেসবুক অর্থাৎ ভার্চুয়াল ভাইরাস ছিল আমার সঙ্গী। সময়ের সাথে সাথে আমার আসক্তির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল। মা-বাবা আমাকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

আমার এসএসসি পরীক্ষার পর বাবা বললেন, বান্দরবানের একটা ভালো কলেজে ভর্তি করাবেন। আমি কোনোভাবেই যেতে রাজি ছিলাম না। তাও জোর করে বাবা আমাকে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সেদিন আমি খুব কেঁদেছিলাম। ফোন ছাড়া আমি কীভাবে থাকব? আমার পাগল প্রায় অবস্থা। তখন আমার পাশে দাঁড়াল আমার সহপাঠীরা। আমি কাঁদছিলাম, ওরা আমাকে সঙ্গ দেয় এবং ক্রিকেট খেলতে নিয়ে যায়। ওদের সাথে খেলতে খেলতে আমার দিনটি যে কীভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। ফোন ছাড়াও

যে আনন্দময় সময় কাটানো যায় উপলব্ধি করলাম। বন্ধু বা সহপাঠীদের সাথে একসাথে থাকা, একসাথে খাওয়া, একসাথে ঘুমানো, একসাথে পড়ালেখা, একসাথে মেডিটেশন—সবকিছুই আমার ভালো লাগতে শুরু করল।

ওদের সাথে থাকতে থাকতে আমারও পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ চলে এলো। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিতে কোনো সমস্যায় পড়লে সবাই মিলে সমাধান করতাম। ভার্সিটিতে পড়ার মনছবিও তৈরি হয় এই সময়টায়। এভাবেই এইচএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন হলো। তারপর কসমো কলেজ থেকে চলে যাওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। সেদিনও আমি কেঁদেছিলাম, সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে।

ইউনিভার্সিটি ভর্তি প্রস্তুতি আমি বাসা থেকে নিতে শুরু করি। সবাই আমার বাবাকে বলছিল আমাকে ভালো কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে দিতে। কিন্তু আমার বাবার ঐ সময় সেই সামর্থ্য ছিল না। আমার পাঁচ ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চালানোর পর বাবার পক্ষে আমাকে কোচিংয়ে পড়ানোটা মোটেও সহজ ছিল না। তখন আমার বাবার ওপর কী পরিমাণ চাপ পড়েছিল তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

আমি বিশ্বাস করতাম নিজে থেকে পড়েও ভার্সিটিতে চান্স পাওয়া সম্ভব এবং আমি নিজে থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলাম। পরিসংখ্যান বিভাগে চান্স পেলাম।

আমি ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকেও মুক্ত হয়েছি। এখন কোনো প্রতিকূলতা আমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কারণ আমি এখন প্রো-একটিভ।

আজ বাবাকে ধন্যবাদ জানাই। তখন এই কলেজে ভর্তি না করালে কী হতো আমার অবস্থা তা আর ভাবতে চাই না। আজ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বাবা আমার জীবন আর কোয়ান্টাম আমার লাইফস্টাইল।

কোয়ান্টামমে থাকার সময় যত ব্যস্ততার মধ্যে থাকি না কেন, কোনোদিন গুরুজী দাদুর প্রোগ্রাম মিস করতাম না। আমি ক্লাস ওয়ান থেকে এসএসসি পর্যন্ত অর্থাৎ বাইরের জীবনে ইতিবাচকতা, নৈতিকতা, শিষ্টাচার, ধৈর্য, মানবতা যতটুকু শিখেছি, তার থেকে আরো বেশি শিখতে পেরেছি কোয়ান্টাম কসমো কলেজ থেকে। □

শুদ্ধাচার বইটি সর্বত্র পৌঁছে দিতে চাই

প্রিয়রঞ্জন চাকমা
পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৭ সালে আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই। বান্দরবানের প্রত্যন্ত একটি এলাকায় আমার বাড়ি। পরিবারে মা-বাবা আর আমরা দুই ভাই, দুই বোন। বড় দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ভাই অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে আর ছোট বোন দ্বিতীয় শ্রেণিতে। মা-বাবার প্রাত্যহিক উপার্জনে চলে পরিবারের ভরণপোষণ ও ছোট ভাইবোনের পড়ালেখার সামগ্রিক খরচ। আমরা জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। ছোটবেলায় প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে আমি প্রাইমারি স্কুলে যেতাম। কোথাও কোথাও পায়ে হাঁটার কোনো রাস্তাও ছিল না। পাহাড়ি ঝিরি পার হয়ে যেতে হতো। এভাবেই প্রাইমারি স্কুলের পড়া সম্পন্ন করলাম।

আশেপাশে কোনো হাই স্কুল ছিল না। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বৌদ্ধ অনাথ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা শুরু হয় আমার। ভর্তি হয়েছিলাম বান্দরবান বৌদ্ধ অনাথালয় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এখানেই পড়েছি। এরপর ভর্তি হই বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেই সময়ে আমার নির্দিষ্ট

কোনো লক্ষ্য ছিল না। জীবনে বড় কিছু হতে হবে বা বড় কিছু করতে হবে এমন কোনো আগ্রহও ছিল না। বন্ধুদের সাথে আড্ডা, ঘুরে বেড়ানোই হয়ে ওঠে নিত্যদিনের রুটিন। তাই নবম শ্রেণিতে ফেল করলাম। একই ক্লাসে দুবছর থাকলাম। হতাশ হয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাকে দিয়ে কী হবে?

কাকতালীয়ভাবে এসময় আমার দেখা হয়ে যায় লালহিম সাং বম ভাইয়ের সাথে। তিনি তখন একাদশ শ্রেণির একজন কোয়ান্টা এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। লালহিম ভাই বার্ষিক ছুটিতে বাসায় এসেছিলেন। তিনিই প্রথম আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের কথা বলেন, পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম আমাদের গ্রামের আরেক ছেলেও সেখানে পড়ত। নাম রাজীব চাকমা। বর্তমানে সে আন্তর্জাতিক মানের একজন জিমন্যাস্ট। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার আগ্রহ আমার তখন থেকেই।

জিপিএ ৩.১১ নিয়ে এসএসসি পাশ করলাম। কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তির জন্যে ইন্টারভিউ দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে টিকেও যাই। তখন থেকেই আমার জীবন বদলে যেতে লাগল।

নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, আন্তরিকতা এবং সফলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত দেখলাম এখানে এসে। আমিও এই বিষয়গুলো নিজের মধ্যে নিতে থাকলাম। আমাদের দিন শুরু হতো মেডিটেশনের মাধ্যমে। মেডিটেশনে আমার লক্ষ্য অবলোকন করতাম। যেহেতু আমার এসএসসির জিপিএ ছিল খুবই কম, তাই একাদশে আরো ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় চলে এলো। পরীক্ষা দিলাম। এবার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির কোচিং করার পালা। আমাদের কলেজে থেকেই এই কোচিং করার সুযোগ ছিল। কিন্তু আমি কসমো কলেজের কোচিংয়ে সিলেক্ট হই নি। কারণ আমার এসএসসি-র রেজাল্ট ভালো ছিল না। আমি তো সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফরমও তুলতে পারব না।

কিন্তু আমি ভেঙে পড়ি নি। কোয়ান্টামের একটি কথা সবসময় আমার কানে বাজত—'কোনো পরাজয়, পরাজয় নয় যদি তা মানসিকভাবে আমাকে পরাজিত না করে।' কোয়ান্টাম কসমো কলেজ থেকে বের হয়ে আমি পরিচিত এক ভাইয়ের সাথে জীবনে প্রথম ট্রেনে করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসি। ক্যাম্পাসে আসার পর আমার মনছবি আরো শক্ত হয়ে ওঠে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একটা জায়গা করে নেবই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে থেকেই আমি ভর্তির প্রস্তুতি নিতে থাকি। পড়তে পড়তে এমনও

হয়েছে যে সারারাত কীভাবে পার হয়েছে বুঝতেই পারি নি। জানালা দিয়ে যখন সকালের আলো ঘরে প্রবেশ করেছে তখন খেয়াল করেছি যে রাত পার হয়ে গেছে। সে-সময় আমি পড়ার আগে মেডিটেশন করে নিতাম।

আমার পছন্দের মেডিটেশন ছিল 'শিক্ষার্থী মনছবি'। এই মেডিটেশন আমার মানসিক শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিত। পড়াশোনায় নিয়ে আসত আলাদা এক ছন্দ। সময় পেলেই অটোসাজেশন চর্চা করতাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম এবং পালি বিভাগে চান্স পেলাম। অনেকে বলেছিল, এই সাবজেক্টে পড়ে কী হবে? কিন্তু আমার বিষয়টি ভালো লাগে। বরং আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, পালি বিভাগে পড়ছি। দেশের অন্যতম জ্ঞানতীর্থ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ একটি সমৃদ্ধ ও গৌরবময় বিভাগ।

আমার বিভাগের সবাই আমাকে আমার আচার-আচরণের জন্যে পছন্দ করে। যদিও এসব আমি শিখেছি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে গিয়ে। এজন্যে এই কলেজের নৈতিক কার্যক্রমের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমি। আমার কথা বলা, চালচলন, ভদ্রতা, কোথায় কেমন পোশাক পড়ব, ছোট-বড়দের সাথে কেমন ব্যবহার করব ইত্যাদি শুদ্ধাচারের মাধ্যমে আমার ব্যক্তিত্বকে নতুন মাত্রা দেয়ার জন্যে এই কৃতজ্ঞতা।

একটি ঘটনা না বললেই নয়। দিনটি ছিল ১৬ আগস্ট ২০২২ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা 'ক' ইউনিটে। কোয়ান্টাম থেকে প্রকাশিত *শুদ্ধাচার* বই ক্যাম্পেইনের পূর্বে মনছবি করেছিলাম যে, যেহেতু *শুদ্ধাচার* নিয়ে ক্যাম্পেইন করব, তাই আগে নিজের আচরণ সংযত রেখে এবং শুরুতে কুশল বিনিময় দিয়ে শুরু করব। যখন কাজে নেমে পড়ি তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, অনেকেই মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে। আমার আচরণের দ্বারা সাধারণ মানুষ এতটা প্রভাবিত হবে এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। ছোট ছোট শুদ্ধাচারগুলো নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে আমাদের জীবনে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। ফলে জীবনের চলার পথটি যেন আরো মসৃণ হয়ে উঠেছে। আমি দেশের সর্বত্র শুদ্ধাচারের বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। □

খুমীদের মধ্যে আমি প্রথম স্নাতক পাশ করলাম

সুইতং খুমী

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা খুমী জাতিগোষ্ঠীর সন্তান। পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার মানুষের এই সম্প্রদায়ের শিক্ষার হার মাত্র ৩০ শতাংশ। অথচ অবাক হয়েছিলাম যেদিন প্রথম জানতে পারি খুমী শব্দের বাংলায় একটি অর্থ হলো 'সর্বোত্তম জাতি'। তাহলে কেন আমি পিছিয়ে থাকব?

স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবো। এই স্বপ্ন বুনেছি আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে বসে। বলা যেতে পারে জীবনের সবচেয়ে বড় সময়টা পার করেছি এখানে। এখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাফিক ডিজাইনে অনার্সে পড়ছি। তবে আমার শুরুর গল্পটা ছিল ভিন্ন।

২০০৫ সালে আমার বাবা আর নানা ভর্তি করিয়ে দিয়ে যান কোয়ান্টাম শিশুকাননে। একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। নতুন ভাষা, নতুন কালচারে মানিয়ে নেয়ার লড়াই, তারপর মিশে যাওয়া। এরপর কেটে যায় ১৩টি বছর। কত স্মৃতি যে জমা পড়ে আছে!

স্কুলের সেই ছোট্ট টিনশেডের ঘরগুলো এখন আর নেই। শুরুর দিকে আমরা সেখানে থাকতাম। সময়ের বিবর্তনে কোয়ান্টাম শিশুকানন এখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ হয়েছে। ছোট্ট ক্যাম্পাসটি এখন তিন-চারটি পরিকল্পিত বিশাল ক্যাম্পাসে পরিণত হয়েছে। বলতে গেলে শূন্য থেকে পরিপূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে এই স্কুল।

অনেক মানুষের শ্রম, দান আর ভালবাসা মিলিয়ে আজকের এই স্কুল। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার বাবার প্রতি, যিনি এই স্কুলের সাথে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

স্কুল জীবনে আমি মোটেও ভালো ছাত্র ছিলাম না। পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলা আর গল্পের বই বেশি ভালো লাগত।

খুমী জনগোষ্ঠীর লোকেরা অত মেধাবী হয় না বা তারা পড়াশোনায় ভালো না—এরকম সবসময় শুনেছি পরিচিত-অপরিচিত অনেকের মুখে। যে জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এই দেশে অনগ্রসর তাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা এমনই হবে। কিন্তু এটা আমি কোনো মতেই মেনে নিতে পারতাম না।

নবম শ্রেণিতে উঠে আমি বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলাম। ছবি আঁকতে ভালবাসতাম। ইচ্ছা ছিল স্থপতি হবো। কিন্তু বুয়েটে ভর্তির যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হই। তারপর একমাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিই গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব।

কোয়ান্টাম কসমো কলেজ থেকেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক এবং চ ইউনিট ছাড়া আর কোথাও ভর্তির ফরম তুলি নি। বিশ্বাস ছিল চান্স পাব। আমাকে পেতেই হবে।

এত অবহেলা, আস্থাহীনতার জবাব দিতে হবে কাজের মধ্য দিয়েই। আমরা খুমীরা বোকা নই, কম মেধার অধিকারীও নই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চ ইউনিটে ৩৩ তম মেধাতালিকা অর্জন করে খুমী জনগোষ্ঠী থেকে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাই। এই দিনটা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলোর মধ্যে একটা।

আমার মা যিনি বাংলায় লেখাপড়া তো দূরের কথা, বাংলা বলতেই পারেন না, তিনি এখন গর্বের সঙ্গে বলতে পারেন আমার ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পড়ে। আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা কেউ কেউ তা বিশ্বাস করতে চাইত না। কয়েকবার করে জিজ্ঞেস করত! কোথায় পড়ে? মা তখন বার বার বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নামটিও ভালোমতো উচ্চারণ করতে পারেন না।

একদিন এক পাড়াবাসী এসে মাকে জিজ্ঞেস করছে আমার বিষয়ে, মা খুব কষ্ট করে উচ্চারণ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তার ছেলে। এটা দেখে সেদিন আমার চোখে জল চলে এসেছিল। কিন্তু মাকে তা বুঝতে দেই নি।

শুধু মনে হয়েছিল—আমি মাকে সবার কাছে অনেক সম্মানিত করতে পেরেছি। শত কষ্টের মাঝেও আমার এ অর্জনে মা যেন একটু সুখ খুঁজে পান।

আজ বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাকেও এই সম্মানটা দিতে পারতাম। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। হয়তো পরপারে বসে তিনি আমার এই সাফল্য দেখছেন। আমি যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি, বাবা তখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে আমাদের চার ভাইবোনকে মা একাই লালনপালন করছেন। পুরো সংসারের হাল তিনি ধরেছেন। আসলে বাংলাদেশে সংগ্রামী মায়েদের গল্পগুলো মনে হয় এমনই। আমার যতটুকু অর্জন এটা আমি বাংলাদেশের সকল মায়েদের প্রতি নিবেদন করতে চাই।

প্রিয় মা, তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে যে যা-ই বলুক, তোমাদের আমরা ভালবাসি। তোমাদের যেন শ্রদ্ধা করতে পারি সেই দোয়া করো আমাদের জন্যে। আর কোয়ান্টামে যেভাবে আমরা বেড়ে উঠেছি, তোমার সন্তানদের সেই শিক্ষায় বড় করো। তাহলে তারা শুধু তোমার দুঃখ নয়, জাতির দুঃখ ঘুচিয়ে আলোর সন্ধান দেবে।

মাঝে মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বটতলায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিআরটিসি লাল বাসের জন্যে অপেক্ষা করি আর ভাবতে থাকি—আমি বাড়ির বড় সন্তান! পরিবারের বিশাল দায়িত্ব আমার ওপর। দায়িত্ব আছে সমাজের প্রতিও। কারণ আমি যে আত্মবিশ্বাসের শিক্ষা পেয়েছি তা খুমীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই দায়িত্ব যেন নিতে পারি সৃষ্টিকর্তার কাছে সবসময় তা-ই প্রার্থনা করি। □

আমাদের মাধ্যমে খুমীরা পেল নতুন এক পরিচয়

অংহো খুমী
গণিত বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

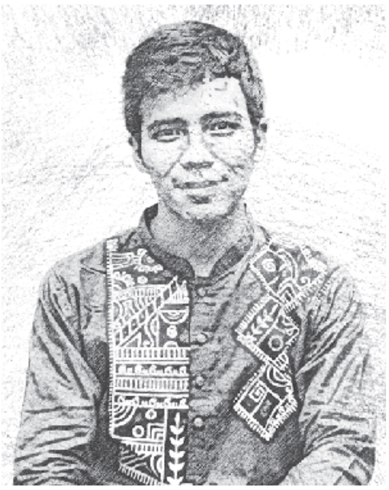

২০০৬ সালে বাবার হাত ধরেই কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে আসা। বড় একটা স্বপ্ন নিয়েই হয়তো তিনি সেদিন আমাকে ভর্তি করিয়েছিলেন। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করানোর জন্যে লোকের মুখে আমার মা-বাবাকে কম কথা শুনতে হয় নি। আপনার ছেলে বেজাত হয়ে যাবে, এমন বিরূপ মন্তব্যও শুনতে হয়েছে তাদের। কারণ আমাদের এলাকায় তখনো শিক্ষার আলো সেভাবে পৌঁছায় নি। এখন কিছুটা সচেতন হলেও তখনো প্রাথমিক বা বড়জোর মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর তেমন একটা পড়ার আগ্রহ ছিল না কারোরই। শুনেছি মা খুব কান্নাকাটি করতেন যখন লোকজন আমার সম্পর্কে এসব বলত। তারপরও ছেলে বড় হবে এ আশায় সবকিছু সহ্য করেই আমাকে রেখে দেন কোয়ান্টামে।

এদিকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে আমার শৈশব ও কৈশোর দুটোই সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে থাকে। বিশেষ করে আমার মতো পাহাড়ি ছেলেদের কাছে মনে হতো যেন বাসায়ই আছি। কোয়ান্টামমের প্রাকৃতিক

পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করত। এখনো আমার মন টানে সেখানে যাওয়ার জন্যে। আসলে আমি একটু ভিন্ন স্বভাবের, এই স্বভাবটি ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আছে। যখন ছোট ছিলাম আমার সমবয়সী শিশুরা বাসায় যাওয়ার জন্যে কান্নাকাটি করত, কিন্তু আমার এমন কোনো অনুভূতি হয় নি সে-সময়।

স্কুলে, আবাসিক হলে, খেলার মাঠে, একই ছাদের নিচে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন ধর্মের আমরা সবাই একসাথে থাকা-খাওয়া, পড়াশোনা, খেলাধুলা করতাম। সেই কিশোরবেলায় আমার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এখান থেকেই তৈরি হয়েছিল।

ছোট থেকেই আমাদের কষ্টসহিষ্ণু করে, কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে বড় করেছিলেন আমাদের শিক্ষকেরা। ছোট থেকেই নিজেদের ছোটখাটো কাজগুলো নিজেরাই করতাম। কখনোই মনে হয় নি যে এই কাজগুলো খুব কষ্টের বা বিরক্তির। নিজের অজান্তেই এভাবে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে এই মানসিক বিকাশ ঘটেছিল। যদিও তখন আমাদের এখনকার মতো এত সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

আর পড়াশোনা নিয়ে আমার নিজের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ছিল সবসময়। তাই বরাবরই আমার ভালো রেজাল্ট হতো, আমাদের শিক্ষকেরাও আন্তরিক ছিলেন। আমি স্বপ্ন দেখতাম বড় কিছু হওয়ার। ভালো কিছু করার। আর বিশ্বাসটাও রাখতাম অনেক বেশি। এভাবে যত বড় হচ্ছিলাম নিজের মানবিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করছিলাম।

সত্যি কথা বলতে—আমরা কী পড়ছি, কীভাবে পড়ছি এসব দেখতাম না পরীক্ষার সময়। শুধু বিশ্বাস রাখতাম যে, ভালো রেজাল্ট অবশ্যই করব। এজন্যেই কোনোকিছু চেষ্টা করলে খুব সহজেই তা আয়ত্তে আনতে পারতাম।

বাইরে এসে একটি বিষয় খেয়াল করেছি যে, স্মার্টফোনের কারণে আমাদের দিনের অর্ধেক সময় চলে যায় ফেসবুক, না হয় অন্যকিছুতে। ফলে পড়ার কোনো সময় থাকে না। সময় পেলেও পড়ায় সেভাবে মনোযোগ দিতে পারি না। কিন্তু আমার স্কুলের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্মার্টফোনসহ ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে দূরে থাকতাম আমরা। তাই যে-কোনো কাজে

পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারতাম। ঐ পরিবেশটা এখন খুব মিস করি। জীবনের প্রতিটি ধাপে নিয়মকানুন মেনে শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে রাখতে হয় এই উপলব্ধি এখন করতে পারছি।

শিশুশ্রেণি থেকে এইচএসসি পর্যন্ত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে পড়েছি। ২০১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেই। আমি আর আমার বন্ধু সুইতং খুমী দুজনই চান্স পাই। সেই বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো অনেকেই চান্স পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুজনের কথা বলার কারণ হলো আমরা খুমী সম্প্রদায়ভুক্ত। বাংলাদেশে খুমী নৃ-গোষ্ঠী থেকে এর আগে কারোর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয় নি। আমরাই প্রথম ভর্তি হলাম। সুইতং চান্স পেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে। আমাদের মাধ্যমে খুমীরা পেল নতুন এক পরিচয়। এসবের জন্যে স্রষ্টার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। □

কোটায় ভর্তির সুযোগ পেয়েও নিই নি

শান্তিময় চাকমা
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার জীবনবোধের কিছু কথা দিয়ে শুরু করি। আমার কাছে জীবন হচ্ছে অভিজ্ঞতার সমন্বয়। সেকেন্ডের পর মিনিট, এরপর ঘণ্টা চলে যায়। সময় তার আপন গতিতেই চলতে থাকে। আর আমাদের জীবন থেকে এক একটি মুহূর্ত হারিয়ে যায়। পেছনে থেকে যায় শুধু স্মৃতি। সেই ফেলে আসা স্মৃতিগুলো বার বার হাতছানি দেয়। তেমনি এক স্মৃতি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ। এটা একটা ভালবাসার নাম। এই ভালবাসার সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম ২০১৭ সালে। কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম সেখানে।

এবার আমার জীবনের শুরুর গল্পটাও একটু বলি। আমার পৈত্রিক নিবাস রাঙ্গামাটি। কিন্তু আমার দাদা পরিবার নিয়ে বান্দরবানে চলে আসেন। এরপর আমার বয়স যখন তিন বা চার মাস, আমার মা আমাকে নিয়ে আবার রাঙামাটি চলে যান। এর কিছুদিন পরে বাবাও সেখানে চলে আসেন। তো এভাবে আমাদের স্থায়ী ঠিকানা রাঙ্গামাটির জুরাছরি উপজেলার কংঙাছরি গ্রামে।

ছোটবেলায় আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটি স্কুলে পড়তাম। যেহেতু বাসা থেকে যাওয়া-আসা করা সম্ভব না, তাই আত্মীয়ের বাসায় থেকে লেখাপড়া করতাম। এরপর আমি প্যারাছরি মুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ছোটবেলায় মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হতো। বিকেলে বন্ধুরা যখন মা-বাবার সাথে ঘুরতে বের হতো তখন মায়ের কথা অনেক মনে পড়ত। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার একজন শিক্ষকের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন বাবা। স্যারের সহযোগিতায় আমি পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পেলাম। দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কখনো আমার রোল এক থেকে দুই হয় নি।

এরপর আমি বনযোগী ছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। এই স্কুলটি আগের স্কুলের মতো অত দূরে না হওয়ায় বাড়ি থেকেই যাতায়াত করতাম। কিন্তু সেখানে যেতে একটা নদী পার হতে হয়। গ্রীষ্মকালে নদীটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। একথাগুলো বলার কারণ হলো শহরের মানুষেরা হয়তো জানবেই না যে, আমরা যারা পাহাড়ে থাকি আমাদের কত কষ্ট করে লেখাপড়া করতে হয়।

হাই স্কুলে গিয়ে আমার লেখাপড়া একটু কম ভালো হওয়া শুরু হয়। ফলে অষ্টম শ্রেণিতে রেজাল্ট ভালো হলো না। ঐ সময় আমাদের এলাকা থেকে পরিচিত কয়েকজন কোয়ান্টামে পড়ত। শুনতাম তাদের রেজাল্ট আমার চেয়ে অনেক ভালো। ফলে আমার মা আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি হওয়ার জন্যে বললেন। আমি নবম শ্রেণির জন্যে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। আমারও ইচ্ছে ছিল ভর্তি হওয়ার। কিন্তু চান্স পেলাম না। এরপর আমি আবার আমার স্কুলে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলাম। সেখানে শিক্ষকেরা অনেক আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে আমার এসএসসি-র রেজাল্ট আবার আশানুরূপ হলো না।

আমার পরিবার আবার আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তির কথা বলল। ভাগ্য দেবতার সহায় আমি এবার কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। যেহেতু আমার এসএসসি-তে রেজাল্ট তেমন ভালো ছিল না, তাই আমি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ পেলাম না। মানবিক বিভাগে ভর্তি হলাম।

কলেজের শুরুতে এই পথটা সহজ ছিল না। জানতে পারলাম যে এখানে মোবাইল চালানো যায় না। তখন মনে হতো—যদি মোবাইল চালাতে নাই পারি তাহলে এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। প্রথম একমাস আমি নাক-চোখ

২০১৫-২০১৯ টানা পাঁচবার জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্যারেড ও ব্যান্ড বাদনে আমরা প্রথম হই। ২০১৮ সালে ব্যান্ড মেজর হিসেবে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে পুরস্কার গ্রহণ করছি আমি (বাম পাশে ১ম)

বন্ধ করে থাকলাম। কিন্তু আর না! এবার সিদ্ধান্ত নিলাম ক্যাম্পাস থেকে পালানোর। কিন্তু পালানোর আগের দিন আমাদেরকে নিয়ে একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করা হলো। প্রোগ্রামটির বিষয় হলো লাইফ স্কিল সায়েন্স। নৈতিক ডিপার্টমেন্টের জহুরুল হক স্যারের পরিচালনায় সাত দিনব্যাপী চলল এই প্রোগ্রাম। আমার মনে পরিবর্তন এলো। সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে এখানেই থাকতে হবে। লক্ষ্য ঠিক করে ফেললাম। সেই প্রোগ্রামে প্রথম শুনেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। এর আগে কখনোই জানতাম না যে, কলেজে পড়ার পরেও আরো পড়াশোনা আছে। উপলব্ধি করলাম—ভালো পড়ালেখা করে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে।

কিছুদিন যাওয়ার পর কোয়ান্টামের নিয়মগুলোর সাথে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। পড়া শুরু করলাম নতুন উদ্যমে। কলেজের আসাদ স্যারকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। তার সঠিক দিক-নির্দেশনা অনেক সাহায্য করেছে।

এভাবেই এইচএসসি পরীক্ষার সময় চলে এলো। পরীক্ষা দিলাম। শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা প্রস্তুতির নতুন এক অধ্যায়। পড়ালেখা হলো সার্বক্ষণিক সঙ্গী। অ্যাডমিশনের প্রস্তুতি নেয়ার সময় একই পড়া বার বার পড়তে খুব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের ভর্তি কোচিং করানোর জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রনি ভাই এসেছিলেন। তিনি আমাদের কল্পনা করতে শেখালেন এভাবে—আমরা আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাচ্ছি এবং নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টের ক্লাস রুম ও বারান্দায় হাঁটছি—এই কল্পনা সবসময় করতে বললেন। সেদিনের কথাগুলো খুব ভালো লাগল। এরপর থেকে নিয়মিত মেডিটেশন, অটোসাজেশন এবং প্রত্যয়নে এই কল্পনা করতাম।

আমি কলেজ থেকে ৪৩১ তম ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। তখন বুঝতে পেরেছিলাম জীবন কীভাবে পরিচালনা করতে হয়। কীভাবে কার সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করতে হয়। কীভাবে মাথা ঠান্ডা করতে হয় আর ব্রেনকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়। এখন বুঝতে পারি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স একজন মানুষের জন্যে কত গুরুত্বপূর্ণ।

আমার স্বপ্ন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে পড়ব। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দিল। আমি আমার জীবনে প্রথমবারের মতো এ প্লাস পেলাম। সেদিন আমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। সেদিনের পর আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে গেল—আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবই। তাই ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম তুলি নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'খ' ইউনিটে পরীক্ষা দেয়ার পর আমি আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাই দেই নি। কেননা ভর্তি পরীক্ষা ভালো হয়েছিল।

স্রষ্টাকে ধন্যবাদ যে, আমি কোনো ধরনের কোটার সুযোগ না নিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অবস্থান ছিল ৭৪২ তম। যদিও আমার কোটা গ্রহণের সুযোগ ছিল। কিন্তু আমি তা নিই নি। আইন বিভাগ পেলাম না যদিও, শিক্ষা ও গবেষণা ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলাম। আমার পরিবারে আমি ছাড়া আর কেউ এতদূর আসতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয় কী সেটা জানতামই না, সেখানে আজ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী। এখন আমি দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি।

ভবিষৎ পরিকল্পনা নিয়ে বলতে গেলে আপাতত আমি উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আমেরিকা বা কানাডা যেতে চাই এবং সেটা ফুল স্কলারশিপ নিয়ে। আর অবশ্যই কোয়ান্টামের সাথে থেকে মানুষের সেবা করতে চাই। আমি জীবনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছি এবং সময়ের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি কোয়ান্টামের সংস্পর্শে এসে। কোয়ান্টামের ছায়াতলে আসতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সঙ্ঘের সকল মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিকতা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেজন্যে ধন্যবাদ জানাই সেসব মানুষদের যারা আমার এবং আমাদের পেছনে এত শ্রম দিয়েছেন। □

স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে

পিএসমং মার্মা
এমবিবিএস শিক্ষার্থী, চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ

আমার বাড়ি বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার মংচাপাড়ায়। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হই। কোয়ান্টামে সাধারণত ছাত্ররা শিশুশ্রেণিতে ভর্তি হয়। কিন্তু আমি একটু বড় হয়ে এখানে আসি। আমাদের পাড়া থেকে কয়েকজন এখানে পড়ত তারা যখন ছুটিতে বাড়ি আসত তাদের আচার-আচরণ দেখে ভালো লাগত। আমার বড় ভাই বলত কোয়ান্টামে পড়তে গেলে ওদের মতো আমি হতে পারব।

ছোটবেলায় আমার দাদা আমাকে বলেছিলেন এমবিবিএস ডাক্তার হয়ে এ অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা করতে। দাদা মারা যাওয়ার প্রায় ১২ বছর পূরণ হয়েছে। সে-সময় মনে হতো দাদার স্বপ্ন কি আমি পূরণ করতে পারব?

আমি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত বাড়ির বাইরে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছিলাম। পঞ্চম শ্রেণিতে আলীকদম আর্দশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে পড়েছিলাম আলীকদম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে।

স্কুলটিতে সুযোগ-সুবিধা তেমন ছিল না। সম্পূর্ণ নিজ খরচে পড়তাম সেখানে। বাবা মাসে মাসে টাকা দিয়ে আসতেন।

বাবা গাছ কাটার মিলে কাজ করতেন। আয় হতো নামমাত্র। আমরা তিন ভাইবোন। আমি, আমার বড় বোন এবং ছোট ভাই। দেখা যেত দিন শেষে বাবার আয়ের চেয়ে খরচের পাল্লাই বেশি ভারি। এসব কারণে আমার কোয়ান্টামে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে আরো তীব্র হলো। বাবাও আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি করানোর অনেক চেষ্টা করলেন।

এলাকার বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম কোয়ান্টামে ভর্তি পরীক্ষা দিব। সবাই মিলে এলাম। মনে হয়েছিল বন্ধুরা মিলে বনভোজনে এসেছি। পরীক্ষা বলতে যা হলো তা কিছু খেলা। বাড়ি ফেরার পথে সবাই মিলে আলোচনা করছিলাম যে এটা কোন ধরনের পরীক্ষা! এগুলো যে ফিটনেস টেস্ট তা তখন বুঝি নি। চান্সও পেয়ে গেলাম। ভর্তি হলাম।

কোয়ান্টামে গিয়ে সর্বপ্রথম অবাক হলাম শিক্ষকদের দেখে। ছোটবেলায় বিভিন্ন মুভিতে দেখতাম স্কুলে অনেক নামি শিক্ষক, কোয়ান্টামে এসে দেখলাম শিক্ষকেরা সে ধরনের সম্মানধারী। স্যারদেরকে দেখে খুব ভালো লেগেছে আমার। এত আন্তরিকতা, এত মমতা! সহজে পড়ালেখায় মনোযোগ আসে। যে-কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে স্যারেরা প্রথমে পাশে এসে বসেন তারপর সুন্দর করে উত্তর বুঝিয়ে দেন। সবসময় লক্ষ্য ঠিক রাখতে বলেন। আরো বলেন, কখনো হাল ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু নবম শ্রেণিতে উঠে আমি আমার লক্ষ্য থেকে আলাদা হয়ে যাই। আমার লেখাপড়া খারাপ হওয়া শুরু করে। এরপর আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলাম। মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা বাড়ালাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু একসাথে পড়া শুরু করলাম। নিজেরা নিজেদের সহযোগিতা করতাম। এভাবে এগোতে এগোতে একটা বিশ্বাস চলে এলো—আমিও পারব।

আমি এসএসসি পরীক্ষায় ৪.৯১ এবং এইচএসসি-তে ৪.৫২ পেলাম। অনেক ভয় লাগছিল। ভেবেছিলাম এই জিপিএ নিয়ে হাজারো ভালো শিক্ষার্থীর সাথে লড়াই করে আমার পেরে উঠতে অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু লক্ষ্য ছিল দৃঢ়। যত বাধাই আসুক আমি তা চুরমার করে লক্ষ্যে পৌঁছাবই। এই প্রত্যয় নিয়ে আবারো মাঠে নামলাম।

এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কোয়ান্টাম থেকে আমাদের

অ্যাডমিশনের প্রস্তুতির জন্যে সুযোগ দেয়া হলো। পড়ালেখা চলল স্রোতের বেগে। অন্য সকল চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু পড়ালেখা। মাঝে মেডিটেশন, খাবার আর কিছু লেকচার ক্লাস। এসময় আমরা পেয়েছিলাম স্যারদের ভালবাসা আর শাসন। তারা দিনরাত এক করে আমাদের যত্ন নিয়েছেন। আমাদের সাথেই খাবার খেতেন। ঘুমাতেন আমাদের সাথে। ঢালের মতো আমাদের আগলে রেখেছিলেন। তিন মাস কেটে গেল, এবার সেই অন্তিম লগ্ন। আমরা পরীক্ষা দিলাম।

আমি নিয়েছি মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতি। ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। মনে শান্তি পেলাম না। কোথায় যেন একটু ভয় থেকে গেল। ডেন্টাল কলেজেও পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট বের হলো। সিলেট মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে চান্স পেলাম। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকল মেডিকেলে। কিছুদিন পর মেডিকেলের রেজাল্ট দিল। আমি থাকলাম ওয়েটিং লিস্টে। হতাশ হয়ে গেলাম। কোনোকিছু করেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। কলেজ থেকে আমাকে সিলেটে পাঠানো হলো ডেন্টালে ভর্তি হওয়ার জন্যে। তবু থেমে থেমে কান্না আসতে লাগল।

মন খারাপের সময় একটি সংবাদ শুনে চমকে উঠলাম। স্যার এসে জানালেন আমি মেডিকেলে চান্স পেয়েছি। দেহে যেন প্রাণ ফিরে এলো। কোনো কথাই বলতে পারলাম না কিছুক্ষণ। হঠাৎ এক বন্ধুর ধাক্কায় আমি স্বাভাবিক হই। সাথে সাথে বাড়িতে ফোন দিলাম। দাদার রেখে যাওয়া স্বপ্ন আজ সত্যি হতে চলেছে। দাদার প্রার্থনা এবং এই স্কুলের সহযোগিতা না থাকলে হয়তো আমি এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না।

আমাকে আমার পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে। পাশাপাশি আমার এলাকার মানুষদের চিকিৎসার মাধ্যমে সেবা করতে চাই। কোয়ান্টামে থাকা অবস্থায় আমার একবার পা ভেঙে গিয়েছিল। আমি তিন মাস শাফিয়ানে ভর্তি ছিলাম। তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেদিন ডাক্তার হতে পারব সেদিন এখানে এসে অন্তত একদিনের জন্যে হলেও সেবা দিব। স্রষ্টা যদি আমাকে ভালো ডাক্তার হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আমি অবশ্যই মানবসেবায় নিজের মেধাকে কাজে লাগাতে চাই। □

১৩ বছর ধরে শিখেছি কীভাবে পারতে হয়

থোয়াইছাচিং চাক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বাড়ি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায়, যেখানে চাক জনগোষ্ঠীর বসবাস। পরিবারের তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই সবার বড়। আমাদের এলাকায় লেখাপড়ার পরিবেশ স্বাভাবিকভাবে খুবই অনুন্নত। তাই আমার মা-বাবা সবসময় চাইতেন আমাকে ভালো কোথাও পড়াবেন। কিন্তু দূরে কোথাও পড়াতে পাঠালে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এত খরচ বহন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার দূরে ছেলেকে পাঠাতে তারা ভয়ও পেতেন।

আমার মা-বাবা কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন আমাদের পাড়ার এক বড় ভাই মংহ্লাচিং চাকের মা-বাবার কাছ থেকে। মংহ্লাচিং ভাই হলেন আমাদের চাক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম ছাত্রদের একজন যিনি এই স্কুলে শিশুশ্রেণিতে ভর্তি হয় এবং তিনি দিব্যি পড়াশোনা করছিলেন তখন। তাই আমার বাবা আমাকে এখানে পাঠানোর ভরসা পেলেন।

ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী আমি চান্স পেলাম। তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স আমার। কত স্মৃতি জমে আছে এই স্কুলকে ঘিরে। কত বন্ধু!

অভিভাবকতুল্য শিক্ষক! আনন্দ-বেদনা! কত গল্প! আমি ২০০৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে ১৩ বছর পড়েছি। সময়টা নেহাত কম নয়!

নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ নেয়ার পরই বিজ্ঞানের বিষয়গুলো আমাকে কৌতূহলী করে তোলে। আমি ঠিক করি, বিজ্ঞান নিয়ে যখন পড়ছি শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান নিয়েই সামনে এগিয়ে যাব।

আমি যখন কোয়ান্টাম কসমো কলেজের একাদশ শ্রেণিতে পড়ি, তখন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পদার্থবিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী স্যার এসেছিলেন। এত বড় মাপের একজন বিজ্ঞানী আমাদের ক্যাম্পাসে আসবেন, আমরা এ নিয়ে উৎসুক ছিলাম। আমার যেহেতু বিজ্ঞান সবসময় পছন্দের বিষয় ছিল, তাই আমার উৎসাহের পরিমাণ ছিল একটু বেশি।

আমাদের হাই স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসের নাম ছিল তখন ভ্যালি হিকমান। এই গুণীজনকে আমরা আমাদের ক্যাম্পাস মাঠে গার্ড অব অনার প্রদান করি। সেদিন স্যার বলেছিলেন, 'প্যারেডের সার্বিক অর্থটা হলো অগ্রগতি। তোমাদের চোখে-মুখে ভবিষ্যৎ জয়ের ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমরা জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এভাবেই মার্চ করবে। তোমরা শুধু লামার সন্তান নও, তোমরা এই বাংলাদেশের সন্তান। আর জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, খেলাধুলায় সর্বক্ষেত্রে তোমরা উৎকর্ষ সাধন করবে। তখন তোমরাই হবে বিশ্বের সুন্দর সন্তান।' এই কথাগুলো আমাকে এখনো অনুপ্রাণিত করে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ জীবনে ড. এম শমশের আলী স্যারসহ দেশের আরো বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে আমরা কাছে থেকে দেখতে পেয়েছি। তাদের থেকে জানতে পেরেছি সংগ্রাম করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর মূলসূত্র। গুণীজনদের দিক-নির্দেশনা, শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতা এবং নিজ অধ্যবসায় যুক্ত করার কারণে আজ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার একজন শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশের চাক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমিই প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

শুধু লেখাপড়াই না, আমি যেন ভালো আচরণ অর্থাৎ শুদ্ধাচার শিখতে পারি তার জন্যেও মূলত আমার মা-বাবা কোয়ান্টামে আমাকে ভর্তি করিয়েছিলেন।

আজ তারা সত্যিই সন্তুষ্ট। আমার আজকের এই অবস্থানে পৌঁছানো ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। আমার মা-বাবা সবসময় কোয়ান্টামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মা-বাবা এবং ছোট দুই ভাই, সবাইকে নিয়ে আমাকে ভালো কিছু করতে হবে। মা-বাবাকে দেখে রাখতে হবে। কারণ জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন তারা। আমার দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে।

আমি বিশ্বাস করি আমি পারব। কারণ কীভাবে পারতে হয় কোয়ান্টা জীবনে ১৩ বছর সেটা আমি শিখেছি। ভবিষ্যতে আমি পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করে নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদাহরণ হতে চাই। □

ভালো থাকুন প্রিয় শোভন স্যার!

জাকের হোসেন শাহিন

মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

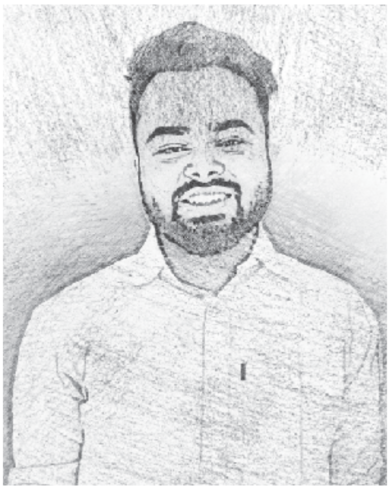

সময়টা ২০১০ সাল। তখন আমি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি বান্দরবানের লামা উপজেলায় নুনারবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে প্রথম দেখি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের। তাদের কোয়ান্টা বলে ডাকা হয়। সেদিন ওদের প্যারেড পারফরমেন্স এতই মনোমুগ্ধকর ছিল যে, সেটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। নিজের মধ্যে একটা ভাবনা আসে তখন থেকেই যে, এমন একটা স্কুলে যদি পড়তে পারতাম!

বান্দরবান লামার মধুঝিরি গ্রামে আমার জন্ম। নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া একটা ছেলে জানে, তাকে কত সংগ্রাম করে পড়ালেখা করতে হয়। ছোটবেলা থেকে পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কারণে শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র ছিলাম। নানা চড়াই উতরাই পার করে স্থানীয় একটি স্কুল থেকে আমি ২০১৪ সালে জেএসসি সম্পন্ন করি। পরিবারে আর্থিক অনটন এবং আমাকে ভালো একটি স্কুলে পড়ানোর চিন্তা থেকেই মা-বাবা কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তির

সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা শুনে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করছিল।

মনে পড়ে ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে মায়ের হাতে বানানো আমার প্রিয় চিতই পিঠা খেলাম। অশ্রু টলমলে চোখে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একটা জীবনের সূচনা ঘটাতে, নতুন পথে অগ্রসর হতে।

শুরু হয়ে গেল আমার কোয়ান্টা জীবন। প্রথম কয়েক মাস একটু কষ্ট হয়েছে। কিন্তু সবার সাথে মিশে যেতে পারার গুণটা আমার আগে থেকেই ছিল। সবাইকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপন করে নিলাম। নিজের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটতে থাকল। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স এবং নিয়মিত মেডিটেশন ছিল পরিবর্তনের মূল কারিগর।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের একজন কোয়ান্টা ছিলাম বলেই দেশসেরা আলোকিত ব্যক্তিবর্গকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। কারণ আমাদের স্কুলে প্রায়ই দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা আসতেন। তাদের কথা দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হতাম। আমার ধারণা, বাংলাদেশের স্বনামধন্য স্কুলের শিক্ষার্থীরাও এত বরেণ্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্য পায় না যতটা না আমরা পেয়েছি।

সেই যে ছোটবেলায় কোয়ান্টামের প্যারেড দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কখনো ভাবি নি যে, আমিও একদিন এদের অংশ হয়ে যাব। অথচ তা-ই ঘটেছে। ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকৃত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের প্যারেড দলের আমি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলাম।

পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও ছিল আমার প্রবল আগ্রহ। আর সেটার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছি এই স্কুলের ভলিবল টিমের একজন খেলোয়াড় হয়ে। কিছুদিন আগে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম। সেখানে ছোট ভাইদের খেলা দেখে আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল।

এভাবেই একসময় এসএসসি ও এইচএসসি সম্পন্ন করি কৃতিত্বের সাথে। মা-বাবা ও স্কুলের শিক্ষকেরা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তাই আমি প্রত্যয়ী হয়ে উঠলাম যে, আমাকে ভালো করতেই হবে।

ভালো মতো পড়ার পরিকল্পনা শুরু করলাম। শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ। এই সময়ে কলেজ থেকে যে সাপোর্ট পেয়েছি, সেটা সত্যিই বলে শেষ করা যাবে না। এখানে না পড়লে হয়তো এই প্রত্যন্ত এলাকায় থেকে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তো দূরের কথা, স্বপ্নটাও দেখতাম না।

প্রায় তিন মাস কসমো কলেজ ক্যাম্পাসে ভর্তি কোচিংয়ে কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায়। আমি মেধা তালিকায় ৫৩৬ তম স্থান অর্জন করি। আমার জীবনের সেরা অর্জনগুলোর এটি একটি। লামা পৌরসভায় ৭নং ওয়ার্ড মধুঝিরি গ্রাম থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র।

২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত, অজস্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে। কিছু কিছু ব্যাপার খুব অবাক হতে বাধ্য করত। ক্যাম্পাসের সবাই একসাথে খেতে যাওয়া ছিল এমনই এক ঘটনা। প্রায় হাজার জন কোয়ান্টা খেতে বসতাম কিন্তু কোনো শব্দও হতো না। আমি জানি না কতজনের ভাগ্যে এমন সুযোগ হয় এমন বিরল দৃশ্যের অংশ হওয়ার।

স্যারদের ভালবাসা এবং শাসন খুব বিস্মিত করত আমাকে। বাঙালিসহ প্রায় ২২ জনগোষ্ঠী মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া ছিল আমার জীবনের অন্যতম একটি প্রাপ্তি। এখনো তা উপলব্ধি করি।

একজনের কথা না বললেই নয়। তার জন্যে বুকের ভেতরটা এখনো হাহাকার করে। যে মানুষটার ডাকে আমার সকাল শুরু হতো। তিনি আমাদের রিয়াসাত আরেফিন শোভন স্যার। তিনি আমাদের আবাসিকের মূল দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে আমাদের ছেড়ে স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে যান।

শোভন স্যার আমার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন। স্যারের স্নেহ ভালবাসা আমি আজীবন মিস করব। সময় পেলেই তার সাথে আমি গল্প করতাম। তিনি আমাকে সবসময় উৎসাহ দিতেন আর বলতেন—'শাহিন তুমি পারবা।' স্যার আমার বড় ভাইয়ের বয়সী হলেও পিতার মতো অভিভাবক ছিলেন। আমি তাকে বলতাম, স্যার, আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এই জঙ্গলের মতো একটি জায়গায় স্কুলের আবাসিকের দায়িত্ব নিয়ে কেন এসেছেন? আপনি চাইলে তো বড় কোনো একটা চাকরি করতে পারতেন। কিন্তু স্যার এসবের জবাবে কিছুই বলতেন না। মুচকি হেসে এড়িয়ে যেতেন। আহ! তার সেই হাসি আমাকে এখনো কাঁদায়।

প্রিয় শোভন স্যার! যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন। এখন বুঝতে পারি, আপনি কেন এসেছিলেন এই প্রত্যন্ত লামায় কাজ করতে। কারণ আপনি মানুষের জন্যে ভাবতেন, তাদের জন্যে কিছু করতে চাইতেন।

প্রয়াত রিয়াসাত আরেফিন শোভন স্যার, এক ক্ষুদে কোয়ান্টার সাথে

কোয়ান্টামে এসে আমি জীবন সম্পর্কে অন্যরকম একটি ধারণা পেয়েছি। এটি শুধুই একটি স্কুল বা কলেজ ছিল না, আমার জীবনের মূল্যবোধ তৈরি হয়েছিল এখানে। আসলে ভালো-মন্দ মিলিয়ে এই পাঁচটি বছর ছিল আমার জীবনের ডায়েরিতে চিরস্মরণীয় একটি সময়।

জীবনের সব যুদ্ধেই আমি জয়ী হবো বলে আমার বিশ্বাস। কেউ যখন আমার সামনে এসে দুঃখের কথা বলে, হতাশার কথা বলে, তখন তাকে আমার গল্প শোনাই। আর তাকে বলি—আমি যখন পেরেছি, তুমিও পারবে। □

শিখেছি কীভাবে মানুষকে ভালবাসতে হয়

তনক চাকমা
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

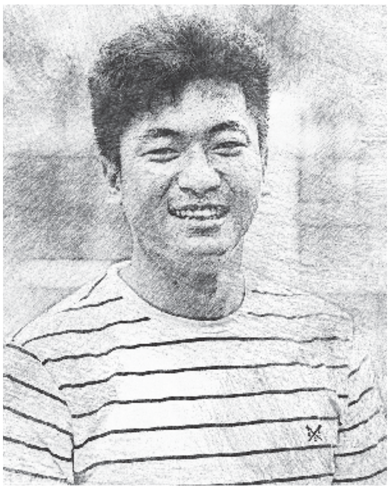

কোয়ান্টামমে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে কোয়ান্টাদের একটা টিমের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমিও কাজ করেছি সেদিন। কোলে বাচ্চা নিয়ে এক মা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। বাচ্চাটা বেশ স্বাস্থ্যবান, নাদুসনুদুস। বাচ্চাটাকে কোলে রাখতে মায়ের কষ্ট হচ্ছে। তিনি আমাকে বললেন যে, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে একটু লাইনের সামনে এগিয়ে দাও।

আমি চিন্তা করলাম কী করা যায়! এতজন মানুষকে ডিঙিয়ে কীভাবে সামনে নিয়ে যাব। এটা উচিতও হবে না। আমি শিশুটাকে কোলে নিয়ে বললাম, আপনি লাইনে দাঁড়ান, আমি আপনার বাচ্চাকে ধরে রাখছি। প্রায় একঘণ্টার মতো শিশুটাকে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওর মা যখন লাইনের সামনে গেলেন তখন শিশুটিকে তার কোলে দিলাম। এখন বুঝতে পারি তখনকার সিদ্ধান্তটাই ঠিক ছিল। শৃঙ্খলা না ভেঙে, নিয়ম না ভেঙে আমি অন্তত একজনকে সাহায্য করতে পেরেছি। সে-সময় আমার আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে যে আমি আসলে কিছু একটা করতে পারি।

রাঙ্গামাটি সদরে রাঙ্গাপানি গ্রামে আমাদের বাড়ি। মা-বাবার বড় সন্তান হিসেবে এখানেই আমি বেড়ে উঠি। আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চেয়েছিলেন বলে প্রায় ১৪ বছর ভিক্ষু সন্ন্যাসী ছিলেন আমার বাবা। কিন্তু একসময় তিনি সংসারজীবন শুরু করেন। আমার দাদুও ভিক্ষু হয়েই শেষ জীবনটা পার করেছেন। পেশাগতভাবে বাবা মনোঘর আবাসিক বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক ছিলেন।

আমিও সেই স্কুলে পড়তাম। কিন্তু স্কুল লাইফটা আমি তেমন উপভোগ করতে পারি নি। বাবা শিক্ষক ছিলেন বলে সবাই আমাকে একটু অন্য চোখে দেখত। বন্ধুরা আমার সাথে মিশত না। তাদের একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আমার বাবা স্কুল থেকে প্রশ্ন নিয়ে আমাকে দেয় আর আমি সেই প্রশ্নে পরীক্ষা দেই। আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি যে, বাবা কোনোদিন এ কাজ করেন নি। স্কুলে যে-কোনো সাধারণ শিক্ষার্থী যে সুবিধাগুলো পায় আমি সেটা পেলেও দোষ। যে কারণে দেখা যেত আমি ক্লাসের এক কোণায় চুপচাপ বসে থাকতাম, কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগত না, কারো সাথে মিশতে পারতাম না।

স্কুলে অন্য শিক্ষকদের আমার কাছে সিসি ক্যামেরার মতো লাগত। আমি যা করি না কেন বাবার কাছে রিপোর্ট চলে যেত। তারপর বাবা আমাকে বকাঝকা করতেন। আমি চাইতাম স্কুলের প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করতে, চাইতাম অন্যকিছু করতে। একাডেমিক ক্ষেত্রে স্কুলে একমাত্র আমিই ইংরেজিটা ভালো বলতে পারতাম। অন্যান্য বিষয়গুলোতে আমার কোনোভাবেই ভালো রেজাল্ট হতো না। আমি ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে আমার বাবার সাথে ইংরেজিতে কথা বলার চর্চা করতাম। বাড়িতে বাবা সে-রকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তখন থেকে একটা স্বপ্ন ছিল আমি দোভাষী হিসেবে কাজ করব।

স্কুলের পরিবেশটা প্রতিকূলে থাকায় আমার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হচ্ছিল না। তাই বান্দরবানে থাকা আমার ফুফু যখন কোয়ান্টামের কথা বললেন, আমি রাজি হয়ে গেলাম। এসএসসি-তে কমার্স থেকে পড়াশোনা করে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হলাম। মা-বাবা এটাতে রাজি ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল এত দূরে বাঙালিদের একটা পরিবেশে কী না কী হয়! এটা নিয়ে মায়ের নানান দুশ্চিন্তা।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এখানে অন্তত কিছু একটা করতে পারব। এসএসসি-র পর একটা মোবাইল কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখানে মোবাইল

ব্যবহার করতে দেয় না। পরে নিজেকে সামলে নিলাম।

আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাড়ি থেকে দূরে থাকা। আমি প্রায় তিন-চার দিন কেঁদেছি। বাসার কথা মনে পড়ত, বিশেষ করে মায়ের কথা। কারণ বাইরে আগে কখনো একা থাকি নি। কোনো আত্মীয়ের বাসায় গেলেও একদিনের বেশি থাকতে পারতাম না। বাড়ির পরিবেশটা খুব ভালো না লাগলেও একটা টান অনুভব করতাম। এখনো আমার এই টানটা আছে।

এখানে এসে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আচার-আচরণ শেখা। তাই আমি সবসময় বলি—কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে জীবনটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার বাবার ছোট একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি আছে। বাড়িতে থাকাকালে আমি পুরোটা সময় বই পড়তাম।

নতুন একটা বই পড়েছিলাম—*আলকেমিস্ট* বইয়ের বাংলা অনুবাদ। ওখানে একটা লাইন আমার এখনো মনে আছে। লাইনটা হচ্ছে 'আপনি যখন মন থেকে ভালো কিছু করতে চাইবেন, পুরো মহাবিশ্ব আপনাকে ওটা অর্জনে সাহায্য করবে।' এই বিশ্বাসটাকে ধারণ করে মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি প্রার্থনা শুরু করেছি। আমি নেতিবাচকতার বৃত্ত ভাঙতে পেরেছি। সামনে আরো ভাঙব।

কোয়ান্টা জীবনে স্মরণীয় একটি ঘটনা—আমাদের আবাসিক লিডার শোভন স্যারের মৃত্যুর কথা শোনার পর আমি বড় একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। আমি প্রায় আধা ঘণ্টার মতো কেঁদেছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কীভাবে জলজ্যান্ত একজন সুস্থ মানুষ এভাবে চলে যেতে পারেন। কোয়ান্টামে এসে আমি স্যারের মতো পরিমিত ও গুণসম্পন্ন অমায়িক একজন মানুষের দেখা পেয়েছিলাম। একদিন আমি টি-শার্ট উল্টো করে গায়ে দিয়ে কলেজ থেকে ফিরছিলাম। স্যার আমাকে ডেকে বললেন টি-শার্ট উল্টো থাকার কারণে তোমাকে আনস্মার্ট লাগছে। তুমি অন্যদিকে গিয়ে টি-শার্টটা ঠিক করে এসো। আমি টি-শার্টটা ঠিকভাবে পরলাম। তারপর হাত মিলিয়ে স্যার কুশল জিজ্ঞেস করেন। এটাই ছিল স্যারের সাথে আমার শেষ কুশল বিনিময়। নিজের নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদের চেয়েও বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম তার মৃত্যুর খবরটি পেয়ে।

এখানে এসে আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। একটা ডিবেটিং ক্লাবে ইংরেজিতে বক্তব্য দিয়ে আমি সেরা বক্তা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমি যেগুলো বাড়িতে করতে পারি নি, এখানে এসে সেগুলো

বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেয়েছি। এই আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল যে, আমি সব পারি। আসলে এতদিনে কোয়ান্টামকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

এখন আমি যে মানসিকতা ধারণ করছি তা কোয়ান্টামের পরিবেশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল কোয়ান্টামে এসে। আমার বাবা একজন সৎ স্কুল শিক্ষক। উপার্জন বা কতটুকুই হবে তার। কোয়ান্টামে এসেছিলাম বলে তারও অনেকটা স্বস্তি হয়েছিল।

আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সময় এমনও হয়েছে যে, আমি বই নিয়ে বেঞ্চে শুয়ে আছি আমার মাথায় বালিশ হিসেবে আছে ডিকশনারি। রাত তিনটার দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি আমার ওপর বিড়াল শুয়ে আছে। তারপর তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সও পেয়ে গেলাম।

আমি একজন সমাজসেবক হতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বন্ধুরা মিলে রেললাইনের আশেপাশে যে অবহেলিত শিশুরা আছে তাদের ফ্রি-তে পড়াই। ছোট থেকেই আমার এরকম ইচ্ছে ছিল, কিছু একটা করব। আর কোয়ান্টাম আমাকে আরো শিখিয়েছে কীভাবে মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়, মানুষকে ভালবাসতে হয়। শুদ্ধাচার ও মানবতার শিক্ষা পেয়েছি আমি এই স্কুলে। □

বিদেশে যাব না, দেশেই থাকব

শহীদুল ইসলাম

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

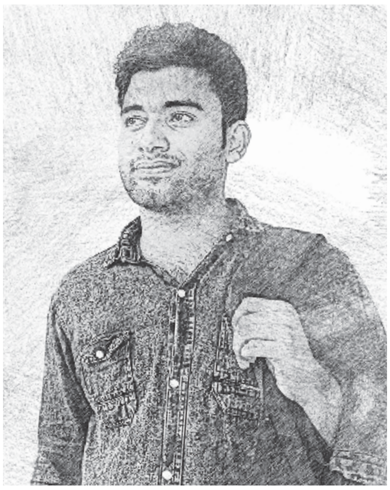

আমার বাড়ি বান্দরবানে লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নে। আমার বাবা একজন প্রতিবন্ধী কৃষক। আমার পড়ালেখা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ তার ছিল না। এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ নেই আমার। গ্রামের একটি স্কুলে আমার শিক্ষার হাতেখড়ি এবং সেখানেই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ি। সে-সময় আমি ইউনিয়নের মধ্যে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছিলাম।

পরে ভর্তি হই লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। যা ছিল আমার বাড়ি থেকে প্রায় ছয় থেকে সাত কিলোমিটার দূরে। স্কুলে আমাকে পায়ে হেঁটে যেতে হতো। কারণ তখনো গাড়িতে যাওয়ার কোনো সিস্টেম ছিল না। আমার বাবা ভাবতেন পড়ালেখা করে কি কিছু করা যাবে? যেহেতু ছোট ছিলাম, এসব কিছু আমি বুঝতাম না।

এর মধ্যে দেখি আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এবং পরিবারকে কাজে সাহায্য করা শুরু করেছে। কিন্তু আমি তখনো

হাল ছেড়ে দেই নি। কারণ সামনে জেএসসি পরীক্ষা। এবার বাবা আমার লেখাপড়া নিয়ে একটু ভাবা শুরু করলেন। পরীক্ষার সময় যাতে আমার যাওয়া আসার সময় বেঁচে যায়, তাই বাবা পরীক্ষা কেন্দ্রের কাছে ঘর ভাড়া খুঁজছিলেন।

কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা চালিয়েও ভাড়া পান নি। তাই আমাকে নিজের বাড়ি থেকে পরীক্ষা দিতে হয় এবং আমি এই পরীক্ষায় পাশও করি। পরে নবম শ্রেণিতে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হই। সে-সময়ে ভালোভাবে পড়ালেখা চালিয়ে গিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে একসময় এসএসসি পরীক্ষা চলে এলো। সেখানেও সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হলাম।

এরপর শুরু হয় এক সংগ্রামের অধ্যায়। যেখানে আমার কিছু বন্ধু কে কোন কলেজে ভর্তি হবে তা নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে আমাকে খুঁজে নিতে হয়েছে একটি পার্ট টাইম জব। সেখান থেকে আমি মাস শেষে চার হাজার টাকা বেতন পেতাম। চাকরি করতে গিয়ে আমি লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই।

এরমধ্যে মা পরিকল্পনা করেছিলেন, কারো কাছ থেকে দুই/ আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে আমাকে বিদেশে পাঠানো যায় কিনা। অবশেষে এই বিষয়ে বাবা আমার সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু বাবাকে আমি বললাম, আমি দেশেই থাকব এবং পড়াশোনা করব। এই কথা শুনে বাবা বললেন, তা কীভাবে সম্ভব? আমাদের তো সে সামর্থ্য নেই। আমি বলেছিলাম, চিন্তা করবেন না, আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবেন।

এই আশা নিয়ে বিভিন্ন কলেজের খোঁজ নিতে লাগলাম—কোথায় কম খরচে আমি পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারব। অবশেষে খোঁজ পাই কোয়ান্টাম কসমো কলেজের। আমিও ভর্তির জন্যে আবেদন করলাম এবং ভর্তির সুযোগও পেয়ে গেলাম। কোয়ান্টামের সাথে যাত্রা শুরু হলো।

তখন আমি পড়ালেখা কী জন্যে করছি সেই কারণটি আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিছু করতে হবে বলতে, শুধু জানতাম ভালোভাবে পড়ালেখা করা। কারণ অধিকাংশ মানুষই ছাত্রাবস্থায় কিছু করা বলতে প্রধানত পড়ালেখাকে বোঝে। সেই ধারাবাহিকতায় আমি আমার পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এই কলেজে এসে আমি বুঝতে পারি স্বপ্ন পূরণে পড়ালেখার গুরুত্ব। শুধু পড়লেই হবে না, নিজের জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করতে হবে। এখানে আরো খুঁজে পাই ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা।

কসমো কলেজে আমার নিয়মিত পড়ালেখা চলতে থাকে। প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। এরপর দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা

দিয়ে তাতেও ভালো রেজাল্ট করি। সব স্যার আমাকে অনেক ভালবাসতেন। স্যারদের কাছে যে-কোনো বিষয় নিয়ে গেলে তারা আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝি ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিতেন। সামনে এইচএসসি পরীক্ষা তাই সব সিলেবাস গোছানো শেষ। এখন শুধু বাকি পরীক্ষা দেয়া এবং ভার্সিটিতে ভর্তির জন্যে প্রস্তুতি।

কিন্তু এর মধ্যে শুরু হলো নতুন এক আতঙ্ক, করোনা মহামারি। শুরু থেকে গুরুজী দাদু এই আতঙ্ক নিয়ে ভয় না পাওয়ার জন্যে বলেছিলেন। সামাজিক দূরত্ব নয়, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলতেন এবং আমরা তা-ই করতাম। কিন্তু সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সকল পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়া হলো। স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ায় আমিও বাসায় চলে যাই। এরই মধ্যে এলাকার অনেকে বলাবলি শুরু করল পড়ালেখা করে আর কিছুই করা সম্ভব না।

কিন্তু আমি তাতে বিশ্বাস করতাম না। আমি আমার স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস রাখলাম এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ চালিয়ে গেলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই সরকার ঘোষণা দিল ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষা হবে না। অটোপাশ করে দেয়া হবে। কিন্তু আমি তো ভালোমতো পড়ালেখা করেছিলাম কলেজে এসে। এখন এই পড়ালেখার কোনো মূল্যায়ন করা হবে না!

রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। রেজাল্টে আমি এ মাইনাস পেলাম। এই রেজাল্ট দিয়ে ভালো কোনো ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করা যায় না। কিন্তু সে-বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন এক উদ্যোগ নিয়েছিল যার নাম গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা ২০২০। শুরুতে খুশি হলেও এতে তেমন উপকার হয় নি। কারণ আমি আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি নি। তারপরেও আমি হাল ধরে রেখেছিলাম। তখনো আমি বিশ্বাসী ছিলাম—আমি পড়ালেখা করব এবং তা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। মেডিটেশনে সবসময় মনছবি দেখতাম। আসলেই নিয়মিত মেডিটেশন করলে মনছবির বীজ অঙ্কুরিত হয়, মনোযোগ বাড়ে, যে-কোনো বিষয়কে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়—এর প্রমাণ আমি নিজেই।

কিছুদিন পর জানতে পারলাম, গুচ্ছ ভর্তি কমিটি আবেদনের শর্ত কমিয়ে দেয়। আমি আবেদনের যোগ্যতা পেয়ে যাই। আবেদন করার পর আমার আশেপাশের বন্ধুরা কেউ ঢাকা, কেউ চট্টগ্রামের নামিদামি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হচ্ছে। শহরে থেকে পড়াশোনা করছে।

আমি এসব সুযোগ-সুবিধায় বিশ্বাসী ছিলাম না। আর চাইলেও আমার বাবা আমাকে সেই সুযোগ করে দিতে পারবেন না। কিছুদিন পর পরীক্ষার

তারিখ হলো এবং পরীক্ষাও দিয়ে ফেললাম। আমি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিভাগে প্রথম হলাম এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলাম।

আমি বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের সাবজেক্টে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার সাবজেক্টে আমার রোল এক। বর্তমানে আমি আমার বিভাগের শ্রেণি প্রতিনিধি, যা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দায়িত্ব। আমি ভবিষ্যতে (সিএ) চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হতে চাই।

আমার এই অবস্থানে পৌঁছানোর পেছনে মূল অবদান হচ্ছে আমার শিক্ষকদের এবং কোয়ান্টামের। আমি কোয়ান্টা পরিচয়টি আজীবন খুব গর্বের সাথে ধারণ করতে চাই। □

খাতার প্রচ্ছদে দেখতাম ইউনিভার্সিটি লেখা

নবজ্যোতি চাকমা

রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

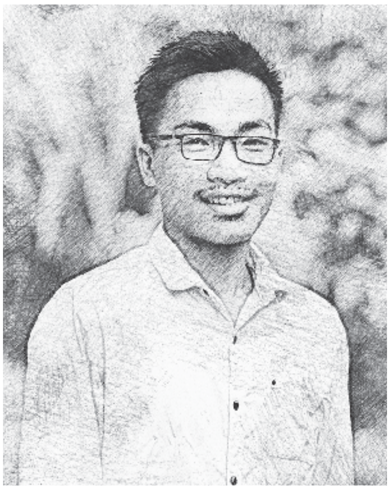

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার একটি চাকমা পাড়ায় আমাদের বসবাস। মা-বাবা ও ছোট বোন নিয়ে আমাদের সংসার। ছোট বোন বর্তমানে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়াশোনা করছে। আগে থেকেই বাবা জুমচাষ করেন এবং পশুপালন করেন। জুমে হলুদ চাষ হয়। জুমচাষ এবং পশুপালন করে যা টাকা পায় তা দিয়ে পরিবার এবং আমাদের পড়াশোনার খরচ চালান। বাবা সবসময় চেয়েছেন তার সন্তানদের পড়ালেখা করাতে।

২০১৭ সালে এসএসসি পাস করে চিন্তা করলাম আমি ভালো একটা কলেজে ভর্তি হবো। বর্তমানে অনেক কলেজে রাজনীতি, মারামারি, হাঙ্গামা চলতে থাকে। আমি এমন কলেজ খুঁজছিলাম যেখানে শান্তি মতো পড়ালেখা করা যাবে এবং বিনা খরচে পড়া যাবে। কারণ বাবার পড়াশোনার খরচ চালাতে কষ্ট হচ্ছিল। একদিন আমার মামা বললেন, কোয়ান্টাম নামে একটা ভালো প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে আমরা যে-রকম প্রত্যাশা করি তার থেকে বেশি

সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, ভালোভাবে পড়াশোনা হয়। এর আগে আমি কোয়ান্টাম সম্পর্কে শুনি নি। যেদিন মামার কাছ থেকে নাম শুনেছি, সেদিন টিভিতে দেখলাম কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের প্যারেড দল সুশৃঙ্খলভাবে প্যারেড করে যাচ্ছে। সেদিন থেকে আমার কোয়ান্টামের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল।

কয়েকদিন পর ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্যে আমি বাবার সাথে কোয়ান্টামে এলাম। এখানে শিক্ষার্থীদের কোয়ান্টা বলা হয়। সন্ধ্যায় আমি দেখলাম কোয়ান্টারা স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। স্লোগানটি হলো—আমি পারি আমি করব, আমার জীবন আমি গড়ব। এটা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। এরপর এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার ভালোলাগা আরো বেড়ে গেল। ভাবলাম, আমাকে এখানে ভর্তি হতেই হবে। এখানকার পড়ালেখার পরিবেশের মতো পরিবেশ বাইরে আর কোথাও হতে পারে না।

আমি বাড়িতে থাকার সময় যে-কোনো একটা নির্জন জায়গা পেলে ধ্যানে আত্মনিমগ্ন হতাম। মামার কাছ থেকে শুনেছি কোয়ান্টামে ধ্যানচর্চাও হয়। এটি আমাকে আরো বেশি কৌতূহলী করে। প্রথমদিন আমি আর আমার বাবা কোয়ান্টামে গিরিশান নামে একটি আবাসনে থাকলাম। এরপরের দিন আমার পরীক্ষা। পরদিন সকালের খাবার খেয়ে স্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলাম।

আমার মধ্যে তখন একদিকে উৎসাহ আরেক দিকে ভয় কাজ করছিল যে, পরীক্ষায় টিকতে না পারলে থাকতে পারব না। পরীক্ষা শুরু হলো। পরীক্ষার সময় ছিল একঘণ্টা। আমার লেখার প্রতি এত মনোযোগ ছিল যে, বুঝতেই পারি নি কখন একঘণ্টা সময় চলে গেল। পরীক্ষা দিয়ে ফিরে গেলাম। কয়েকদিন পর জানা গেল আমি ভর্তির সুযোগ পেয়েছি।

ভর্তি হতে এলাম, কাগজপত্র জমা দিলাম এবং মেডিকেল টেস্ট করা হলো। ভর্তির কার্যক্রম শেষে আমার বাবাকে বলা হলো যে, যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছু নিয়ে চলে যান। কোনোকিছু রাখা যাবে না। আমি মনে করেছিলাম ফ্রি বলতে শুধু খাওয়াদাওয়া। কিন্তু সকল সুযোগ-সুবিধা যে এখানে পাব এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

হাতখরচ যা এনেছিলাম সব বাবাকে ফেরত দিলাম। ঐদিন চাঁদের আলোয় আমরা হেঁটে হিকমান ক্যাম্পাসে চলে গেলাম। আমার সাথে আরো অনেকে ছিল। হিকমান ক্যাম্পাসে একরাত থাকার পর সকালে আমাদের নতুন কাপড় দেয়া হয়। পুরাতন কাপড়গুলো আলাদা একটা জায়গায় রাখা হলো। আমি বুঝতে পারলাম, কাপড়চোপড় সবকিছু কলেজ থেকে দিচ্ছে। চিন্তা

করলাম এটা কীভাবে সম্ভব! একজন কোয়ান্টাকে এতকিছু দেয়া হয়, আমি বার বার অবাক হচ্ছিলাম এবং স্বপ্নের মতো লাগছিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনতে পেলাম ড্রামের আওয়াজ, দেখি কোয়ান্টারা খেলাধুলা করছে। এত সুন্দর দৃশ্য আগে কখনো দেখি নি। একদিকে সবাই হাসিখুশিতে খেলাধুলা করছে, অন্যদিকে ড্রামের এত সুন্দর সুর আমার মনকে আরো উৎফুল্ল করল। ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আমার ছিল না। কিন্তু ভোরে ব্যান্ডের মধুর আওয়াজ ও খেলাধুলার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায়।

প্রথমে ভাবতাম দিনটা কীভাবে কাটবে? পরে দেখলাম দিনটা কীভাবে কেটে গেল টের পেলাম না! আমাকে বিজ্ঞান ক্লাব ইভেন্টে দেয়া হলো। বিজ্ঞান ক্লাবে যোগ দেয়ার পর ভাবলাম, আমি যেহেতু বিজ্ঞান বিভাগে আছি ভালোমতো বিজ্ঞানচর্চা করতে পারব।

সিনিয়র কোয়ান্টাদের শারীরিক পরিশ্রম দেখে আমার অবাক লাগল। তাদের শারীরিক ফিটনেস ভালো, অনেক দৌড়াতে পারে, শারীরিক গঠন ভালো, সক্ষমতা অনেক। আমি ভাবলাম আমারও ফিটনেস বাড়ানো উচিত। তারপর আমি ঠিক করলাম খো খো খেলায় যাব। খো খো-তে যাওয়ার আগে আমাকে অনেকে বলল, আরে যাস না ওটা মারাত্মক খেলা! হাতে পায়ে ব্যথা পাবি। আমি চিন্তা করলাম ব্যথা পেলে পাব। খেলাধুলাতে গেলে আরো সবার সাথে পরিচিত হওয়া যায়। খো খো খেলায় ডাইভ দেয়ার পদ্ধতিটা আমার খুব ভালো লাগে। বাঘ যেমন লাফ দিয়ে হরিণকে ধরে ঠিক তেমনি। পরে আমি খো খো খেলার সাথে যুক্ত হলাম। প্রথমদিকে খেলাধুলায় আমি পিছিয়ে থাকলেও পরে তাদের সাথে মিশে গেলাম। কেউ কেউ বলে অনেক কষ্ট, আমাকে জিজ্ঞেস করে—এখন কেমন লাগে? আমি বলতাম ভালো লাগে। প্রায় সময় ডাইভ দিলে চামড়া ছিলে যেত। খেলতে খেলতে পুরাতন কোয়ান্টাদের সাথে মিশে গেলাম। বর্তমানে ফিকরান ক্যাম্পাস হ্যান্ডবল মাঠের দিকে ফিটনেস ট্রেনিং করার জায়গা ছিল, শুক্রবারে যখনি সময় পেতাম সেখানে আমরা একসাথে ব্যায়াম করতাম। এভাবে একজন আরেকজনের সাথে আমাদের পরিচয় হতো। বন্ধুত্ব হতো।

বাড়িতে গেলে জিজ্ঞেস করত খাবার কী কী দেয়া হয়? বলতাম, প্রতিদিন সকালে ডিম দেয়। তারা শুনে অবাক—প্রতিদিন সকালে ডিম! বাড়িতে আসলে ঐভাবে খাওয়া হয় না। আরো বললাম সপ্তাহে দুইবার মাছ, দুইবার মাংস দেয়া হয়। শুনে আরো অবাক! এত সুযোগ-সুবিধা। এলাকায় অনেকের কোয়ান্টামের

প্রতি নেগেটিভ ধারণা ছিল। যেমন আমাদের ধর্মান্তরিত করে ফেলা হবে। আমি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, স্কুলটি আসলে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের ছাত্রদের নয়, এটা সবার জন্যে।

একসময় এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়। শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি। এসময় আমাদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেয়া হলো। বড় ভাইয়েরা আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিষয়ে টিকে গেলাম। বর্তমানে আমি এখানেই অধ্যয়নরত আছি। এই প্রতিষ্ঠান না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া তো দূরের কথা, স্বপ্ন দেখার সুযোগও হতো না।

এখানে আসার আগে বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটা আমার ছিল না বললেই চলে, শুধু খাতার প্রচ্ছদে দেখতাম ইউনিভার্সিটি লেখা। আমি বিশ্ববিদ্যালয় মানে মনে করতাম বিদেশের কোনো একটা প্রতিষ্ঠান। ওখানে যেতে হলে কত কী যে করতে হয়, এই ভেবে আর কিছু জানার আগ্রহ ছিল না।

বুদ্ধের একটি বাণী—মানুষের যেহেতু জন্ম আছে এবং জন্ম হলে মৃত্যু হবে। আমি তা-ই মনে করি, আমি জন্ম নিয়েছি মৃত্যুবরণের জন্যে। এখন আমার যা আছে তা-ই নিয়ে চেষ্টা করাটা হচ্ছে আমার লক্ষ্য। আমি বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে চাই। অতীত, ভবিষ্যতকে নিয়ে বেঁচে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যেহেতু আমার সাবজেক্ট রসায়ন। আমার তীব্র ইচ্ছা রসায়ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত হয়ে বিজ্ঞানী হবো। □

এখানে আসার আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই শুনি নি

মো. ওমর ফারুক রনি
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

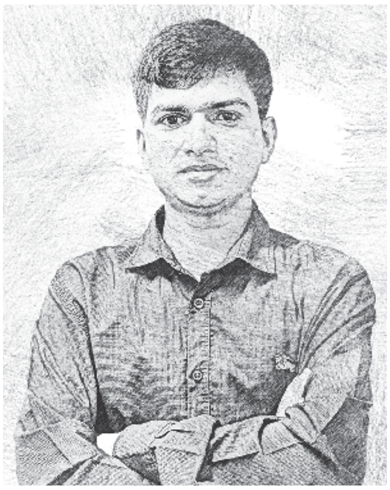

মা-বাবার বড় সন্তান আমি। আমার আরো তিন বোন আছে। বাবা দিনমজুর হিসেবে ঘর বানানোর কাজ করেন। দাদা-দাদিসহ আমাদের সবাইকে নিয়ে তার একার পক্ষে সংসার চালানোটা ছিল বেশ কষ্টকর। পড়ালেখা করা ছিল আমাদের জন্যে একটা বিলাসিতা। তারপরও অনেক সংগ্রাম করে পরিবার আমার পড়ালেখার খরচ চালিয়ে গেছে।

অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমি প্রাইমারি স্কুলে ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। পঞ্চম শ্রেণিতে ৪.৮৩ পেয়ে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পাই। কিন্তু হাই স্কুলে উঠে পড়াশোনা আর ভালো লাগত না। মা স্কুলে যেতে বললে আমি ধানক্ষেতে দৌড়ে পালাতাম। অনেক সময় মা পেছনে পেছনে দৌড়াত। অষ্টম শ্রেণিতে এলাকার একজন ম্যাডাম আমাকে পড়াশোনাতে সাহায্য করতেন।

মনে আছে, একবার তিনি চার-পাঁচ দিন চেষ্টা করেও আমাকে Past Indefinite Tense শেখাতে পারেন নি। স্বাভাবিকভাবে তিনি বিরক্ত হতেন। সে-সময় পড়ালেখার প্রতি আমি এতটাই অমনোযোগী ছিলাম! এছাড়াও ভালো পরামর্শ দেয়ার মতো কোনো লোক আমাদের এলাকায় ছিল না। জেএসসি পরীক্ষায় পেলাম ২.৯৪। এভাবেই টেনেটুনে আমি নবম শ্রেণি পর্যন্ত স্থানীয় একটি স্কুল লামা মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছি। গণিত এবং ইংরেজিতে ফেল করাই ছিল আমার জন্যে তখন স্বাভাবিক ঘটনা।

২০১৬ সালে দশম শ্রেণিতে উঠলাম। একদিন আমাদের একজন শিক্ষক জানালেন, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল নামে একটি স্কুল আছে। সেখানে প্রথম মানবিক বিভাগ চালু হয়েছে। মানবিক বিভাগে নতুন ছাত্র নেয়া হবে। আমি চাইলে আমার রেজিস্ট্রেশন ট্রান্সফার করে সেখানে যেতে পারি। স্যার আমাকে এই স্কুলের কথা বলেছিলেন। কারণ স্যার ভালো করেই জানতেন আমার পরিবারের পক্ষে আমার লেখাপড়ার খরচ চালানো কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। আমার মা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে কোয়ান্টামের আবাসিক স্কুলেই দেবেন।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে দশম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। নতুন এই পরিবেশে এসে বুঝতে পারলাম আমার পড়াশোনার অবস্থা কী! একজন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র যা জানে আমি তা-ও জানি না। উদাহরণস্বরূপ আলুর ইংরেজি পটেটো, এটাও আমি জানতাম না!

নবম শ্রেণি পর্যন্ত জানতাম স্কুলের পর সর্বোচ্চ কলেজে পড়া যায়, এর বেশি না। বিশ্ববিদ্যালয় বলে যে কিছু একটা আছে তা-ই জানতাম না। আমার বাড়ি বান্দরবানের লামা উপজেলার রাজবাড়ি গ্রামে। কসমো স্কুলে এসে দেখলাম, জুনিয়র ভাইয়েরা ও সমবয়সী কোয়ান্টারা ভার্সিটি ভার্সিটি বলত। অথচ আমি কখনো ঢাকা ইউনিভার্সিটির নামই শুনি নি। লজ্জার কারণে কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতাম না।

কয়েকমাস পর সহপাঠীদের সাথে একটু একটু করে মিশতে শুরু করলাম। তাদের কাছে জানতে পারলাম অনার্স ও ডিগ্রির পার্থক্য। ওরা আমাকে জানাল, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্সের জন্যে পড়া হয়। আর ডিগ্রি হলো বিজ্ঞান/ মানবিক/ বাণিজ্য বিষয়ের কিছু সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করা। তখন ভেবেছিলাম কম সাবজেক্টের চেয়ে বেশি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করা আরো ভালো। তাই ডিগ্রিতে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কতটা অবুঝ ছিলাম আমি! পরে বুঝতে পারলাম ডিগ্রিতে পড়ার থেকে অনার্সে পড়াটা বেশি কাঙ্ক্ষিত।

কসমো স্কুলের পরিবেশটাই এমন ছিল যে, আমি ইতিবাচক হয়ে উঠলাম। আমার মাঝে আরো পরিবর্তন চলে আসে যখন আমাকে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করানো হলো। কোর্সের একটি গল্প মনে দাগ কাটল। ভেড়া ও বাঘের গল্প। এই গল্পের শিক্ষা হলো নিজের পরিচয়কে স্পষ্ট করা। 'আমি কে' এই বোধ জন্ম নেয় এই গল্পের মাধ্যমে। সেদিন প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম, আমিও পারব। স্কুলে ফিরে সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার আমি মন দিয়ে পড়ব।

কষ্ট হচ্ছিল। কারণ আমার লেখাপড়ার বেসিক খুব দুর্বল ছিল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম, আমাকে পারতেই হবে। একটি প্রত্যয়ন বাক্য আমাকে আলোড়িত করত–'কর্ম ছাড়া প্রার্থনা কবুল হয় না'।

এসএসসি-তে আমি পেলাম ৪.৫০। রেজাল্ট দেয়ার পরে ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ঐ ম্যাডামের সাথে দেখা করলাম, যিনি আমাকে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনায় সাহায্য করতেন। তিনি আমার রেজাল্ট শুনে বললেন, একজন মানবিক বিভাগের ছাত্রের জন্যে এটা অনেক ভালো রেজাল্ট। এবার আমি কলেজে এবং তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছার কথা ম্যাডামকে জানালাম। বললেন, ভেবেচিন্তে বলছ তো! ওখানে কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। তিনি পরামর্শ দিলেন, চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে কোথাও ভর্তি হয়ে যেতে। আমি বললাম, আমি বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ব। বিশ্বাস থাকলে হবে। কারণ বিশ্বাস কী জিনিস কোয়ান্টামে এসে আমি তা জানতে পেরেছি। ম্যাডামকে বললাম, আমি চেষ্টা করছি, আপনি আমার জন্যে দোয়া করেন।

এরপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। পড়াশোনার বিষয়ে কলেজের আসাদ স্যার আমাদের অনেক সাহায্য করতেন, যার কথা না বললেই নয়!

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে কাটানো সময়গুলো আমার জীবনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল। শিক্ষকদের কাছে আমি সুন্দর ব্যবহার শিখেছি। তারা আমাদের সবাইকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন। ভোরের পাখি ডাকার আগেই তারা ঘুম থেকে উঠে আমাদের জাগাতেন। কোয়ান্টামে ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই সবাইকে আগে সালাম দেয়। প্রতিটি কাজের এখানে জবাবদিহিতা আছে। স্যারেরা যা নির্দেশ দেন তা নিজেরা আগে পালন করেন। কোনো সমস্যা হলে আমাদের সাথে তারা পরামর্শ করতেন।

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলাম, যা বাংলাদেশের অনেক তরুণের স্বপ্ন! আমার চান্স পাওয়ার কারণটা আমি জানি। আমার

যোগ্যতা যা-ই থাকুক না কেন, আমার ভেতরের ইচ্ছাশক্তি ছিল যে, আমাকে যে করেই হোক চান্স পেতেই হবে।

এখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগে অনার্সে পড়ছি। যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির রেজাল্ট পেলাম সেদিন আমি কোয়ান্টামে ছিলাম। বাসায় ফোন করে আমার রোল নম্বর জানতে চাইলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেখে আমার মা রোল নম্বর বললেন। মিলিয়ে দেখলাম আমি চান্স পেয়েছি। যদিও আমার আত্মবিশ্বাস ছিল আমি চান্স পাবই। তবুও বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, আমার মা রোল নম্বর বলতে ভুল করেছেন। তাই বার বার আমি মিলিয়ে দেখছিলাম যে, ঠিক আছে কিনা।

বাসায় গিয়ে দেখি আত্মীয়স্বজন আর পাড়া-প্রতিবেশী দিয়ে বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে। মা-বাবা যে কী খুশি হয়েছিলেন সেদিন, বলে বোঝানো যাবে না। বাবার আর্থিক সামর্থ্য বেশি না থাকায় সেদিন ধার করে আনলেন ২৭ কেজি মিষ্টি! এনে গ্রামের মানুষদের বিলিয়ে দিলেন। বাবার সেদিনের আনন্দ দেখে আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নি। এগুলো এখন স্বপ্নীল এক অতীত।

আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা রয়েছে। সেবামূলক কাজেই নিজেকে জড়িত রাখতে চাই। নিরেট চাকরিজীবী হয়ে জীবনযাপনের ইচ্ছে আমার নেই। তাই একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার চেষ্টায় আছি, যে মানুষটি হবে অন্যের কল্যাণে নিবেদিত। □

গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে চাই

উসাইথিং মার্মা

গণিত বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

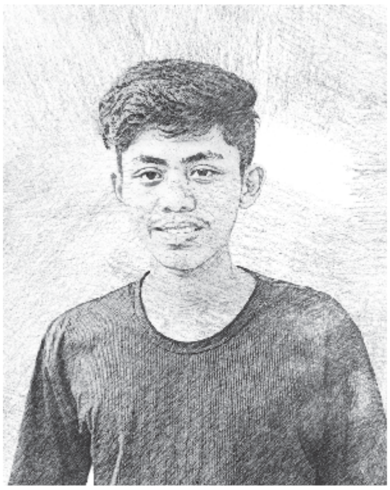

গল্পটা কয়েক বছর আগের, আমার জন্ম বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলের গজালিয়ার ছোট্ট একটি গ্রাম বড় পাড়ায়। আমাদের গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। হাই স্কুল দূরে হওয়ায় এলাকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে প্রাইমারি শেষ হলে আর পড়তে চাইত না। তাদের পড়াশোনা প্রাইমারি স্কুল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

পরিবারে আমরা চার সদস্য। মা-বাবা, আমি এবং ছোট বোন। আমার বাবার একটা ছোটখাটো মুদির দোকান ছিল। আমাদের সংসার বাবার উপার্জনের জন্যে ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু বিপত্তি এলো যখন চালের ব্যবসায় বাবা নামলেন। তিনি খুব সরল মানুষ হওয়ায় যাদের থেকে চাল বা ধান কিনতেন তারা টাকা নিয়ে ঠিকমতো ধান দিত না। তারপরও তিনি কোনো প্রতিবাদ করতে পারতেন না। তবে এইদিকে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সওদাগররা বাবাকে ধরলেন। সব দায় পড়ল বাবার ওপর। ঐ সময়েই আমার নানি অসুস্থ ছিলেন প্রায় এগারো মাসের মতো। সে-সময় নানা-নানি আমাদের

সাথে থাকতেন। তাই সব খরচ গিয়ে পড়ে আমার মা-বাবার ওপর। এসময় বাবা কিছু ঋণ করে ফেলেন। সেই ঋণের টাকা আজও বাবা শোধ করতে পারেন নি। আসলেই ঋণ সবসময়ের জন্যে ক্ষতিকর। আর এই গল্পটা বলার কারণ হলো, আমাদের গ্রামীণ সমাজে ঋণ যে কীভাবে পরিবারগুলোকে ঘুণপোকার মতো খেয়ে ফেলে তা জানানোর জন্যে।

বলা যায় আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি আমার নানা-নানির কাছে। কিন্তু ক্লাস ফাইভে যখন উঠি, নানি মারা যান। নানা আমাকে তখন লামা পৌরসভার সবচেয়ে ভালো প্রাইমারি স্কুলে (নুনারবিল সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে) ভর্তি করিয়ে দেন। এছাড়াও আমি কয়েক বছর বান্দরবান বৌদ্ধ অনাথালয়ে ছিলাম। এরপর লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। নিজের ইচ্ছায় এবং পরিবারের সহযোগিতায় এসএসসি পর্যন্ত নিজ গ্রামেই পড়ালেখা কোনোরকম চালিয়ে গেছি।

তারপর অর্থের অভাবে আমার পড়ালেখা বন্ধ হতে বসেছিল। বাবার হাতেও তখন তেমন অর্থ নেই। আমার বন্ধু পাসিং ম্রো, সে একজন কোয়ান্টা, বর্তমানে সে ঢাকা কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তার কাছ থেকেই প্রথম কসমো কলেজের কথা শুনি। নিজের ইচ্ছায় তখন কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হই।

পড়ালেখা করে বড় কিছু করার ইচ্ছা আমার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তার জন্যে যে দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন সেটা কেউ বলে দেয় নি। আমার ধারণা ছিল যে কসমো কলেজ শুধু থাকা-খাওয়া এবং পড়াশোনার খরচ বহন করবে। ভর্তি হওয়ার পর দেখলাম শুধু আর্থিক খরচ নয়, সফল হওয়ার জন্যে যত দিক-নির্দেশনা প্রয়োজন সবকিছুই কলেজ দিচ্ছে।

সেখানে থাকা অবস্থায় কিছু বিষয়ে খুব আনন্দ করতাম। ঈদ এবং পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হতো, সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে টোকেন দেয়া হতো। ক্লাসের সবার টোকেন আমরা জড়ো করতাম। ঈদের দিন ক্যাম্পাসে মেলা বসত, সেই মেলায় টোকেন দিয়ে বিভিন্ন খাবার কিনে সবাই মিলে একসাথে খেতাম। আনন্দটাই অন্যরকম হতো। এভাবেই হাসি-আনন্দ, নিয়মকানুন এবং রুটিনের মধ্য দিয়ে প্রায় দুবছর কেটে গেল।

এইচএসসি দিলাম। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সময় চলে এলো। আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে থেকেই ভর্তির প্রস্তুতি নিলাম। দিনরাত এক করে পড়ালেখায় ডুবে ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা

দিয়েছিলাম। দুটোতেই অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকলাম। কিন্তু আমি সাহস হারাই নি। তারপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলাম। গণিত সাবজেক্ট চলে এলো।

আমি এত দূর আসতে পারতাম না যদি কসমো কলেজ আমার পাশে না দাঁড়াত। বাইরে সায়েন্সে পড়া অনেক খরচের ব্যাপার। কিন্তু এখানে সেটা আমি বিনামূল্যে পেয়েছি। তাছাড়া আসাদ স্যার, নূর আলম স্যার, সুজন স্যার, শ্যামল স্যার—তারা যেভাবে আদর যত্ন দিয়ে পড়াতেন, আমার মনে হয় না শুধু টাকা দিয়ে সেই পড়াগুলো কারো কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব। আর এখান থেকে যে নৈতিক শিক্ষা পেয়েছি তা আমার ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে, এখনো করছে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সময়ানুবর্তিতা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। আসলে আমাদের দেশ ও জাতির জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হলো সময়-সচেতনতা ও পরিশ্রম। এই দুইটা বিষয় আমি এখান থেকেই শিখেছি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সময়কে যে কীভাবে গুরুত্ব দেয়, সেটা আমরা বুঝতে পারি যখন ফাউন্ডেশনের আত্ম উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ নিই। এখানে সময় মানে সময়। আগেও না, পরেও না।

আমাদের মার্মা সম্প্রদায় শিক্ষায় এখনো পিছিয়ে আছে। তাদের শিক্ষিত করার জন্যে আমি আমার গ্রামে একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যেখানে পাড়ার শিশুরা বই পড়বে, জ্ঞান অর্জন করবে। পৃথিবীর আশ্চর্য বিষয়গুলো সম্পর্কে আগ্রহী হবে। আর বিজ্ঞান-গণিতের জটিল জটিল সমস্যাগুলো সমাধানে মাথা ঘামাবে।

লাইব্রেরি তৈরির ইচ্ছেটা হয়েছে আলোকিত মানুষ গড়ার কারিগর অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচি থেকে। আমি ক্লাস নাইনে থাকতে সেখানকার সদস্য হয়েছিলাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু সেখান থেকে বই নিয়ে পড়তাম এবং বই পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে ডা. লুৎফর রহমানের মানসিক উৎকর্ষধর্মী গ্রন্থ *উন্নত জীবন* বইটি পড়ে।

ভবিষ্যতে নিজ এলাকায় লাইব্রেরি দেয়ার চিন্তাটা গভীরভাবে কাজ করেছে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে এসে। এখানে এসে দেখলাম কোয়ান্টারা ছোট থেকে বড় সবাই ছুটির দিনে বই নিয়ে ডুবে থাকে। এখানকার লাইব্রেরির নাম হলো—অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পাঠাগার। কোয়ান্টাদের চিন্তাভাবনা বাইরের জগতের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের থেকে আলাদা। আর সেটা যে

বইপড়ার অভ্যাসের কারণে তা বুঝতে আমার সময় লাগে নি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, জীবনে তিনটা জিনিস প্রয়োজন—বই, বই আর বই।

কোয়ান্টা ফুংলিয়ান কাপ বম আমার খুব কাছের বন্ধু। আমাকে বই পড়ার জন্যে উৎসাহিত করত। সে অনেক গল্পের বই পড়ত। বিশেষ করে ফেলুদা সিরিজ, তিন গোয়েন্দা এবং শার্লক হোমস। আমি যখন কোয়ান্টাদের মুখে কোনো গল্পের চরিত্রের নাম শুনতাম সেটা সম্পর্কে আমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম আর ও আমাকে পুরো গল্প সাবলীলভাবে শোনাত। মনে হতো আমি বাস্তবে ঘটনাটা দেখছি। এজন্যে আমি ওর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

এই যে একজনের থেকে আরেকজনের কাছে কাহিনী, নতুন ধারণার আদান-প্রদান হয় সেটা একমাত্র বই এবং লাইব্রেরির মাধ্যমেই সম্ভব। আসলে জ্ঞানার্জন নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়।

আমার একটি শখ হলো ভ্রমণ করা। গুরুজী দাদুর বক্তব্যে একবার শুনেছিলাম, 'ট্যুরিস্ট নয় ট্রাভেলার হোন।' কারণ একজন ট্যুরিস্ট সব জায়গায় তার নিজস্ব পরিমণ্ডল নিয়ে যায় এবং বাড়ির সব সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশা করে। তা না পেলে বিরক্ত হয় এবং অন্যের অসুবিধার কারণ হয়। আর একজন ট্রাভেলার বা মুসাফির পারিপার্শ্বিকতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আমি সেই মুসাফির হতে চাই। অজানা জায়গায় যাব এবং সেখান থেকে মানবকল্যাণের জ্ঞান অর্জন করব। □

বিশ্বমানের গ্রাফিক ডিজাইনার হতে চাই

উসেসাইন মার্মা
অ্যাপ্লাইড আর্ট বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বান্দরবানের থানচি উপজেলার নাইক্ষ্যং পাড়ায় আমার বাড়ি। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা শেষ করে আমি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে অ্যাপ্লাইড আর্টে পড়াশোনা করছি। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টি নেই। গ্রাফিক ডিজাইনের মতো চারুকলার কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়ে বিষয়টিকে সাজানো হয়েছে।

বাড়িতে আমার মা-বাবা দুজনই আছেন। তারা জুমচাষ করেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমি সবার বড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি চলাকালে আমার মেজো ভাই বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান। মা-বাবাও চাচ্ছিলেন না যে আমি বাড়ি ফিরে যাই এসময়। আমি আমার ভাইকে শেষ দেখা দেখতে পারি নি। ওর কথা মনে পড়লে আমার ভেতর থেকে কান্না চলে আসে। আর সবচেয়ে ছোট ভাইটি গ্রামের স্কুলে এখন নবম শ্রেণিতে পড়ছে।

আমার খালাতো ভাই উক্যচিং মার্মা ২০০৪ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তারপর আমি ছোটবেলায় ভর্তি হই ২০০৬ সালে।

সে-সময় বাইরে কিছু গুজব ছিল। এখানে ছাত্রদের কাছ থেকে রক্ত নিয়ে জমা করে রাখা হয়। তারপর ছাত্রদেরকে ধর্মান্তরিত করা হয়। ঠিক মতো খাবার দেয়া হয় না। আরো কত কী! কিন্তু আমার বাবা-মা এসব পাত্তা দেন নি।

প্রথমদিকে আমি বাংলা পারতাম না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি খেয়াল করলাম খুব সহজেই বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছি। এখন মার্মা ও বাংলা দুটোই সমান চলে। কসমো স্কুলে থাকা অবস্থায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে নাচ-গান শেখানো হতো। আমি সেগুলোতে অংশ নিতাম। তবে আমি ছবি আঁকা খুব ভালো করে শেখার চেষ্টা করতাম। অন্য সবকিছু থেকে ছবি আঁকতে আমার বেশি ভালো লাগত। এছাড়াও আমি টেবিল টেনিস খুব ভালো খেলতাম।

ছোটবেলা থেকেই বেড়ে ওঠা সেই আবেগের ভূমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজকে খুব মিস করি। এটি আমার জন্যে রত্নভূমি ছিল।

আজ আমার মা-বাবাও আমার ব্যাপারে খুশি যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারছি। যদিও মা-বাবা এত কিছু বোঝেন না। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার এসব শুনে এসেছেন। এখন জেনেছেন যে, আমি চারুকলায় পড়ছি। তারা এখন জানতে শুরু করেছেন, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও চিত্রশিল্পী হওয়া যায়। আমার স্বপ্ন আমি একজন ভালো ও বিশ্বমানের গ্রাফিক ডিজাইনার হবো।

আমি আমার এলাকার জুনিয়রদের বলি, তোমরা এমন কিছু করো, যেটা তোমাদের নিজেদের, পরিবার এবং এলাকার অর্থাৎ সবকিছুকে আরো উন্নত করবে। আমাদের পাড়া থেকে ১৯৯০ বা ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পড়েছিল। তারপর আমি এখন পড়ছি। এরপর তোমরাও পড়বে। আমরা একসাথে এই এলাকার উন্নয়ন করব। আমি বিশ্বাস করি আমরা পারব। □

মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা হীনম্মন্যতা মানুষকে পিছিয়ে দেয়

আবিদ রহমান জেনীথ
শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্লাস সিক্সে পড়া অবস্থায় আমার হাতে একটি পকেট ডিকশনারি আসে। আমাদের হোস্টেলের বড় ভাইদের কারো হবে সেটা। ডিকশনারি পেয়ে আমি প্রথমেই আমার নামের অর্থ খুঁজলাম। জেনীথ-এর অর্থ সেদিন প্রথম জানলাম—আকাশের মাঝে সবচেয়ে উঁচু বিন্দু। এর আগেও বহুবার মায়ের কাছে এর অর্থ জানতে চেয়েছি। কিন্তু পরিষ্কার কোনো উত্তর পাই নি। সেদিন নামের অর্থ জানার পর আমি বেশ অনুপ্রাণিত হই। কিশোর বয়সের ঐ অনুভূতি আমাকে এখনো নাড়া দেয়। তাগিদ অনুভব করি যে, আমাকে ভালো কিছু করতে হবে।

১২ বছর ধরে (২০০৮-২০১৯) আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করেছি। সেই শিশুবয়সে এখানে এসেছিলাম। জীবনের বড় ও মধুর

একটা সময় আমি এখানেই পার করেছি। নানা আনন্দ-বেদনা জড়িয়ে আছে এর সাথে।

আমাকে দেখতে একটু চুপচাপ ধরনের মনে হয়। তবে পরিচিত পরিমণ্ডলে আমি হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করি। বন্ধুদের হাসাই। মজার একটা ঘটনা বলি। আমার দোষ বা গুণ দুটোই বলতে পারেন, আমি যে-কারো কণ্ঠ নকল করতে পারি। স্যার, ম্যাডাম, ব্রাদারদের কণ্ঠ নকল করে বন্ধুদের মজা দেখাতাম। বন্ধুরা আমার কাণ্ড দেখে হো-হো করে হাসত।

আমরা যে আবাসনে থাকতাম সেখানে ২০০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা ছিল। তিন তলাবিশিষ্ট খাট আমাদের। আমি মাঝের তলায় থাকতাম। যখন আবাসনে রাতে ঘুমানোর জন্যে ব্রাদার বাতি নিভিয়ে বেরিয়ে যেতেন, আমি চুপিসারে আমার বিছানা থেকে নামতাম। তারপর সেই ব্রাদারের মতো করে হাঁটতাম আর তার কণ্ঠ নকল করে বলতাম—অ্যাই সবাই ঘুমিয়ে যাও! বেশি দেরি করো না। ভোরে উঠতে হবে।

জুনিয়র-সিনিয়ররা রাতে আমার এই কাণ্ড বেশ উপভোগ করত। রাতে তো আর শব্দ করে হাসা যায় না। মিট মিট করে সবাই হাসত। আরো কত আনন্দ হাসির ঘটনা আছে। তবে শিক্ষক ও যত্নায়ন কর্মীদের আমি সম্মান করতাম। যদি মনের ভুলে কখনো তাদের সাথে বেয়াদবি করে ফেলি তাহলে তাদের কাছে এই অনুভূতি লেখার মাধ্যমে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এছাড়াও আমার গল্পের বইয়ের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। এখনো আছে। বিশেষ করে গোয়েন্দা সিরিজ পড়তে ভালো লাগে। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা আমার সবচেয়ে পছন্দ। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে আমি নিয়মিত বই নিয়ে পড়তাম। শার্লক হোমস পড়েছি বহুবার। এই বইগুলো পড়ার সময় নিজেকে আমি গল্পের নায়কের সাথে তুলনা করতাম। আর তাদের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। কী আনন্দের না ছিল সময়গুলো!

ছোটবেলা থেকে আমি ছবি আঁকতে পছন্দ করতাম। দশম শ্রেণিতে সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা নিয়ে পড়ব। চারুকলায় অ্যাডমিশনের জন্যে যা যা পড়া লাগে তার খোঁজ করতে লাগলাম। ইন্টারনেট ব্যবহার করে খণ্ড খণ্ড তথ্য বের করে নিজের নোট নিজেই করতাম। বড় ভাইদেরও সাহায্য নিতাম।

এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। তারপর কলেজ শুরু হলো। একসময় এইচএসসি পরীক্ষা চলে এলো। কিন্তু সে-সময় সারাদেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। তাই জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট অনুযায়ী এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়া হলো। আমার জেএসসি রেজাল্ট ভালো ছিল। কিন্তু এসএসসি-র তেমন ভালো না।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতির পালা। করোনার কারণে আমরা বাইরে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আসলে একজন কোয়ান্টার পক্ষে হঠাৎ করে বাইরের জীবনের সাথে তাল মেলানোটা সহজ নয়। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হলো। কী পড়ব না পড়ব কোনো গাইডলাইন পাচ্ছিলাম না। তারপর আবার স্মার্টফোন নামক ভার্চুয়াল ভাইরাস তো আছেই। আসলে বাহিরের জীবনটা অনেক কঠিন। তবুও একটা বিশ্বাস নিয়ে লেগে থাকলাম। শুরু হলো আমার জীবনের সংগ্রামী সময়। কিন্তু এসময়ও আমাকে সাহায্য করল কোয়ান্টা জীবনের শিক্ষা।

বিশ্বাস ছিল আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতেই হবে। তাই চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। অটোসাজেশন চর্চা করতাম নিয়মিত। আর মেডিটেশন করতাম। আমার প্রিয় মেডিটেশন হলো 'হও উন্নত শির'। এটি মূলত হীনম্মন্যতা দূর করার জন্যে। প্রতিটি মানুষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন রকমের হীনম্মন্যতা তাকে পিছিয়ে দেয়। তাই সুযোগ পেলেই আমি এই মেডিটেশন করি।

সে-বছর ৯ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হলো। আম্মুকে জানালাম যে, পরীক্ষা ভালো হয়েছে। অপেক্ষা করছিলাম রেজাল্টের জন্যে। নভেম্বরের ১৪ তারিখে রেজাল্ট দেখলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! চারুকলায় আমি চান্স পেয়েছি।

কিন্তু আরেক সমস্যা দেখা দিল। প্রচলিত আছে চারুকলার ছাত্ররা বেপরোয়া হয়, পড়াশোনা কম করে! মানুষের মুখ থেকে এই কথা শুনে আমার আম্মু আমাকে এসে এসব বলেন। আমি বিশ্বাস করি, ভালো খারাপটা সবসময় নিজের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্ট দিয়ে ভালো খারাপ নির্বাচন করা যায় না। যা-হোক এখন আমার নতুন এক জীবন শুরু। পেছনে যা হয়েছে তাকে অতীতের গল্প বানিয়ে ভবিষ্যতের গল্পটাকে আরো সমৃদ্ধ করতে চাই। আরো যোগ্য হতে চাই।

অতীতের আরেকটি গল্প বলে আমার কথা এখানে শেষ করতে চাই। এটি আমার জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের রুটিনগুলো আমার

ভালো লাগত। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে যার যার ইভেন্টে অর্থাৎ খেলাধুলায় চলে যেতাম। তারপর ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া। এরপর স্কুল-কলেজের পড়া। দুপুরের খাবার। তারপর আবার খেলাধুলা। সন্ধ্যার পর রিক্রিয়েশন ক্লাস। সবকিছুই একটা নিয়ম অনুযায়ী চলত।

আমার ইভেন্ট ছিল প্রথমে ভলিবল। কিন্তু ব্যান্ড প্রদর্শনী আমার পছন্দ ছিল। আমি গর্ব করে বলতে চাই, আমাদের স্কুলের প্যারেড ও ব্যান্ড টিম টানা পাঁচ বছর ধরে ঢাকায় গিয়ে জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজে প্রথম হয়েছে।

স্বপ্ন দেখতাম আমাদের দলের আমি ব্যান্ড প্রধান হবো। কারণ ব্যান্ড প্রধান হাতে স্টিক নিয়ে নানা ভঙ্গি করে—এটা আমার খুব ভালো লাগত। আমিও লাঠি হাতে নিয়ে ওরকম করতাম পাশের জঙ্গলে গিয়ে, কেউ যেন না দেখে। বন্ধু আরমানকে সাথে নিতাম। ওকে দুষ্টুমির ছলে বলতাম, দেখিস আমি একদিন ব্যান্ড মেজর হবো! ও তখন হো-হো করে হাসত।

দশম শ্রেণিতে আমি ব্যান্ড টিমে যোগ দিলাম। প্রথমে আমি একজন স্রেফ ড্রামার ছিলাম। মন দিয়ে ড্রাম বাজাতাম। যার কারণে ২৬ মার্চের ঐ বর্ণাঢ্য আয়োজনে পাঁচ বার ঢাকায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।

২০১৯ সালের ২৬ মার্চ ছিল আমার জন্যে স্মরণীয় দিন। সেবার আমি ছিলাম ১৫০ সদস্য বিশিষ্ট ব্যান্ড টিমের প্রধান। প্রতিদিন দুইবেলা মেজর স্টিক হাতে নিয়ে অনুশীলন করতাম। হাতে ও পায়ে ফোসকা পড়েছে কত! হাতের

কব্জির ব্যথা ছিল নিত্যসঙ্গী। আর প্রোগ্রামের তিন মাস আগে ক্যাম্পের সময়টা ছিল আরো কঠিন। খাওয়া ও ঘুমের সময়টা বাদে সারাদিন অনুশীলন। এত অনুশীলন, এত ঘাম এই সব কষ্টের অবসান ঘটেছিল সেই দিন। আমার হাতে মেজর স্টিক এবং আমার দলে ছিল ১৬ জন ক্লারিনেট, ৩২ জন ট্রাম্পেট, ৪০ জন ড্রামার, ৮ জন সেক্সোফোন, ৮ জন ইউফোনিয়াম, রাইফেলবাহী ১৬ জন, পতাকাবাহী ১৬ জন, ড্রাম মেজর ৮ জন। তাদের নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আগত হাজার হাজার দর্শকের সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সবাই হাততালি দিচ্ছিল। ঐ মুহূর্তে আমার ভেতরে কেমন যেন একটা অনুভূতি বয়ে যাচ্ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না।

আরো রোমাঞ্চকর অনুভূতি ছিল মন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার নেয়ার সময়টা। মঞ্চে যখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের নামের সাথে আমার নাম ঘোষণা করল সেটা আমার জন্যে ছিল এক আনন্দঘন দম বন্ধ করা মুহূর্ত। □

বৌদ্ধ বিহার থেকে কসমো স্কুল, তারপর মেডিকেল কলেজ

উজ্জ্বল কান্তি চাকমা
এমবিবিএস শিক্ষার্থী, রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ

আমার বাড়ি রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলার বালিশ পাড়া গ্রামে। আমরা সাত ভাইবোন। আর আমি তাদের মধ্যে ষষ্ঠ। মা-বাবার বয়স হয়েছে। ভগবানের কৃপায় তারা এখনো আছেন। ছোটবেলায় আমি জুরাছড়ির একটা বিহারে লেখাপড়া করতাম। আমার পারিবারিক অবস্থা ভালো না বলেই বিহারে ভান্তেদের সেবাযত্ন করে আমার থাকা-খাওয়া ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা হতো। সেখানকার একটি প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ি।

একদিন আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক স্যার ডেকে বললেন, তুমি কোয়ান্টামে চলে যাও। তোমার কোনো খরচ দেয়া লাগবে না। ভালোমতো পড়ালেখা করতে পারবে। ঐখানে পড়ালেখার মান অনেক ভালো।

স্যার কোয়ান্টাম সম্পর্কে জেনেছিলেন সুমন্ত দাদার কাছে। সুমন্ত দাদা রাঙ্গামাটির একজন সাংবাদিক। আমাকে সুমন্ত দাদার সাথে পরিচয় করিয়ে

দেয়া হলো। তিনিই আমাকে কোয়ান্টামে নিয়ে আসেন। প্রথমে গ্রামের স্কুল থেকে আমাকে ছাড়তে চায় নি, ভেবেছিল আমি পড়ালেখা একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি। পরে কোয়ান্টামে ভর্তির শর্তে স্কুল থেকে ছাড় পেয়েছি।

কোয়ান্টামে কী হয় বা সেখানে কী করে কিছুই জানতাম না। আমার একটাই লক্ষ্য ছিল যে, ভালো কিছু করতেই হবে। একটু ভরসা পাচ্ছিলাম। কারণ আমাদের এলাকা থেকে মেধাবী শিক্ষার্থী নিশান চাকমা তখন কোয়ান্টামে অধ্যয়নরত। তারা একটু আপত্তি করলেও আমার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনেক ইচ্ছা ছিল। অচেনা একটা জায়গায় পাঠাতে মা-বাবা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমাকে তো পড়ালেখা করতেই হবে। তাই মা-বাবার সংশয়কে উপেক্ষা করে আমি কোয়ান্টামে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

ভালো কিছু একটা হবে এই বিশ্বাস নিয়ে আমি সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হই কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। প্রথমদিকে একটু খারাপ লাগত। তবে একমাসের মধ্যেই সবার সাথে একটা বন্ধুত্ব করে ফেলি। যে-কোনো বিষয়ে সহপাঠীরা অনেক সাহায্য করত। কিছু না বুঝলে বুঝিয়ে দিত। স্যার-ম্যাডামরা অনেক যত্ন সহকারে পড়াতেন।

এই স্কুলের নিয়মনীতি অনেক। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়ে যেত। অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যেই সবকিছু মানিয়ে নিয়েছিলাম। কিছুদিন পর থেকে ভালো রেজাল্ট হওয়া শুরু হলো। এরপর এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। কলেজে প্রথম বর্ষে আমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি আগ্রহ ছিল। কিন্তু একদিন বায়োলজি স্যার আমাকে অনেক উৎসাহ দিলেন। তারপর থেকে বায়োলজি ভালো লাগতে শুরু করল। তখন থেকেই আমি মেডিকেলের প্রতি একটা টান অনুভব করলাম। মেডিকেলে পড়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম।

আমি কোয়ান্টামে ২০২০ সাল পর্যন্ত ছিলাম। এই সাত বছর নানা আনন্দে অতিবাহিত হয়েছে। এখন মনে হয় সাত বছর খুব দ্রুত চলে গেছে। নির্দিষ্ট একটা রুটিনের মধ্যে ছিলাম বলেই এমন মনে হয়।

বর্তমানে আমি রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজে পড়ছি। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের স্যার-ম্যাডামরা আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে আমাকে যত্ন করে পড়িয়েছেন বলেই আজ আমি নিজেকে একজন মেডিকেলের শিক্ষার্থী বলতে পারছি। অ্যাডমিশনের প্রস্তুতির সময় আমি সিনিয়র কোয়ান্টা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেংঙি ভাইয়ের কাছে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এছাড়াও

লালসেপঠা ভাই এবং রনি ভাই আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমার সহপাঠীরাও সাহায্য করেছে। সবার আশীর্বাদেই আমি আমাদের এলাকা থেকে প্রথম মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছি।

আর মেডিটেশন বরাবরই অনেক উপকারী। আমাদের মধ্যে অনেক রাগ-ক্ষোভ জমে থাকে, যা সবসময় ক্ষতিকর। 'রাগ-ক্ষোভ' মেডিটেশন করে আমি অনেক রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। এই নিয়ন্ত্রণ আমার ক্ষেত্রে অনেক কাজে লেগেছে। 'কল্পনা' মেডিটেশন আমার মনছবি পরিষ্কার করতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সর্বোপরি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমার জীবনে নতুন এক পথ সৃষ্টি করেছে।

আমার স্বপ্ন—বড় হয়ে ভালো কিছু করব। মানুষকে ভালো কিছু উপহার দেবো। প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে দেখা যায়, মানুষ ভালো চিকিৎসা পায় না। এসব ঘটনা আমাকে কষ্ট দেয়। আমি একজন ভালো ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই। কারণ ডাক্তারদেরকে মানুষ ভগবানের পরেই দেখে। □

এই স্কুলই ছিল আমাদের দুই ভাইয়ের একমাত্র ভরসা

ইমরান শাহেদ

মার্কেটিং বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

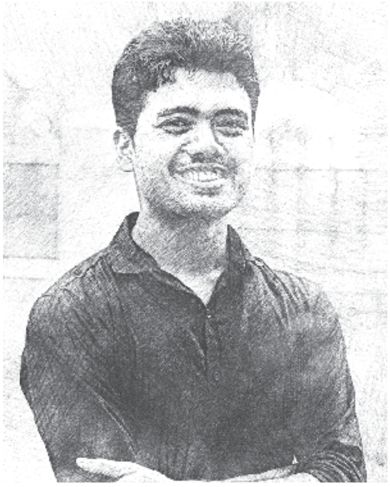

আমাদের গ্রামের নাম কাঞ্চননগর। চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার একটি গ্রাম। আমি গ্রামের স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি। বাবা কৃষিকাজ করতেন। মা-বাবা, বড় বোন আর আমরা দুই ভাই—আমাদের অভাবের জীবনটা সুখ-দুঃখের মধ্যেই কাটছিল।

আমরা দুই ভাই প্রাইমারি স্কুল শেষ করে হাই স্কুলে ওঠার পর বাবার পক্ষে আমাদের খরচ চালানো কষ্টকর হয়ে যায়। কারণ এসময় বাবা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাবার এই অসুস্থতা অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আমাদের সামনে প্রকাশ করতেন না। বাবা ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তার বললেন, বাবার ক্যান্সার হয়েছে। দ্রুত বাবাকে চট্টগ্রামে নেয়া হলো চিকিৎসার জন্যে। চলতে থাকল বিভিন্ন রকম চিকিৎসা। একমাসের মধ্যেই বাবা মারা গেলেন। আসলে বাবার যে ক্যান্সার হয়েছিল আমাদেরকে তা জানানো হয় নি। বাবার ক্যান্সারের কথা আমরা জানলাম বাবার মৃত্যুর পরে।

বাবা থাকা অবস্থায় আসলে তার কদর বুঝি নি। কিন্তু মনে হলো হঠাৎ করে মাথার ওপর থেকে ছায়া চলে গেল। বড় বোন কলেজে আর আমি নবম শ্রেণিতে উঠলাম। আমার ছোট ভাই সপ্তম শ্রেণিতে। আমাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না।

বাবা মারা যাওয়ার পাঁচ মাস পর আমার ছোট আরেকটি ভাই জন্ম নেয়। আমার মা তখন কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না—কীভাবে আমাদের লেখাপড়া করাবেন, সংসার চালাবেন।

যে ডাক্তার আমার বাবার চিকিৎসা করতেন, তিনি পারিবারিকভাবে আমাদের চিনতেন। তিনি আমার দাদুকে বললেন যে, তার একটা পরিচিত স্কুল আছে। ডাক্তার আঙ্কেল আমাদের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে জানতে পারলাম তিনি কোয়ান্টামের সাথে আগে থেকেই জড়িত ছিলেন। আমার দাদু অনুমতি দিলে মামা আমাদের দুই ভাইকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে নিয়ে এলেন।

আমরা দুই ভাই একসাথে ভর্তি হলাম। আমি নবম শ্রেণিতে আর আমার ছোট ভাই সপ্তম শ্রেণিতে। পরবর্তীকালে আমার ছোট ভাইও এখান থেকে পাশ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথমদিকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা আমার জন্যে খুব কষ্টের ছিল।

আমাকে সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে খো খো খেলা দেয়া হয়। এটা খেলতে প্রচুর দম লাগে। আর অনেক দৌড়াতে হয়। কিন্তু আমি পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত ছিলাম না। তারপর এখানে মোবাইল ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। তাই সব মিলিয়ে ভেবেছিলাম, এখান থেকে পালিয়ে যাব। কিন্তু যাব কোথায়? পড়াশোনার এমন পরিবেশ আমাদের কে দেবে?

আগে কখনো এত পরিশ্রমের কোনো খেলা খেলি নি। স্পোর্টসে ক্যাম্পাসের এক বড় ভাই ক্রালুং খুমীর অধীনে ছিলাম। তিনি প্রতিদিন অনেকটা পথ আমাকে দৌড়াতে দিতেন। দৌড়ে এসে তারপর পুশ-আপ, সিট-আপ আরো কত ব্যায়াম! তিন মাস আমার সাথে এসব চলল। বুঝতে পেরেছিলাম, এই স্কুলে যারা ছোট থেকে আছে, তারা কতটা পরিশ্রম করতে শেখে।

আমার চেয়ে ছোট ছেলেরা অনেক বেশি একটিভ ছিল। তিন মাস পর আমাকে বাস্কেটবলে দেয়া হলো। ততদিনে আমি অনেকটাই পরিশ্রমী হয়ে উঠেছি। তারপর পড়াশোনায় দেখলাম এই স্কুলের অন্যরকম শিক্ষাপদ্ধতি।

বাইরের ছাত্ররা সচরাচর মূল বইয়ের চেয়ে গাইড বই নিয়ে মাতামাতি করে। কিন্তু এখানে এমনটা নেই। সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করি, গাইড বই কখন দেবে। তারা বলে এখানে এসব নেই। শুধু মূল বই। এভাবে একসময় এই পরিবেশের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। শুধু এসএসসি-তে পরীক্ষার আগে টেস্ট পেপার পেয়েছিলাম। নবম শ্রেণির প্রথম দিকে প্রধান শিক্ষককে বললাম যে, আমি বিজ্ঞান বিভাগ নেব। তিনি আমাকে বললেন, তুমি মানবিক বা বাণিজ্য শাখায় ভালো করবে। আমি বাণিজ্য শাখায় গেলাম।

একটি মজার কথা বলি। আমি বাড়ি থাকতে ভাবতাম কলেজে পড়েই হয়তো চাকরি করতে হয়। এরপর আর পড়া নেই। আসলে গ্রামে আমাদের এই বিষয়গুলো কে শেখাবে! কিন্তু এখানে এসে দেখলাম বড় ভাইয়েরা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা শেষে কী যেন পড়ে। তখনই প্রথম ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানি। দশম শ্রেণিতে থাকতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। তখন নেয়ামাতানে (ডাইনিং হলে) খাবার সময় শুনতাম, অমুক এই ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে। তখন থেকেই মনে হতো আমাকেও সেখানে পড়তে হবে।

এরপর এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট এলো ৪.৮৯। এরপর কলেজের প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে উঠলাম। করোনা ভাইরাসের জন্যে পরীক্ষা পেছাতে লাগল। সারাদেশে লকডাউন হয়ে গেল। এখন কিছু করার নেই। আমাদের ব্যাচের কেউ ভাবি নি যে, এটাই আমাদের শেষ ছুটি হবে। পরীক্ষা ছাড়াই এইচএসসি রেজাল্ট বের হলো। অটোপাশে আমি জিপিএ ৪.৮৩ পেলাম।

ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে কসমো কলেজের নাইমুর ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু বই নিয়েছিলাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিংয়ে পড়ছেন। তার বইগুলো নিয়ে বাড়িতে পড়তে লাগলাম। বইগুলোর শেষের মডেল টেস্টগুলো চর্চা করেই ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। চান্স পেলাম জগন্নাথ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সুখবর পেয়ে বাসায় সবাই খুশি। কিন্তু রাতে আমার ঘুম আসে না। কীভাবে ভর্তি হবো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে? হাতে টাকা নেই। অভাবের সংসারে মায়ের কাছে টাকা চাইতে লজ্জা লাগল।

যা-হোক, কোনোভাবে ভর্তির টাকা ম্যানেজ হয়ে গেল। ভর্তি হলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ বাবা যদি বেঁচে থাকতেন কত খুশি হতেন! তিনি সবসময় দোয়া করতেন, আমার ছেলেরা পড়ালেখা করুক। বাবা কৃষিকাজ

করতেন। কিন্তু কখনো আমাদের লেখাপড়া বাদ দিয়ে কৃষিকাজ করতে বলেন নি। এলাকার অন্য বাড়ির ছেলেরা জমিতে না গেলে বাবাদের গালি দিতে শুনেছি। আর আমরা দুই ভাই কখনো মাঠের কাজে গেলে বাবা লেখাপড়ার খোঁজ নিতেন যে, আমরা পড়া শেষ করেছি কিনা।

একবার এমন হলো যে, বাবার খুব জ্বর। এই সুযোগে আমরা দুই ভাই মিলে একটা ঝড়ে ভেঙে যাওয়া গাছ কেটে বাড়িতে আনি। সেইবার বাবার খুব ধমক খেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, লেখাপড়া বাদ দিয়ে শুধু এই কাজ করলে চলবে না। তোদের অনেক বড় হতে হবে। লেখাপড়াও করতে হবে। আবার কৃষিকাজও জানতে হবে। কারণ বাবা জানতেন, শিক্ষিত ছেলেরা যদি এই কাজে আসে তাহলে দেশের কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

বাবার এই কথাগুলো এখন আমি চিন্তা করি। ভাবি আমাকেও ভালো কিছু করতে হবে। আমার এমন কাজ করতে হবে, পৃথিবী থেকে আমার নামটা মুছে গেলেও যেন বাবার নামটা বেঁচে থাকে। □

একজন আদর্শ চিকিৎসক হতে চাই

উহাইমং মার্মা
এমবিবিএস শিক্ষার্থী, রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ

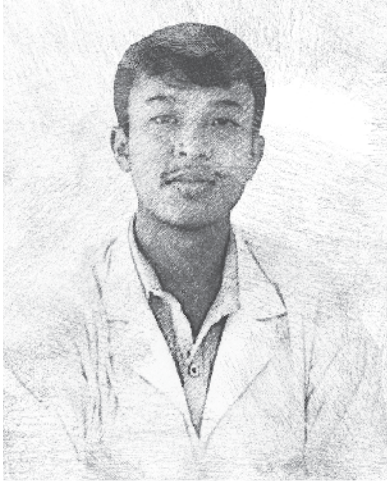

জীবন চলার পথে ভগবানের আশীর্বাদ আমি সবসময় অনুভব করেছি। তিনি আমাকে সুস্থ, সুন্দর ও নিরোগ জীবন দান করেছেন এবং আমার সকল বাধাবিপত্তিকে মোকাবেলা করার শক্তি দিয়েছেন।

ছোটবেলার কিছু কথা বলি। ২০১২ সালে যখন আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম সেই সময়ই মা-বাবার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন থেকেই মায়ের জীবনে সংগ্রাম শুরু। আমাদের ভিটেমাটি ছাড়া কোনো জমিজমা ছিল না। এজন্যে বাড়িতেই মা কিছু হাঁস-মুরগি পালন করা শুরু করলেন। কিন্তু তাতেও তেমন সুবিধা হলো না। আমাদের এমন দিনও গেছে—দিনে একবেলা খাবার খেয়েছি তা-ও মরিচ ভর্তা দিয়ে।

একসময় মা নতুন জীবন সংগ্রামে বের হলেন। গার্মেন্টসে নিজের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির জন্যে ছোট ভাইকে নিয়ে চট্টগ্রামে পাড়ি জমালেন। আমি নানার বাড়িতে থেকে সাধ্যমতো নিজের পড়াশোনা চালিয়ে নিলাম।

২০১৫ সালে জেএসসি পরীক্ষা দিলাম। জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হলাম। তখন থেকে আমাদের গ্রামেরই একজন আমার লেখাপড়ার খরচের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি পড়াশোনা চালিয়ে নিতে থাকলাম। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

২০১৮ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৪.৮৯ পেলাম। ইচ্ছে ছিল চট্টগ্রাম অথবা ঢাকা শহরের ভালো একটা কলেজে পড়ার। কিন্তু আর পড়া হয় নি। লেখাপড়ার এত খরচ চালাবে কে!

আমার গ্রামের কয়েকজন ছেলে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পড়ত। তাদের অভিভাবকদের মাধ্যমে জানতে পারি যে, আমার সেখানে পড়ার সুযোগ আছে। কলেজে তারা ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি নেয়। তাই আমি বিলম্ব না করে ফরম সংগ্রহ করলাম এবং ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। চান্স পেলাম।

এসএসসি-র আগে যেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই জানতাম না, কোয়ান্টামে প্রথম গিয়েই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখলাম। যখন মনছবি সম্পর্কে জানলাম, আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। মনছবি দেখতে শুরু করার পর থেকে পড়াশোনার প্রতি আরো মনোযোগ বেড়ে গেল। এমনও হয়েছে যে, দিনের বেশিরভাগ সময় পড়াশোনা করেই কাটিয়ে দিয়েছি।

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি অনেক ভালো ছিল। কিন্তু পরীক্ষার আগে কোভিড ১৯-এর মহামারির কারণে আমাদের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হলো। আমাদের সকলকেই কোয়ান্টামের মায়া ত্যাগ করে নিজেদের বাসায় ফিরে যেতে হয়।

বাসায় আসার পর পড়াশোনায় মনোযোগ দিন দিন কমে যেতে লাগল। অবশেষে আমাদের ব্যাচকে এইচএসসি পরীক্ষায় অটোপাশ দেয়া হলো। অটোপাশ দেয়ায় আমার রেজাল্ট জিপিএ-৫ হলো। কিন্তু গ্রুপ সাবজেক্টগুলোর মার্কস ছিল খুব কম। যার কারণে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

অটোপাশ ঘোষণার পরেই শুরু করলাম আবার পড়াশোনা। ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশের সেরা কোচিং সেন্টারগুলোতে পড়ার। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে নিজের ইচ্ছের কথা প্রকাশ করতে পারি নি। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ মার্মা স্টুডেন্টস কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত ফ্রি কোচিং প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে যাই কিছুদিনের জন্যে।

প্রথমদিকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু সবকিছু বিবেচনা করে পরে আমি মেডিকেলকে বেছে নিই বেস্ট অপশন হিসেবে। কোচিং সেন্টারের পরিবর্তে বাসায় থেকে প্রস্তুতি নিলাম। পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার আগে মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ায় মেডিকেলের জন্যে প্রস্তুতি এগিয়ে নিলাম।

২ এপ্রিল ২০২১ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলাম। চান্স পেলাম রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজে। বর্তমানে সেখানেই আমি অধ্যয়ন করছি। এই ছিল আমার মেডিকেলে আসার গল্প।

আমার এই জীবন বদলের পেছনে মা, নানা-নানি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে সহযোগিতা করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ও মানসিক শক্তি জুগিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমি একজন সৎ এবং দায়িত্বান ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই। সেইসাথে নিজের জাতি, ভাষা, সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ আসনে উপস্থাপন করার জন্যে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে কাজ করে যেতে চাই। আর একজন আদর্শ চিকিৎসক হওয়াই এখন আমার মনছবি। □

তামাক ও মাদকমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি

সাইদুল ইসলাম

গণিত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

২০০০ সালের ১৫ অক্টোবর এই পৃথিবীর মুখ দেখলেও আমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছিল ২০১৩ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর। কারণ আমি ঐদিন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই স্কুলে আমি আট বছর থেকেছি। ২০১৩ সালে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই এখানে। ছেলে বড় কিছু করবে—বুকভরা আশা নিয়েই মা-বাবা আমাকে এখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনো আমি এসব কিছু বুঝতাম না। আমি তো এর আগে এরকম বড় ক্যাম্পাস দেখি নি, তাই খুব একা একা লাগত। তখন কোনো বন্ধু ছিল না আমার। পরে অবশ্য কিছু ভালো বন্ধু পেয়েছি যাদের আজীবন মনে থাকবে।

স্বপ্ন বলতে কিছু যে আছে এটা শুনে প্রথমদিকে হাসি পেত। ক্যাম্পাসের বড় ভাইদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়ার পেছনে তাদের কঠোর অধ্যবসায় আর মেডিটেশন—এই দুইটাকে আমি শুরুর দিকে অনেক বেশি উপেক্ষা করেছিলাম। প্রতিষ্ঠানের নিয়মগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে চলার চেষ্টা করতাম। এগুলো বোঝা মনে হতো। কোনোভাবে পাশ করে পরের ক্লাসে

অষ্টম শ্রেণিতে কোনো এক ক্লাসের ফাঁকে গল্পের বই পড়ছিলাম।

উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টায় থাকতাম। ক্লাসে সবচাইতে পেছনের বেঞ্চটা ছিল আমার ঘুমানোর জায়গা।

কিন্তু কসমো স্কুলে বড় ভাইদের কাছে শুনলাম ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারলে নাকি তেমন রুলস রেগুলেশন মানতে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও রুটিন এতটা কঠোর হয় না। এরপর থেকে বড় ভাইদের অনুপ্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়ার মিশনে নেমে পড়লাম। কলেজে উঠে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম। একটু একটু করে সবকিছুতেই মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা শুরু হলো। এছাড়া খেলাধুলার মাধ্যমে নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় কোয়ান্টামের হয়ে খেলতে যাওয়ার আনন্দটাই ছিল আলাদা।

আমার বাড়ি প্রথমে ছিল বান্দরবানের লামা উপজেলায়। বর্তমানে মা-বাবা চকরিয়ার বানিয়ারছড়া গ্রামে থাকেন। আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সেভাবে শুনে নি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি।

যে পরিবেশে আমি ছোটবেলায় ছিলাম, আমি এসএসসি পাশ করতাম কিনা সন্দেহ ছিল। এই স্কুলে ভর্তি করানোর পর আমার মা-বাবা স্বপ্ন দেখতেন যে, আমি একজন ডাক্তার হবো। কিন্তু আমি ডাক্তার হতে পারি নি। এ নিয়ে কিছুটা আফসোস হতো। কিন্তু যখন এলাকার চারপাশে তাকাই তখন আমাদের পুরো গ্রামে আমি একাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি।

সবসময় তারা আমার সফলতার জন্যে কোয়ান্টামের কথা বলেন। জীবনের এই আটটি বছর আমার কাছে যে নিয়মগুলো বোঝা মনে হয়েছিল, যখন কোয়ান্টাম থেকে বের হলাম, সে-সময় বুঝতে পেরেছি ওগুলোই আমার জন্যে সবচেয়ে ভালো ছিল। কারণ আমি কোনোসময় মেধাবীদের কাতারে ছিলাম না। কোয়ান্টামে আসার আগে চিন্তা করতাম কোনোভাবে পাশ হয়ে গেলেই হবে।

কিন্তু এখানে এসে আমি এ প্লাসের মুখ দেখেছি। আমার গ্রামের স্কুলের ছোটবেলার যে বন্ধু টেনেটুনে ৩৩ পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে স্কুলে পড়ত, সেই স্কুলের বন্ধুগুলোর হাতে এখন নেশাদ্রব্য। এলাকার সমবয়সী অনেকে সিগারেট থেকে শুরু করে অন্যান্য খারাপ অভ্যাসের সাথে যুক্ত। এগুলো থেকে আমি মুক্ত থাকতে পেরেছি। এটা ভেবে মা-বাবা আজও বার বার কোয়ান্টামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির কোচিংয়ের সময়টা আমার বেশ সংগ্রামের একটা সময়। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের শিক্ষা এসময় আমার খুব কাজে দেয়। আগেই বলেছি যে, স্কুলে থাকা অবস্থায় যেহেতু কোয়ান্টামের নিয়মকানুন আমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতো, তাই কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো, যেমন—মনছবি আমি বিশ্বাস করতে চাইতাম না। কিন্তু একসময় আমি মনছবি নিয়ে অনেক ভাবি এবং নিয়মিত প্রার্থনা করার প্রতি আগ্রহী হই। গুরুজী দাদুর একটি কথা আমার খুব মনে পড়ত। তিনি বলতেন 'প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনা কবুলকারী যখন একাকার হয়ে যায় তখন সে প্রার্থনা কবুল হয়।' আর মনছবি যে কাজ করে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পর বুঝতে পারি।

আমাদের মতো অসহায় বঞ্চিত শিশুদের কোয়ান্টাম যেভাবে পড়ালেখা করাচ্ছে এই বিষয়টা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। তাই আমিও স্বপ্ন দেখি আমি আমার এলাকার মানুষকে শিক্ষিত হতে সাহায্য করব। লেখাপড়া শেষ করে আমি একজন বিসিএস ক্যাডার হতে চাই। আমাদের দেশে দুর্নীতি দমনে আমি ভূমিকা রাখতে চাই। কারণ বাংলাদেশকে স্বর্গভূমি করতে হলে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ আমাদের গড়তেই হবে। আর আমি মাদকমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।

আমার ভ্রমণের শখ আছে। নতুন পরিবেশ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই যখনই সুযোগ পাই, একটু টাকার ব্যবস্থা হলে কোথাও না কোথাও থেকে ঘুরে আসি। এর মাধ্যমে আমি শুধু নতুন পরিবেশ দেখা নয়, নতুন কিছু শিখতে পারি। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কোয়ান্টামের নিবেদিত সদস্যদের প্রতি যারা নিজেদের অনেক সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়েছেন বলেই আমার মতো স্বপ্নহীন শিশুরা স্বপ্ন দেখতে পারছে। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে তারা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। □

পৃথিবীতে প্রথম হয়ে এসেছি, আগামীতেও প্রথম হবো

শৈক্যনু মার্মা
মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

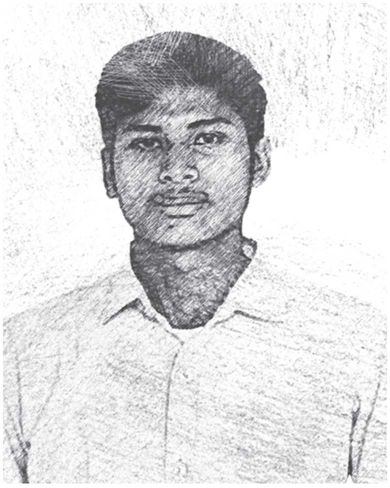

পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে আমি দ্বিতীয়। মা-বাবা দুই জনই কৃষিকাজ করেন। বান্দরবানের রেইচাথলি পাড়ায় আমার বাড়ি। কোয়ান্টামে আসার আগে সেখানেই আমি বেড়ে উঠি। ছোটবেলা থেকে অনেক ইচ্ছে ছিল পড়ালেখা করব। তাই হাল ছাড়ি নি। এসএসসি পর্যন্ত খুব পরিশ্রম করে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

প্রাইমারিতে তো এত খরচ ছিল না। এলাকার হাই স্কুলটা বেসরকারি হলেও এমপিও তালিকাভুক্ত ছিল। সেখানকার প্রধান শিক্ষক আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সেই স্কুলে আমরা দুই ভাইবোন পড়াশোনা করতাম। আমি যখন অষ্টম শ্রেণিতে তখন আমার বোন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। হেডমাস্টার আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন। আমাদের দুজন থেকে যে-কোনো একজনের বেতন তিনি ফ্রি করে দিয়েছিলেন। অন্যরা যখন প্রাইভেট পড়ত তখন আমি নিজ থেকে পড়ার চেষ্টা করতাম।

স্যারেরাও জানতেন বই কেনার সামর্থ্য আমার নেই। লাইব্রেরিতে রেফারেন্সের জন্যে প্রকাশকেরা স্যারদেরকে কিছু বই ফ্রি-তে দিত। তখন স্যারদের কাছে কোনো বই এলে আমাকে পড়ার জন্যে দিতেন। এভাবেই এসএসসি শেষ করলাম।

ভাবতেই পারতাম না যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। বরং ভুল ধারণা ছিল। ভাবতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে অনেক খরচ লাগবে, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি খুব পরিশ্রম করি বা সাপোর্ট থাকে তাহলে সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে পারব। যেহেতু আমরা পাহাড়িরা চট্টগ্রামে বেশি থাকি। বান্দরবানের পাশের শহর হওয়ায় এখানে খরচ কম লাগে।

গ্রামে মানুষের জীবনধারা থেকে বেরিয়ে পৃথিবীটাকে অন্যভাবে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। আরো ইচ্ছে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব তারপর সমাজে মানুষের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবো। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই তো আর হয় না! আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভেবে নিয়েছিলাম হয়তো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হবে না। এসএসসি পরীক্ষার পর এত কিছু চিন্তা করতাম—কী যে হবে আমার! তখন মাসখানেক পর এক আত্মীয়ের মাধ্যমে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে চলে গেলাম।

আমার ধারণা পাল্টে গেল যখন কসমো কলেজে ভর্তি হই। এর আগে আবাসিক স্কুলে যাওয়া হয় নি। ওখানে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম, যে সুযোগ আগে কখনো হয় নি। যেমন এতগুলো মানুষ একসাথে থাকা, খাওয়া ইত্যাদি।

আচার-আচরণের দিক দিয়ে কোয়ান্টাম অনেক কিছু শিখিয়েছে। যেমন—সেখানকার শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন। এগুলো দেখার পর আমার মনে হয়, যে শিক্ষার্থী এখনো নিজের ও অন্যকে নিয়ে ভালো ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না সে-ও পরিবর্তন হয়ে যাবে সেখানে গেলে। এছাড়াও মানুষকে কীভাবে মূল্য দিতে হয় তা শিখেছি। সেখানে যে যেই অবস্থানে থাকুক না কেন সবাই সবাইকে সম্মান করে। সেই শিক্ষকদের আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই।

কোভিড ১৯-এর জন্যে অ্যাডমিশনের সময় বাড়িতে এসে পাড়ায় থাকতে হয়েছিল। এসময় পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই বাইরে আড্ডা দিত। আমার মন টানত কিন্তু যেতাম না। ওদের আর্থিক অবস্থা আমাদের থেকে

অনেক ভালো। আমি যেহেতু কলেজে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে একটি ভালো অবস্থানে যেতে হবে বা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে তাই সময় নষ্ট করলাম না। পরিশ্রম বাড়িয়ে দিলাম। বাসায় বসে একা একা পড়তাম। কোনো জায়গায় ফ্রি-তে প্রাইভেট পড়ার সুযোগ পেলে গিয়ে পড়তাম। অনেকে আমাকে নিয়ে মজা করত। কারণ আমি পড়তে পড়তে মুখের ওপর বই রেখে কখন যে ঘুমিয়ে যেতাম টের পেতাম না।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকা দরকার। কারণ মাতৃগর্ভে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে পিতার দেহ থেকে যে ৪০/ ৫০ কোটি শুক্রাণু যাত্রা শুরু করে, তার একটি মাত্র শুক্রাণু গন্তব্যে যেতে পারে। জীবনের প্রথম সংগ্রামে জয়ী হয়েই একজন মানুষ পৃথিবীতে আসে। তাই আমি মনে করি, সে আগামীতেও প্রথম হবে যদি বিশ্বাস করতে পারে। একথাগুলো আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে শুনেছি।

নিয়মিত মেডিটেশন আর মনছবি আমার লক্ষ্য নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে। মনছবি ঠিক করলাম, আমি বাংলাদেশের প্রাচ্য অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। নিয়মিত মেডিটেশনে মনছবি দেখতাম এবং শিক্ষকদের সহায়তায় আজ আমি আমার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি।

আপাতত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে নিজ এলাকায় কিছু গঠনমূলক কাজ করতে চাই। আমি দেখেছি পাড়ার শিক্ষার্থীরা অষ্টম বা এসএসসি পর্যন্ত পড়ার পর আর পড়ে না। তাই তারা যেন উচ্চশিক্ষা নিয়ে পড়ালেখা করে সে বিষয়ে সচেতনতামূলক কাজ আমি শুরু করেছি। □

পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়তে চাই

অপূর্ব চাকমা
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

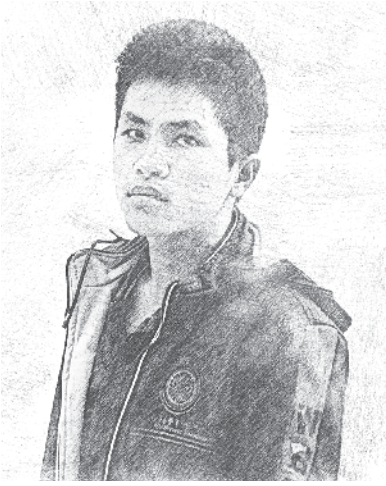

আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম ২০১৮ সালে। কলেজের দুই বছরে আমি জীবনের সবচেয়ে ভালো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পেয়েছি। তাদের সাথে কত যে আনন্দ করেছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

সাধারণত বাইরে কোনো বন্ধুর জন্মদিন থাকলে বন্ধুরা বাইরে থেকে কেক কিনে সেটা কেটে জন্মদিন পালন করে থাকে। আর আমরা কোয়ান্টামে যারা ছিলাম তারা এক ভিন্ন পদ্ধতিতে জন্মদিন উদযাপন করতাম। কারো জন্মদিন থাকলে আমরা ক্যাম্পাসে হালকা নাস্তা হিসেবে আমাদের যে বাদাম, খেজুর বা টোস্ট বিস্কুট দিত, সেগুলো জমিয়ে রাখতাম। এসব খাবার একসাথে মিক্সড করে একটা মণ্ড তৈরি করতাম। এটাই ছিল আমাদের জন্মদিনের কেক। এভাবেই আরো অনেক মজা করতাম।

এসএসসি-তে বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেও কলেজে আমি মানবিক শাখাতে ভর্তি হই। কোয়ান্টাম কসমো কলেজে আর আবাসিকে রুটিন অনুসারে সবকিছু করা হয়। আমিও সবকিছু মেনে চলার চেষ্টা করতাম। রুটিন অনুসারে খাওয়াদাওয়া,

কলেজে যাওয়া এবং সময়মতো যে যার সহশিক্ষাক্রমিক কাজে যাওয়া। এই রুটিন অনুসারে তখন চলতে শিখেছিলাম বলে আজ তা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় কাউখালী উপজেলায় এক গহীন গ্রামে আমার বাড়ি। যদিও এখন গ্রামে আধুনিকতার কিছু ছোঁয়া পাচ্ছে, সে-সময়ে আমাদের গ্রামে তেমন কিছুই ছিল না। গ্রামে তো দূরের কথা, তখন ঐ উপজেলায় ভালো কোনো কলেজ না থাকায় আমার মা ঐ সময়ে কম খরচে ভালো মানের কলেজ খুঁজছিলেন আমাকে পড়ানোর জন্যে। যেহেতু আমার বাবা ছিলেন না, তাই মা আমাদের সবকিছু সামলাতেন। এসময় মা কোয়ান্টামের কথা জানতে পারেন যে, সেখানে সবকিছু ফ্রি-তে পড়ানো হয়।

আরেকটি বিষয় শুনে যে-কেউ অবাক হতেই পারে যে, আমি স্কুলে থাকাকালে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনি নি। যখন আমি প্রথম কোয়ান্টামে এলাম তখন জানলাম বিশ্ববিদ্যালয় কী? আমি প্রথমে একটু অবাকই হয়েছিলাম কারণ এতদিন আমি চিন্তাই করি নি—আমার লক্ষ্য কী? বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানার পর দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছে জাগল।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর আমি মনছবি ঠিক করলাম। সে-সময়ই আমার মেডিটেশনের সাথে একাত্মতা সৃষ্টি হয়। কোর্সের পর থেকে আমার সময়কে মূল্যবান মনে হতো। আগে সময় নিয়ে সচেতন ছিলাম না। একপর্যায়ে এইচএসসি শেষ করলাম ভালোভাবেই। আজ আমার মনছবি দেখা সার্থক। কারণ আমি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পড়াশোনা করছি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও প্রকৃতিপ্রেমী একজন মানুষ। সুযোগ পেলেই বান্দরবানের বড় বড় পাহাড়ে হেঁটে উঠতে পছন্দ করি। তাই যানবাহনের চেয়ে আমার পায়ে হেঁটে পথ চলতে বেশি ভালো লাগে। স্বল্প দূরত্বে আমি কখনোই যানবাহন ব্যবহার করি না। আমরা যানবাহন বেশি ব্যবহার করছি বলেই পরিবেশ দূষণ বেড়েই চলেছে।

আমার এখন লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে এবং তারপর সারা পৃথিবীর পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্যে কাজ করা। ময়লা আবর্জনাগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করে দূষণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। মানুষ যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলে। আমি এই ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে চাই। □

এই মানুষগুলোকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না

খোরশেদ আলম
ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স বিভাগ, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮ সাল। বছরটি আমার জন্যে একটি মাইলফলক। এবছরই আমি অনেক বাধা পেরিয়ে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। এলাকার কিছু মানুষ এর বিরোধিতা করে বলেছিল, কোয়ান্টামে গেলে ছেলেকে ধর্মান্তরিত করে ফেলবে! আরো নেতিবাচক কিছু কথা। ফলে মা-ও আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি করাতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু আমাদের স্কুলের এক শিক্ষক এবং এলাকার মসজিদের হুজুর আমাকে উৎসাহিত করেন। শেষ পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গেলাম। প্রথম দেখাতেই আমার কাছে কসমো কলেজের জায়গা ও পরিবেশ অনেক ভালো লেগেছিল। চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এত বড় প্রতিষ্ঠানে সচরাচর এমন দেখা যায় না।

এখানকার শিক্ষক-ছাত্র প্রায় সবাই বন্ধুত্বপূর্ণ। একবার আমরা পদার্থবিজ্ঞানের সুজন মন্ডল স্যারের জন্মদিন পালন করেছিলাম। আগে থেকে জানতাম না কবে তার জন্মদিন, সেদিনই সন্ধ্যায় জানতে পারি। এখন স্যারকে

কী উপহার দেই? আমাদের ক্যাম্পাসে বাইরের কোনোকিছু নিয়ে আসা যেত না। তবু খুঁজে দেখলাম আমাদের এক বন্ধুর কাছে সুন্দর একটি কলম আছে। আমরা ঠিক করলাম এই কলমটাই স্যারকে উপহার দেবো। স্যার ক্লাসে আসার পর সবাই স্যারকে উইশ করলাম। স্যারের জন্মদিন নিয়ে বন্ধু আরমান একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। সেটা পাঠ করে শোনানো হলো। বন্ধু জেমি আর সুদীপ্ত গান গাইল। ওরা খুব ভালো গাইতে পারত। স্যার যে সেদিন কী খুশি হয়েছিলেন! স্যারের ভাষ্যমতে এটা ছিল প্রথমবারের মতো তার কোনো জন্মদিন উদযাপন! স্যার আমাদের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনার পর অন্য কোথাও ক্যারিয়ার না করে কোয়ান্টাম ও কোয়ান্টাদের ভালবেসে এই স্কুলে পড়ানো শুরু করেন। কোয়ান্টামের এই মানুষগুলোকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

আমাদের কলেজে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা এসে পড়াতেন। ভালোভাবে পড়াশোনা করতে উৎসাহ দিতেন।

আমি নিয়মিত মেডিটেশন করতাম। সাপ্তাহিক আত্ম উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম সাদাকায়নে অংশ নিতাম। ইচ্ছে ছিল চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে পড়ব। হয়তো তার জন্যে যে-রকম পরিশ্রম করা প্রয়োজন ছিল, তা করি নি। তাই সুযোগ পাই নি। তবে আলহামদুলিল্লাহ! গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছি। আমি এখানে ভালো আছি।

এখন আমি নিজেকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে যেতে চাই যাতে আমার মা-বাবা গর্ববোধ করেন। আমার বড় একটা স্বপ্ন আছে। আমাদের দেশে শহর অঞ্চলগুলোতে এমন লক্ষ লক্ষ শিশু আছে যারা পড়াশোনা কিংবা পোশাক তো দূরের কথা, ঠিকমতো খাবারই পায় না। তাদের জন্যে কিছু করতে চাই।

আমার সবচেয়ে অবাক লাগে গুরুজী দাদুকে দেখে। একজন মানুষ কীভাবে এরকম একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এত বড় একটা কার্যক্রম চালাচ্ছেন! তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হয়েও তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোশাক দেখে কখনো বোঝার উপায় নেই যে, তিনি এত বড় একজন মানুষ। তার সবকিছুই সাধারণ। নেই কোনো বডিগার্ড! নিজে পায়ে হেঁটে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়ে উঠেন। কীভাবে সম্ভব তার মতো হওয়া, বুঝি না! সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করি, কোয়ান্টাদেরকে তিনি আরো বহুদিন এভাবেই ভালবাসা দিয়ে যাক।

আমাদের জন্যে সপ্তাহের সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল শুক্রবার। এদিন ভোরবেলায় উঠে কেউ গ্রুপ করে হাঁটতে যেতাম, কেউ যেতাম পাহাড়ি আলু তুলে আনতে, কেউ-বা মাছ ধরতাম। আমিও অনেকবার গিয়েছিলাম এসবে। অনেকে মিলে একসাথে এসব কাজের যে আনন্দ, তখনকার অনুভূতিগুলো আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না। দাবা, কেরাম খেলার সুযোগ ছিল এদিন। এছাড়া মাঝে মধ্যে গুরুজী দাদু আসতেন সাদাকায়ন করানোর জন্যে। আমরা সবাই সেখানে অংশগ্রহণ করতাম।

আমি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষ করেছিলাম আমার উপজেলায়। সেখানে অনেক শিক্ষক আছেন যারা ক্লাসে কোনোমতে পড়াতেন। অন্য কোনো উপায় না থাকায় শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে তাদের কাছেই যেত প্রাইভেট পড়তে। আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে আমি প্রাইভেট পড়তে যেতে পারি নি। যেটা নিয়ে আমি অনেক দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

কিন্তু কোয়ান্টামে যাওয়ার পর আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশ দেখলাম। সেখানে শিক্ষকরা আমাদের ক্লাসে বোঝাতেন, না বুঝলে কয়েকবার বোঝাতেন। প্রয়োজনে আলাদা করে বোঝাতেন, তা-ও না বুঝলে কীভাবে বোঝানো যায়, কীভাবে শিক্ষার্থীরা বুঝবে, সেটা নিয়ে তাদের আগ্রহ এবং চিন্তা বেশি থাকত। রাতে পড়ার সময় তারা আসতেন, তখন যার যেটা সমস্যা সেটা স্যারদের থেকে জেনে নিতাম।

এই স্কুলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ক্রামা—সকল ধর্মের শিক্ষার্থীরা একসাথে খাওয়াদাওয়া করছে, একসাথে পড়াশোনা করছে, একসাথে খেলাধুলা করছে, একসাথে থাকছে, যেটা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি।

সত্যি বলতে কোয়ান্টাম আমার জন্যে একটা সৌভাগ্য। যার কারণে আমি জীবনের অর্থ বুঝতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি এবং নিজের জীবনকে আরো উন্নত করার সুযোগ পেয়েছি, যা আমার এলাকায় থেকে সম্ভব ছিল না। □

ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল

অংচুথিং মার্মা
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

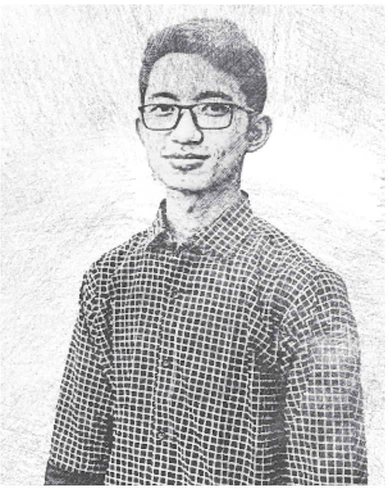

আমি যে-কোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে পছন্দ করি। কিছুটা কল্পনাবিলাসী বলতে পারেন আমাকে। ছোটবেলায় আমার কল্পনার জগতে বিরাজ করত বিভিন্ন খেলাধুলা, গাছপালা আর আমার মা। এতসব কল্পনার জগৎ ছেড়ে একসময় পাড়ি দিলাম বহুদূর। কাপ্তাইয়ের পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর ছবির মতো গ্রাম থেকে পৌঁছে গেলাম খুলনায়।

আমি প্রাইমারি পড়াশোনা করেছি খুলনার এক মিশনারি স্কুলে। তারপর আমার হাই স্কুল জীবন শুরু হয় ঢাকায়, আমাদের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটা প্রতিষ্ঠান জ্যোতি বিদ্যানিকেতনে। অনেক সুন্দর সময় পার করেছি ওখানেও। একজন ম্যাডাম আমাদের বাংলা পড়াতেন খুব সুন্দর করে। আমার বাংলা ভাষা সঠিকভাবে আয়ত্তের কারিগর তিনি। আর বিজ্ঞান পড়ার মজাটা পেয়েছিলাম স্বপন স্যারের কাছ থেকে। আমাদের প্রিন্সিপাল উখ্যিং ম্যামেরও অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। তার কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন পেয়েছিলাম।

আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমি যেন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পড়ি। সেই সূত্রে কসমো স্কুলে ২০১৬ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হই। আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় নম্বর কিছুটা কম থাকার কারণে স্যার প্রথমে আমাকে সায়েন্স দিতে রাজি হন নি। পরে তিনি আমার আগ্রহ দেখে সায়েন্স বিভাগে সুযোগ দেন। আর বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ অনেক আগে থেকেই। অষ্টম শ্রেণি থেকে আমার ইচ্ছে ছিল সিএসই (কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) নিয়ে পড়ার।

কোয়ান্টামে আমার সময়গুলো খুব দ্রুত কেটে গেছে। তবে অনেক মূল্যবান ছিল সময়গুলো। সুজন স্যারের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। তার সাথে সুন্দর কিছু স্মৃতি আছে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার সুজন স্যারের সাথে।

মনে আছে, বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণের জন্যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার মুহূর্তগুলো। অটোমেটিক ইরিগেশন সিস্টেম, লাইন ফলোয়ার রোবট, আল্ট্রা-সাউন্ড সেন্সর রোবট—আরো কত কী! খুব মজা লাগত। আব্দুর রাব্বি তোতা আমার সহপাঠী। সে-ও এখন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে। আমরা দুজন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কম্পিউটার ল্যাবে যেতাম। যদিও ক্লাস ফাঁকি দেয়াটা অনেক কঠিন ছিল। তারপরও কীভাবে যেন ম্যানেজ হয়ে যেত। ল্যাবে গিয়ে প্রোগ্রামিং শিখতাম। তখন ল্যাব টিচার আমাদের কিছুটা প্রশ্রয় দিতেন। বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রজেক্ট বানিয়ে আমরা লামা ও বান্দরবান দুই জায়গায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেই প্রথম হয়েছিলাম।

আমার সবচেয়ে অবাক লাগত শোভন স্যারকে দেখলে। সেই শুরু থেকেই তিনি আমার নজর কাড়েন। আমরা এতজন কোয়ান্টা কিন্তু সবার নাম আর কোয়ান্টা নম্বর কেমন করে যেন মনে রাখতেন। আবার প্রত্যেকের ব্যাপারে তিনি বিস্তারিতও জানতেন। আমাকে তা সত্যিই অবাক করত।

আমি এসএসসি ও এইচএসসিতে এ প্লাস পেয়েছিলাম। এরপর ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার সময় করোনা পরিস্থিতির কারণে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভর্তি প্রস্তুতি আমাকে ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে নিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি লেংঙি ভাইয়ের কাছে। তিনিও একসময় কোয়ান্টা ছিলেন। এখন তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়ছেন। আমি ও আমার বন্ধুরা তার কাছে পড়তাম। লেংঙি ভাই বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন। বিজ্ঞানের শিক্ষক না থাকায়

আমাদের নিজেদের পড়ে নিতে হতো। আরেক কোয়ান্টা শৈক্যচিং ভাইও পড়াতে এসেছিলেন। তিনি এখন বুয়েটে পড়েন। এরপর করোনার কারণে আমাদের ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে গেল।

এসময় আমার আর্থিক সমস্যাও দেখা দিল। আমি বাড়ি চলে এলাম। কম্পিউটারের বিভিন্ন কাজ শিখতে শুরু করলাম, যাতে ভবিষ্যতে কাজে লাগে। এরপর ভর্তি পরীক্ষার সময় দেয়া হলে আমি আবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট পেলাম।

আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে, যা আমি প্রথম শিখেছিলাম আমার মায়ের কাছে। আর এই শিক্ষার পূর্ণতা পেয়েছে কোয়ান্টামে এসে। এছাড়াও আমার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বৈজ্ঞানিক জীবনাচার, আচার-আচরণে শুদ্ধাচার, শরীরচর্চার জন্যে ইয়োগা আমি কোয়ান্টাম থেকেই শিখেছি। আমাদের মার্মা সম্প্রদায় শিক্ষায় এখনো পিছিয়ে আছে। তাদের শিক্ষিত করার কাজে থাকতে চাই। এছাড়াও কম্পিউটার সায়েন্সের ওপর আমি নিজের কিছু গবেষণাপত্র বের করতে চাই যেটা মানুষের কল্যাণে কাজে লাগবে। আরেকটি স্বপ্ন আমি এখনো দেখি, তা হলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি মা-বাবাকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা ঘুরিয়ে দেখাতে চাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটা ধানী জমির মাঝে এখন আমাদের হোস্টেল। পরিবেশটা অনেক সুন্দর। চারপাশে সবুজ ধান আর জমি। বিকেলের হালকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে মনটাও অতীতে হারিয়ে যায়। একের পর এক ছবি ভাসতে থাকে মনের ক্যানভাসে। ভাগ্যবান মনে হয় নিজেকে। কত সুন্দর সুন্দর সময় পেয়েছি আমি! কত চমৎকার মানুষদের সাথে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সেই মুহূর্তগুলোকে মনে পড়ে অনেক। □

ভালো কিছু করতে চাই

শিশির চাকমা

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রাঙ্গামাটিতে ১০টি উপজেলা। এই ১০টি উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাহাড় আছে বরকল উপজেলায়। আমি মনে করি ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ১০টি উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত এটি। এই বরকল উপজেলার আইমাছড়া ইউনিয়নে কৃষ্ণপাড়া গ্রামে আমার বাড়ি। সুতরাং যেখানে উপজেলাটিই উন্নত হয় নি সেখানে আমাদের গ্রামের অবস্থা কেমনই বা হবে!

গ্রামে সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে শুধু একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়টির নাম সাইচাল আইমাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনেক কষ্টে আমি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলাম। কারণ গ্রামে নেই কোনো রাস্তাঘাট, নেই কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ, নেই কোনো কর্মসংস্থান। বর্তমানেও আমাদের গ্রামের অবস্থা আগের মতোই রয়েছে। তাই বলে আমি অভিযোগ করছি না। বরং গ্রামের অবস্থা যত অনুন্নত হোক না কেন, জন্মভূমি শব্দটা শুনলে মনের ভেতর আলাদা একটা টান চলে আসে। জন্মভূমির প্রতি যে টান, তা কী কখনো ভোলা যায়?

যেহেতু গ্রামে মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তাই আমাকে মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার জন্যে বরকল সদর উপজেলায় বরকল মডেল স্কুলে ভর্তি হতে হয়। হঠাৎ করে পরিবার থেকে দূরে চলে আসা আমার জন্যে অনেক কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমি যখন বরকল সদরে পড়তে আসি, তখন আমার বয়স ছিল ১২ বছর। এই স্কুলে আমি পাঁচ বছর ছিলাম। তারপর ২০১৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা দেই। তারপরে আমার কলেজ জীবন শুরু হয় কোয়ান্টাম কসমো কলেজে। এখানে এসে আমি একটা নতুন জীবন পাই।

এই কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমার বাবাকে পরামর্শ দেন, আমাদের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকম চাকমা। তিনি এই স্কুল সম্পর্কে জানতেন। তিনি বললেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ।

এখানে এসে আমি লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগী হয়ে উঠি। নিয়মিত ক্লাস, মেডিটেশন চর্চা, শারীরিকভাবে ফিট থাকার জন্যে খেলাধুলা ও ব্যায়াম আমাকে খুব আশাবাদী করে তুলল। আমি ভাবতে শুরু করলাম, আমিও পারব। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনছবি করলাম। অবশেষে চান্সও পেলাম।

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন আমার শ্রদ্ধেয় মা-বাবা। তাদের দোয়ায় আমি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পেরেছি। এরপরে যার অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি হচ্ছেন গুরুজী দাদু। তার প্রতিষ্ঠা করা কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে ভর্তি হওয়ার পর আমি নিজেকে অনেক পরিবর্তন করতে পেরেছি। আমি যখন মাধ্যমিক স্কুলে পড়তাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটা মাঝে মাঝে শুনতাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টা কী জিনিস সেটা ভালো করে বুঝতাম না।

আর কোয়ান্টামে শেখানো নৈতিক শিক্ষাগুলো আমার ভাবনার জগতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল। আমি এখন উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা ও সেই জ্ঞান মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো। জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে আমি ভালো কিছু করতে চাই। বিশেষত আমার জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্যে কাজ করব। আর জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। তাই সবার মাঝে সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে তুলতে আমি চেষ্টা করব। □

জিমন্যাস্টিক্স আমার জীবনের অংশ

সাংখেঅং খুমী কিতং

চারুকলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

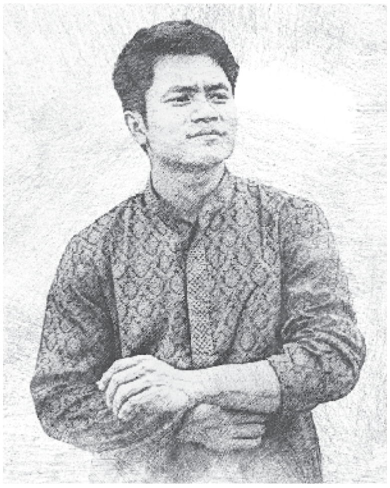

অচেনা এক জায়গায় বাবা আমাকে নিয়ে যান ছোটবেলায়। গিয়ে দেখি আমার মতো আরো অনেকেই আছে সেখানে। বাবার সাথে, অনেকে মায়ের সাথে এসেছে। এত সব তখন বুঝি না। বাবা আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছেন? বাবার হাত ধরে বসে আছি। হঠাৎ দেখি বাবা কার সাথে যেন কথা বলছেন। একটু পর আমার নাম ডাকা হলে বাবা সেদিকে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি আমার ডান হাত দিয়ে মাথার উপর দিয়ে বাম দিকের কান ধরতে বলছে।

মনে মনে ভাবলাম এটা আবার কী? যা-হোক ধরলাম। এরপর আবার আমাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে ফিতা দিয়ে মাপ নেয়া হচ্ছে। তখন উচ্চতা কত ছিল ঠিক জানি না। হঠাৎ বাবার কাছে একজন মহিলা এলেন। সিস্টার বলে ডাকে তাদের। বাবা ঐ সিস্টারের কাছে দিলেন আমাকে। বাংলা তখন একটু পারি। আমার নাম জিজ্ঞেস করা হলো। এরপর বাবা বললেন, আমি একটু টয়লেটে যাচ্ছি। এই বলে কোথায় যেন গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, বাবা আসছেন না। হঠাৎ মনে হলো বাবা

আমাকে রেখে কোথাও চলে যাচ্ছেন। আমি যখনই একটু নাড়া দিয়ে উঠলাম ঐ সিস্টার বুঝে ফেললেন যে এবার আমি দৌড় দিব।

কিন্তু সিস্টার আমাকে ছাড়ছেন না। এমনভাবে চেপে ধরেছেন আমিও ছাড়াতে পারছি না। শেষে বাধ্য হলাম বাম হাতে কামড় দিতে। তিনি একটু হাত উঠাতেই আমি দৌড় দিলাম। সিস্টার আর আমাকে ধরতে পারলেন না। বেশ জোরেই কামড় দিয়েছিলাম তাকে!

আমাকে আশপাশ থেকে অনেকে ধরতে এল। কিন্তু ধরতে পারল না। জোরে দৌড় দিয়ে যেই গেট পার হবো এমন সময় একজন এসে সামনে থেকে আমাকে ধরে নিল। আর এমনভাবে ধরেছে যে ছাড়ার কোনো উপায় নেই। এরপর এক ভাই এল, সে আমাকে বলল, চলো। তার সাথে গেলাম। আমাকে নিয়ে সে ঘুরল কিছুক্ষণ। বলল, আবার তোমার বাবা আসবে, আশ্বাস দিল। এই ছিল কোয়ান্টামে ভর্তির সময়কার একটা অনুভূতি, যা কোনোদিন ভুলতে পারব না। ঘটনাটা ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর। তখন আমাদের মতো নতুন ভর্তি হওয়া শিশুদের আলাদা করে বড় ভাইদের সাথে থাকতে দিত। বড় ভাইয়েরা সবকিছুই আমাদের শিখিয়ে দিত। কোথায় কখন কী করতে হবে। ধীরে ধীরে সব নিয়মকানুন শিখে ফেলি।

খেলাধুলার নেশা ছিল ছোট থেকেই। যে-কোনো খেলাধুলার মধ্যে ঢুকে যেতাম। যখন যেখানে যে খেলা চলত তা-ই খেলতাম। খেলাধুলাও যে একটা আলাদা জগৎ সেটা যদি এখানে না আসতাম কোনোদিন বুঝতাম না। এটার মর্যাদা কী বা এটা কীভাবে জীবনের লক্ষ্য হতে পারে সেটা বুঝতাম না। ছোটকালে স্কুলে কুংফু শেখার সুযোগ হয়েছিল। এরপর কারাতে শিখি উক্যহ্লা স্যারের কাছ থেকে। সেটাও সম্ভবত তৃতীয় শ্রেণি থেকে শুরু করি। এরপর থেকে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত চলে এই খেলা। স্যারের খুব পছন্দের ছাত্র ছিলাম আমি। এমনকি কোনো সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম হলে সেখানে আমি কারাতের কাতা প্রদর্শন করতাম।

যখন খেলাধুলার দিকে মন দিয়েছি তখন লেখাপড়ায় একটু পিছিয়ে গিয়েছি। কারণ স্পোর্টস টাইমে স্পোর্টস আর স্টাডির সময় ঘুম যেন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্লাসে ঘুম আর মাঠে স্পোর্টস। এর জন্যে অবশ্য অনেক অসুবিধা পোহাতে হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির মাঝের দিকে কারাতে শেখা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর জিমন্যাস্টিক্স শুরু হয়। আমাকে সেখানে দেয়া হলো। এটার প্রতি প্রথমে আমার আগ্রহ ছিল না। তবে পরবর্তীকালে একটা ছোট্ট সাফল্য

পেলে উৎসাহ বেড়ে যায়। এরপর এটা নিয়েই স্বপ্ন দেখা শুরু করি, কিছু একটা করব। লেখাপড়া দিয়ে আর কতদূর, যা শক্তি সামর্থ্য সবকিছু দিয়েছি স্পোর্টসের দিকে।

জিমন্যাস্টিক্সে এসে ইকবাল স্যারের সাথে পরিচয় হয়। তিনি প্রথম আসেন আমাদের শেখানোর জন্যে। প্রথমদিকে ভাবতাম এটা তো মেয়েদের খেলা কীভাবে ছেলেরা খেলবে! এ নিয়ে তেমন ধারণা ছিল না। স্যার এসে আমরা জুনিয়র যারা আছি তাদের বাছাই করছেন আর আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। আমরা যারা এসেছি তারা কারাতে থেকে বের হয়েছি সবাই। স্যার বললেন যে, ছোট থেকে এই খেলা শুরু করতে হয়। আমি ভাবলাম বেশি বড় হয়ে গেছি নাকি! মাত্র তো সিক্সে পড়ি। সাইজে ছোট ছিলাম, কিন্তু বয়সে অন্যদের তুলনায় একটু বড় ছিলাম। তখন থেকে স্ট্রেচিং করানো আর সবকিছুতে নেতৃত্ব দিয়ে গেছি। এইভাবে আমাকেই সিনিয়র হিসেবে রাখে দলের মধ্যে। নিজে করার সাথে অন্যদের করানোকেও একই সাথে গুরুত্ব দিয়েছি। অর্থাৎ নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে উঠে আমার মাঝে।

২০১২ সালে কোরবানি ঈদের পর শুরু হয় আমাদের এই জিমন্যাস্টিক্স ইভেন্ট। ২০১৪-তে জাতীয় জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতায় ফ্লোর এক্সারসাইজ ও প্যারালাল বার দুইটা ইভেন্টে গোল্ড মেডেল পাই। জীবনে প্রথম ন্যাশনাল পর্যায়ে অর্জন! এরপর অনেক বড় ভাই, স্যার আসেন শেখানোর জন্যে। অনেক কিছু শিখি তাদের কাছ থেকে।

প্রথমদিকে কোচ সর্বোচ্চ ১৫ দিনের বেশি থাকতেন না। তাই দায়িত্ব সব

নিজে থেকে গুছিয়ে নিতে হয়েছে আমাদের। এভাবে নিয়মিত ট্রেনিং চালিয়ে যাচ্ছি। একবছর ব্যবধানে শরীরের গঠন একটু পরিবর্তন হতে শুরু করে। এটা দেখে অন্যান্য স্পোর্টস থেকে নিজেদের আলাদা করে ফেলি। তখন আমাদের পর্যাপ্ত উপকরণ ছিল না। ছোট জায়গায় প্যারালাল বার হ্যান্ডস্ট্যান্ড করতে গেলে ছাদে পা লেগে যেত। সাইজে এমনিতে ছোট আবার ছাদে পা লেগে যায়। তবুও যতটুকু সম্ভব ছিল চর্চা করে গেছি।

এর মধ্যে গুরুজী দাদু বলেন, অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই। এটা তখন আরো বেশি মনে লালন করতে থাকি। ট্রেইনার ছাড়াই ট্রেনিং চালিয়ে গেছি। ট্রেনিংয়ের মাঝে কখনো ছাড় দিতাম না। যেমন নিজে করতাম, ছোট যারা ছিল তাদেরকে করাতাম। আর এখন কত বড় জিমনেসিয়াম হয়েছে কোয়ান্টামমে ভাবতেই অবাক লাগে!

মালেক স্যার নামে একজন গণিত শিক্ষক ছিলেন। তাকে আমি খুব পছন্দ করতাম। তার সাথে আমি বেশি মিশতাম। আমার পিইসি পরীক্ষায় অল্পের জন্যে এ প্লাস মিস হয়ে গিয়েছিল। তখন মালেক স্যার আমাকে বললেন, কিতং অল্পের জন্যে তুমি এ প্লাস মিস করেছ। কিন্তু তুমি পারবে।

এরপর অষ্টম শ্রেণিতে আমি প্রথম কোনো ন্যাশনাল ক্যাম্পে ডাক পাই বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন থেকে। আমি সেখানে চার থেকে পাঁচ মাস ক্যাম্পিং করেছিলাম। তখন থেকে নিজেকে একজন জাতীয় পর্যায়ের প্লেয়ার মনে করতে শুরু করি।

একসময় মনে হলো, লেখাপড়া করা দরকার জীবনের জন্যে। এরপর থেকে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ দিলাম। ধীরে ধীরে লেখাপড়ায় এগিয়ে গেলাম। সমান তালে খেলাধুলাও চলল। এসএসসি এবং এইচএসসি শেষ করলাম। তারপর চান্স পেলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। যেহেতু ছবি আঁকতে পারতাম এবং ভালবাসতাম, তাই বেছে নিলাম চারুকলা বিভাগ।

এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে ভালো কিছু একটা করতে চাই যাতে মানুষের কল্যাণ হবে। এই কল্যাণ করার শিক্ষাটা আমি পেয়েছিলাম কিন্তু ঐ ছোট বয়সেই। আর জিমন্যাস্টিক্স নিয়ে স্বপ্ন তো আছেই। কারণ এটা আমার জীবনের অংশ। □

এই স্কুল আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট

অলি ইসলাম
মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

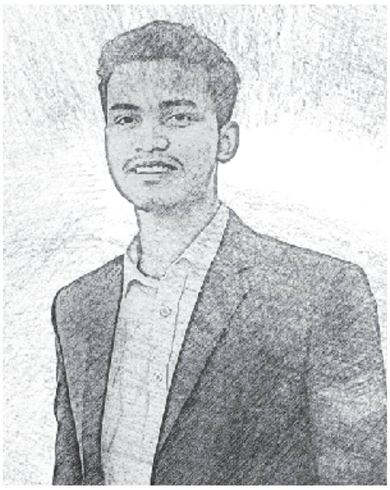

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে আমি ক্লাস সেভেনে ভর্তি হই। শুরুর দিকটা মোটেই আমার অনুকূলে ছিল না। বাড়িতে থাকতে আমি কখনোই রুটিন ফলোয়ার ছিলাম না। ক্রিকেট ছিল আমার প্রিয় খেলা। খেলার মাঠেই থাকতাম বেশি। আর এই স্কুলটি ছিল একটি পাহাড়ি পরিবেশে। এটাও আমার জন্যে নতুন। আমার বাড়ি হলো মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায়। শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকা একটি গ্রাম, যেখানে অধিকাংশই ক্লাস নাইন টেন পড়ে চলে যায় বিদেশে কাজ করতে, রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে। হয়তো আমিও তা-ই করতাম।

এই স্কুলের কোয়ান্টারা ২৪ ঘণ্টাই রুটিনের মধ্যে থাকে। প্রথমদিকে বাসায় যখনই কথা হতো, আমি বলতাম, ভালো আছি। কিন্তু এ পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে একটু বেগ পেতে হচ্ছিল। আমি এতটা পরিশ্রম ও শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত ছিলাম না। যখন কোয়ান্টামে আসি তখন আমার ওজন ছিল ৪৫ কেজি। তিন মাস পর আমার ওজন হয়েছিল ৩৮ কেজি। এটা ছিল আমার তিন মাসের সংগ্রাম। মনে মনে ভাবতাম, আমাকে পারতেই হবে।

তারপর ক্লাসেও আরেক সমস্যা। বাসায় থাকতে গাইড বই ব্যবহার করতাম। ওখান থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন পড়ে উত্তর করতে পারতাম। তবে আমি কখনোই মুখস্থ করে উত্তর দিতাম না। কিন্তু কোয়ান্টামে নতুন পরিবেশের সাথে সাথে পড়াশোনার স্টাইলও নতুন। কোনো গাইড বই নেই। মানে আমার সবকিছুই যেন শীতকালের গাছের মতো হয়ে গিয়েছিল। আগের সব অভ্যাসগুলো গাছের মরা পাতার মতো ঝরে পড়ছে।

আবার বসন্ত এসে একটা করে নতুন কুঁড়ি তৈরি করছিল। এই পরিবর্তনের অনুভূতিটা আমাকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আমি এখানকার সব কষ্ট ভুলে গেলাম। বাসায় ফোন দিয়ে ভালো আছি বলার শক্তি পেলাম।

তবে গাছের সব পাতা বোধহয় ঝরে গেলেই সাথে সাথে নতুন পাতায় রূপান্তর হয় না। কিছু পাতাকে বোধহয় ভালোই সংগ্রাম করতে হয় নতুন করে শুরু করতে। আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না। কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে আর পড়াশোনায় আমি একদম খারাপ করতে থাকি। আমি ব্যান্ড টিমে ছিলাম। একদম ছোটবেলায় আপুর থেকে গান শিখতাম। যদিও যত বড় হতে থাকি আমার গানের প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যান্ডের তালে সুর মেলাতেই অনেক কষ্ট হয়েছে। আমাদের ড্রাম শেখানোর দায়িত্বে জ্যাকি ভাই ছিলেন। প্রতিদিন অনেকগুলো পুশ-আপ করতে হতো। একদিন তিনি সবাইকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো ড্রামার হতে পারবে তাকে আমার স্টিক দুটো উপহার দেবো। এটা যে আমাকে কী পরিমাণ মোটিভেট করেছিল! আমি মনপ্রাণ দিয়ে ড্রাম বাজানো শুরু করি এবং দক্ষ ড্রামার হয়ে উঠি।

আর লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে সমস্যা হচ্ছিল সেটাকেও জয় করে নিই। এই নিয়ে মজার একটা কাহিনীও আছে। আমাদের সাথেই উজ্জ্বল চাকমাও ভর্তি হয়। সে ক্লাসে টপার ছিল। একদিন সিদ্ধান্ত নিই সে ক্লাসে যা যা করে আমিও তা-ই করব। ও যখন গণিত করত আমিও গণিত করতাম। অথচ সে কিন্তু এসবের কিছুই জানে না! সে যদি এই লেখাটা পড়ে তাহলেই জানতে পারবে প্রথমবারের মতো। সে ইংরেজি পড়লে আমিও ইংরেজি পড়ি। মোদ্দাকথা হুবহু কপি। এমনও হয়েছে, সে একটা বই খুলে এক মিনিট পড়েই সেটা সরিয়ে অন্য একটা বই পড়ছে। আমিও কোনোকিছু না বুঝেই এক বই রেখে অন্য বই খুলে পড়া শুরু করতাম। যখন পরীক্ষা শুরু হলো রেজাল্ট আমার প্রত্যাশার মতোই হতে লাগল।

যখন একবার নিজের গতিটা ধরতে পারলাম, তখন নিজের মতো করে পড়াশোনা শুরু করলাম। তারপর থেকেই আমি আমার রেজাল্ট নিয়ে খুশি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সবসময় কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট অর্জন করতে পেরেছিলাম। ক্যাম্পাসে যখন ঈদ হতো বা পহেলা বৈশাখ হতো তখন কে কত বেশি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে, কে কত বেশি টোকেন পাবে তা নিয়ে দারুণ উত্তেজনা কাজ করত। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা টোকেন পেত। টোকেন দিয়ে মেলায় আনা পণ্য কেনা যেত। মেলাটা দারুণ উপভোগ করতাম। সবাই মিলে একসাথে টোকেন জমিয়ে পার্টি কিংবা যারা টোকেন পায় নি তাদের জন্যে সবাই মিলে টোকেন জমিয়ে কিছু কিনে একসাথে খেতাম। আহা কী সুন্দর! কী মধুর সেই অতীত!

একবার কোয়ান্টামম সেন্টারের নেয়ামাতানে সুন্দর হাতের লেখার প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। গুরুজী দাদু প্রতিযোগিতা দেখতে এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই খুব মনোযোগ দিয়ে আমি লিখছিলাম। সেদিন আমি যখন সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে লিখছিলাম তখন গুরুজী দাদু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। আমার খুব ভালোলাগা কাজ করেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হয়েছিলাম। এটা আমার সবচেয়ে ভালোলাগার একটি স্মৃতি। গুরুজী দাদুর কথা ভাবতেই ভালো লাগে।

আমি গর্ব করেই বলি, আমার বিভিন্ন ধর্মের বন্ধু আছে। যাদের সাথে একসাথে থেকেছি, খেলেছি, খেয়েছি। কত দূরদূরান্তের বন্ধু আছে! কোয়ান্টামে না এলে সারাদেশের এত বন্ধু পেতাম না। অসাধারণ একটা পরিবেশ আমি পেয়েছিলাম। সবাই সবাইকে সাহায্য করে। ভাইয়ের মতো মিলেমিশে থাকা, এই সবই অমূল্য। সবার মধ্যে এত মিল! এত ভালবাসা। এত নিঃস্বার্থতা! এসব বাইরের পরিবেশে তেমন একটা দেখা যায় না। শিক্ষক কিংবা স্পোর্টসের প্রশিক্ষক, সবাই ছিলেন আন্তরিক। ব্রাদাররাও ছিলেন খুবই যত্নশীল। ছোটখাটো সুখী রাজ্য। হ্যাঁ যেন কল্পনার মতো বাস্তব।

আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কেটিং বিভাগে বিবিএ পড়ছি। এখানে আসার পর বাইরের পরিবেশ দেখে সেই ফেলে আসা রাজ্যটাকে খুবই মিস করি। সেখানে মোবাইল না থাকলেও গল্পের বই হাতে নিয়ে বেশ ভালো সময় কাটত। ছুটির দিনে ভোর থেকে সন্ধ্যা অবদি মাঠে থাকতাম আমরা। আহা! আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম সেই সুন্দর দিনগুলোতে। □

যেভাবে সেবা পেয়েছি
ঠিক সেভাবেই সেবা দিতে চাই

ক্যসাজাই মার্মা

ক্রাফট এন্ড ফ্যাশন ডিজাইন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাবার কাজের সুবাদে পরিবারসহ ২০০৬ সালে চার বছর বয়সে কোয়ান্টামমে আসার সুযোগ হয়েছিল। ২০০৭ সালে সূচনা শ্রেণিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে বাবা আমাকে ভর্তি করে দেন। বাবা ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই শিল্পীমনা মানুষ। নানা ভাস্কর্য তিনি বানাতেন। কোয়ান্টামমের রহমভ্যালিতে ঢুকতেই যে হাতির ভাস্কর্যগুলো আছে এগুলো বাবার করা। এছাড়াও তার হাতে গড়া ভাস্কর্য কোয়ান্টামমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আজ বাবা বেঁচে নেই, কিন্তু তার তৈরি শিল্প ঠিকই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এক অন্যরকম আবেদনে। বাবার জন্যেই হয়তো আমার মাঝে শিল্পীসুলভ একটা মনোভাব গড়ে ওঠে একসময়।

ছোট থেকে আমার আঁকাআঁকি করতেই বেশি ভালো লাগত। তার পাশাপাশি কোনোকিছু পর্যবেক্ষণ করতেও আমার ভালো লাগে। এগুলোর মধ্যেই আমি অন্যরকম আনন্দ খুঁজে পাই। ছোট থেকেই আমি কোয়ান্টামমে

কোয়ান্টামমে ভাস্কর্য তৈরিতে মগ্ন আমার বাবা মংবা মার্মা। সাথে মা আছেন। দুইজনই এখন পরপারে। কোয়ান্টামমকে তারা এতই ভালবাসতেন জীবনের শেষ সময়টা তারা এখানেই কাটিয়েছেন।

বড় হয়েছি। সেজন্যে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠ হতে পারি নি। দীর্ঘ ১৩ বছর কাটিয়েছি আমি সেখানে।

এখানেই এইচএসসি সম্পন্ন করেছি। ভেবেছিলাম কলেজ শেষ করে কোয়ান্টাম থেকে ইউনিভার্সিটির ভর্তি প্রস্তুতি নেব। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এটা ছিল আমার জীবনের এক বিপর্যয়। সুতরাং বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলাম। হঠাৎ এভাবে বেরিয়ে যাব ভাবতেও পারি নি। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল নিজের ঘর থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি।

সত্যি বলতে হতাশা, বিষণ্নতা কী সেটা ক্যাম্পাসে থাকা অবস্থায় কখনো বুঝতে পারি নি। যখন কলেজ শেষ করে বেরিয়ে গিয়েছি তখন বুঝতে পেরেছি যে আমার নিজের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। তাই নিজ দায়িত্বে ভর্তি প্রস্তুতি নিলাম। একা প্রস্তুতি নেয়াটা ছিল বড় একটা চ্যালেঞ্জ। ইচ্ছে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব কিন্তু জীবনের প্রথম ব্যর্থতা আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাওয়ার পর। তবুও মন থেকে সবকিছু ভুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কল্পনায় ডুবে ছিলাম।

এক সপ্তাহ পর মোবাইলে একটা মেসেজ দেখে আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মেসেজে লেখা তারিখ অনুযায়ী কালকের মধ্যেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী ধাপে ফরম পূরণ করতে হবে। মেসেজটা দেখে এতদিন পর আবার নতুন করে আশার আলো খুঁজে পেলাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়ার আগে আমি চিন্তায় পড়ে যাই।

কেননা সেখানে মেধাতালিকায় ১৮ জনের মধ্যে থাকতে হবে। আমি কোনোভাবেই ভাবতে পারছিলাম না যে, কীভাবে পজিশনে থাকব, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার জনের মধ্যেও থাকতে পারি নি।

বিশ্বাস এবং পরিশ্রম নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চ ইউনিটে পরীক্ষা দিলাম। তবে একটা বিষয় ভাবতে অবাক লাগছিল যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে যেগুলো নোট করেছিলাম সেগুলোই দেখি পরীক্ষায় চলে এসেছে। পরীক্ষা দিলাম এবং রেজাল্টে আমার রোল নম্বর যথেষ্ট ভালো পর্যায়ে এসেছে। তারপর ব্যবহারিক পরীক্ষা দিলাম, সেটাও ভালো হলো। রেজাল্টের দিনে প্রার্থনা করছিলাম যেন চান্স পেয়ে যাই। পরীক্ষা দেয়ার পর আমার মধ্যে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আমি চান্স পাব। নিজেই অবাক হয়ে দেখলাম যে, আমি ১৬ তম হলাম, যেখানে চান্স পাওয়াটা আমার জন্যে সবচেয়ে কঠিন ছিল। সাফল্যের এই সংগ্রামে লেগে থাকার শক্তিই জীবনের এক শ্রেষ্ঠ উপহার।

কোয়ান্টা জীবনে স্মরণ করার মতো বিষয় হলো আমার বন্ধুরা। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকায় নিজেকে কখনো একা মনে হয় নি। তাদের বন্ধুত্ব আর সহমর্মিতা কখনো একা হতে দেয় নি। উচথোয়াই, জুয়েল, গোল্ডেন তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব সেই সূচনা শ্রেণি থেকে। কোয়ান্টামে স্কুল জীবন শেষ হলেও এই বন্ধুত্ব থাকবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

গুরুজী দাদুর সাথে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে। বোর্ড পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় এবং আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার সময়ও তিনি আমাদের দোয়া করে দিয়েছিলেন। ২০১৮ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল প্রথমবারের মতো ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হয়। আমাদের এই সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ভলিবল কোচ বজলুর রশীদ স্যার। কেননা আমরা যে-রকম পরিশ্রম করেছি, তিনি তার থেকেও অনেক বেশি পরিশ্রম করেছেন। তাই স্যারের জন্যে মন থেকে দোয়া চলে আসে।

আমার জীবনের মনছবিটা আমারই মতো। আমি একজন সৃজনশীল শৈল্পিক মনের অধিকারী সফল ব্যক্তি হতে চাই। কোয়ান্টামের সেবায় ছোট থেকে বড় হয়েছি। আমি নিজে সেবাদানে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। সেজন্যে আমি সবসময় নিজেকে অন্যের সেবায় নিয়োজিত রাখব। □

ডিসিপ্লিন মেনে চলা কঠিন হলেও এটাই সবচেয়ে ভালো দিক

জেমি বড়ুয়া

ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স বিভাগ, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

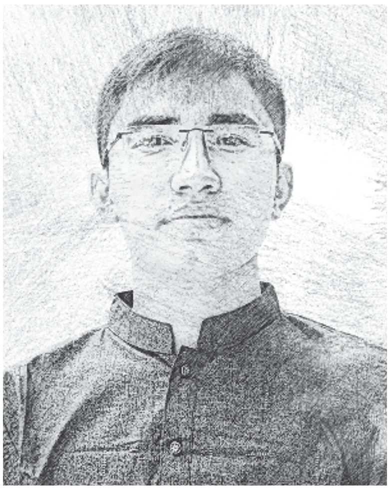

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তির জন্যে প্রথম পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি পাঁচ বছর বয়সে। কিন্তু তখন ভর্তি হতে পারি নি। কারণ ততদিনে আমার বড় দুই ভাই এই স্কুলে লেখাপড়া করছিল। যেহেতু কোয়ান্টাম বঞ্চিত শিশুদের সুযোগ দিয়ে থাকে, তাই আমার বড় দুই ভাই থাকার কারণে আমার জায়গায় অন্য কোনো পরিবারের শিশুকে সুযোগ দিলেন তারা। শিশুশ্রেণিতে ভর্তি হতে না পারায় আমি বাড়িতে লেখাপড়া শুরু করি। কোয়ান্টামের পড়ালেখার পরিবেশ ভালো—এটা ছোট থেকেই বড় ভাইদের কাছ থেকে জেনেছি আর পরে নিজেও দেখেছি। আমার মেজো ভাই জ্যাকি এখানে অনেক ভালো রেজাল্ট করত, সেটা আমাকে ও আমার মা-বাবাকে বেশ অনুপ্রাণিত করত।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। এরপর ২০১৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে এই স্কুলে ভর্তি হই। তখন ১২ বছর বয়স আমার। মা-বাবা অনেক আশা নিয়ে আমাকে ভর্তি করিয়েছিলেন।

স্কুল-কলেজের যে-কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি গান গাইতাম।

শুরু হলো কোয়ান্টা জীবন। প্রথমদিকে মানিয়ে নিতে কষ্ট হলেও আমি নিজেকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে আমি ভালো রেজাল্ট করে ২০১৯ সালে লামা উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছিলাম। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের সাত বছরের শিক্ষাজীবনে আমি যা পেয়েছি সেগুলোই আমার জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা হয়ে আছে।

যদিও কোয়ান্টামের ডিসিপ্লিন মেনে চলা অনেক কঠিন, তারপরও এটাই সবচেয়ে ভালো দিক বলে আমি মনে করি। কারণ ডিসিপ্লিন না থাকলে কোনোকিছু করা যায় না। লেখাপড়া, খেলাধুলা, শারীরিক-মানসিক ফিটনেস সবকিছুর একটা ব্যালেন্স করা যায় এই ডিসিপ্লিন দিয়ে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যে মেডিটেশন আর মনছবি দেখা শিখেছিলাম, সেগুলো আমাকে আজীবন সহযোগিতা করবে। আমি প্রতিদিন সকালে শিথিলায়ন আর বিকেলে মনছবির মেডিটেশন করি। মেডিটেশনে বসে শিথিল প্রক্রিয়ায় যে-কোনো সিদ্ধান্ত আর লেখাপড়ার জন্যে সঠিক রুটিন সহজেই করা যায়। বাইরে আর কোয়ান্টামের পরিবেশের মধ্যে তুলনা করলে আমরা দেখি—শৃঙ্খলার সাথে পড়ালেখা, শারীরিক-মানসিক ও সামাজিকভাবে নিজেকে ফিট রাখা খুবই কঠিন, যা কোয়ান্টামে খুব সুন্দরভাবে শেখানো হয়।

গুরুজী দাদুকে আমার খুব ভালো লাগে। তার সাথে আমার একটা স্মৃতি রয়েছে। আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। কোয়ান্টামের নিয়ম হচ্ছে পাবলিক

পরীক্ষার সময় কোয়ান্টারা কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নেয় না। আমি ভলিবল খেলোয়াড় ছিলাম। ঐ সময় আমাদের স্কুলে ভলিবল নতুন যুক্ত হয়েছে। অন্য খেলাগুলোতে কসমো স্কুল চ্যাম্পিয়ন হলেও ভলিবলে তখনো ভালো ফলাফল আসে নি। আমি ও আমার দুই বন্ধু এসএসসি পরীক্ষার্থী হওয়ায় প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের বাদ দিতে বলা হলো।

কিন্তু আমাদের ভেতর সংকল্প ছিল আমরা জাতীয় আন্তঃস্কুল ভলিবলে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলকে একবার হলেও চ্যাম্পিয়ন করাবই। আমরা নিজেদের উদ্যোগে গুরুজী দাদুকে চিঠি লিখলাম। এর মাঝে তিনি একদিন আমাদের হিকমান ক্যাম্পাসে এলেন। আমাদের সবাইকে ডাকা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে জেমি কে? আমি বললাম আমিই জেমি। তখন তিনি আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করে বললেন যে, 'আপনি আন্তঃস্কুল ভলিবলে অংশ নেন, কোনো সমস্যা নেই। ভালো কিছু হবে।' আসলে এই শুভকামনার চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে না। কাঙ্ক্ষিত সাফল্যও পেয়েছিলাম।

ভলিবলের পাশাপাশি আমি গান গাইতাম। সংগীত চর্চা আমার আরেকটি শখের জায়গা।

বর্তমানে আমি রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স বিভাগে অধ্যয়ন করছি। এখন মনছবি দেখি—আমি এখানে এই বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করব।

নিজের এলাকা লামা এবং আলীকদমে অবহেলিত মানুষদের নিয়েও আমার মনছবি রয়েছে। নিজের মানুষের কল্যাণ সাধনার এই অনুভূতি ও মনছবি দেখার অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলাম গুরুজী দাদুর কাছ থেকে। □

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছেটা দৃঢ় ছিল

মংছাইনু মার্মা
ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৪ সালে আমার বয়স ১৩ বছর। বাবা একদিন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কথা বললেন। স্কুলটি আবাসিক এবং লেখাপড়ার মান ভালো। জানলাম খেলাধুলা ও লেখাপড়ায় এই স্কুল প্রথম হয়। মনে মনে ভাবছিলাম যাক—এবার একটি ভালো স্কুলে পড়ব। কিন্তু যখন জানতে পারলাম এই স্কুলে বেশি ছুটি দেয়া হয় না, তখন আর ভর্তি হতে চাই নি। বাবাকে ঐ সময় কিছু বলতে পারি নি। শুধু মনে মনে ফন্দি করলাম, ভর্তি পরীক্ষা এতটাই খারাপ দিব যেন ওরা আমাকে বাদ দিয়ে দেয়।

নির্দিষ্ট দিনে ইন্টারভিউ পরীক্ষা হলো। আমি চান্স পেয়ে গেলাম। কিছুদিন পর বাবা ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। মন খারাপ হয়ে গেল। বান্দরবানের আলীকদমে যেখানে আমাদের বাড়ি সেখানে আশেপাশে একটি ভালো স্কুল পাওয়া বিরল ঘটনা। তাই কোয়ান্টামের যত সুনাম শুনেছেন আমার বাবা, তিনি তো আর এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। কোয়ান্টামে এসে এখানকার নিয়মকানুন মেনে চলতে আমার খারাপ লাগত। কারণ আমি তো

আগে ইচ্ছে হলে পড়াশোনা করলে করতাম, না করলে নাই। গাইড করার মতো কেউ ছিল না।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে আমার নির্ধারিত স্পোর্টস হলো কাবাডি। আমরা ২০১৯ সালের আন্তঃস্কুল কাবাডিতে সম্ভবত দীর্ঘ ৪০ বা ৪৫ বছর পর বকুল অঞ্চলের প্রতিনিধি হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আর সিলেট নিয়ে বকুল অঞ্চল। কোয়ান্টা থাকা অবস্থায় অনেক ঘটনার মধ্যে এটি অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে কতটা ভালো ছিলাম, তা এখন বাইরে এসে একা একা থাকা আর সবকিছুর সাথে সংগ্রাম করে চলতে গিয়ে বুঝতে পারছি। এখন নিজের খরচসহ সবকিছুর জন্যে নিজেকেই চিন্তা করতে হয়। জীবন কতটা কঠিন আর দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে সেটা বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু কোয়ান্টামে থাকতে কখনোই তা বুঝতে পারি নি। কারণ স্কুলে সবকিছু আমাদের জন্যে প্রস্তুত থাকত। খাবার থেকে শুরু করে বই-খাতা, কলম-পেন্সিল, পোশাক-পরিচ্ছদ মানে যা যা লাগে সবকিছু। আসলে আমরা কোয়ান্টামে অনেক মমতা আর ভালবাসা পেয়েছি।

আমি যদি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ না পেতাম তাহলে আমি হয়তো বড়জোর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করতাম। বিশ্ববিদ্যালয় কী চিনতামও না। তাই আমি কোয়ান্টামের কাছে কৃতজ্ঞ। স্কুলে থাকা অবস্থায় আমাদের ছাত্রদের কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করানো হতো। সেই সুবাদে সিলেটে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথডের ৪০০ তম কোর্সে অংশ নিই আমি। এই কোর্স অন্য সবার মতো আমার জীবনেও এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমি প্রথম গুরুজী দাদুকে কাছ থেকে দেখি।

একে একে আমি স্কুলের পাঠ শেষ করে ২০২০ সালে উচ্চ মাধ্যমিকও শেষ করলাম। লেখাপড়ায় আমি খারাপ ছিলাম না। কলেজে উঠতেই আমার প্রথম ইচ্ছে ছিল বুয়েটে পড়ব। তাই কলেজের প্রথম থেকে বুয়েটকে লক্ষ্য রেখে অল্প অল্প করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমাদের কলেজ থেকেই ভর্তি প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু করোনা মহামারির জন্যে আমাদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো। নিজের মতো করেই ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু বাড়িতে আমাকে মেডিকেলের জন্যে উৎসাহ দিচ্ছিল বার বার। কারণ গ্রামে উচ্চতর লেখাপড়া মানে ডাক্তারি পড়াটাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তারপরও আমি আমার পছন্দ আর ভালোলাগাকে গুরুত্ব দিয়েছি।

এইচএসসি রেজাল্ট বের হলো। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়ার জন্যে যে রেজাল্ট প্রয়োজন সেটা আমার নেই। এক পয়েন্ট কম আছে। বুয়েট, রুয়েট, চুয়েট কোনোটাতেই আমি পরীক্ষা দিতে পারলাম না।

কিছুই ভালো লাগছিল না। ভেঙে পড়েছিলাম। প্রস্তুতি নেয়া ছেড়ে দিলাম। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলাম। সেখানেও চান্স পেলাম না। আরো ভেঙে পড়লাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক পরিচিত বড় ভাই থাকলেও, মন ভেঙে যাওয়ায় ফরমও তুললাম না।

এর মাঝে আমার মনে হলো কোয়ান্টামে তো আমি সবসময় আশাবাদের চর্চা করেছি। তাহলে আমি এখন এত হতাশ কেন? আমার ইচ্ছে ছিল বুয়েটে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। কিন্তু হলো না, তাতে কী! এই মুহূর্তে কী করতে পারি এটা নিয়ে চিন্তা করলাম। আমার সামনে তখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গুচ্ছ পরীক্ষা বাকি। আমাদের সময় ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত গুচ্ছ পরীক্ষা হয়েছিল। সেখানে আবেদন করলাম। তবে তখনো আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পড়লে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব। শেষ চেষ্টা চালালাম। ভগবানের কৃপায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলাম। সাবজেক্ট পেলাম ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং।

এখন আমি ভাবি—শুধু আমি শিক্ষিত হলেই হবে না। আমার মার্মা সম্প্রদায়কেও শিক্ষিত হতে হবে। আমাদের এলাকার অধিকাংশ ছেলেমেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে আর পড়ালেখা করে না। ন্যূনতম বেতনে একটা চাকরি পেলেই সন্তুষ্ট। এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানোর জন্যে আমি কাজ করছি এখন। তাই আমার মনছবি হলো নিজের সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ উন্নয়ন করা। আমি জানি এর জন্যে প্রথমে নিজেকে একটা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। না হলে মানুষ আমার কথা শুনবে না।

সবকিছুর জন্যে বাবাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার আজকের দৃষ্টিভঙ্গি আর জীবন সম্পর্কে এই মূল্যবোধ কখনোই হতো না, যদি আমার বাবা আমাকে কোয়ান্টামে না আনতেন। □

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে চাই

আব্দুর রাব্বি তোতা

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

গল্পের বই পড়ার আগ্রহ আমার ছোটবেলা থেকেই। অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের বিজ্ঞান কল্পকাহিনীগুলো ছিল আমার খুব প্রিয়। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে এই বইগুলো নিয়ে পড়তাম আর ভাবতাম—আমিও যদি এই কল্পকাহিনীর মতো রোবট বানাতে পারতাম! সেই সূত্রে আমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), ডিপ লার্নিং এসব শেখার প্রতি প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কী জিনিস সেটা সম্পর্কে যখন ধারণা পাওয়া শুরু করি, তখন থেকেই আমি প্রোগ্রামিংয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ি। ধীরে ধীরে আমার মনছবি তৈরি হয় আমি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ব।

কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এক্সট্রা কারিকুলাম হিসেবে আমাকে প্রথম ব্যান্ড বাদনে দিলেও পরে যখন বিজ্ঞান ক্লাব নতুনভাবে চালু হয়, তখন আমাকে বিজ্ঞান ক্লাবে দেয়া হয়। ইলেকট্রনিক্সের সাথে পরিচিত হই তখন থেকেই। জহুরুল হক স্যারের তত্ত্বাবধানে আমরা অনেক ইলেকট্রনিক্সের প্রজেক্ট

বানিয়েছিলাম। সিকিউরিটি অ্যালার্ম, ফায়ার অ্যালার্ম, লাইন ফলোয়ার রোবটসহ আরো বিভিন্ন প্রজেক্ট। শুধু ইলেকট্রনিক্সই নয়, পদার্থবিজ্ঞানের চমৎকার চমৎকার সব এক্সপেরিমেন্টও আমরা করতাম। এসব এক্সপেরিমেন্টে আমাদের সহযোগিতা করতেন সুজন স্যার, মুক্তা ম্যাডাম এবং রাসেল স্যার।

প্রতি শুক্রবার আরিফ স্যারের তত্ত্বাবধানে হতো গণিতের স্পেশাল ক্লাস। এই ক্লাসে গণিতের মজার মজার সব ধাঁধা এবং মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হতো, যার কিছুই পাঠ্যবইতে ছিল না। স্যার আমাদের গণিত অলিম্পিয়াডের প্রশ্ন সমাধান করতে দিতেন। এটা এমন একটা ক্লাস ছিল যেখানে কারো একঘেয়ে লাগত না। ক্লাসটা ছিল সবার জন্যে উন্মুক্ত। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল স্কুল ও কলেজ জীবন।

এইচএসসি-তে ভালো প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও অটোপাশের কারণে এইচএসসির জিপিএ কিছুটা কম আসে। কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিলাম। দুটোতেই অপেক্ষমাণ তালিকায় ছিলাম তাও আবার পেছনের দিকে। তারপর গুচ্ছ ইউনিভার্সিটি ভর্তির প্রস্তুতি নিলাম এবং পরীক্ষা দিলাম। আল্লাহর রহমতে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট চলে এলো। আমি এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ছি। কিন্তু এর পেছনে একটি গল্প আছে।

করোনা পরিস্থিতির কারণে কলেজ থেকে আমাদের ছুটি দেয়া হলো। তারপর কিছুদিনের মধ্যে ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সময় চলে এলো। এই শিশুকাল থেকে এইচএসসি পর্যন্ত, দীর্ঘসময় কোয়ান্টামে পড়ার পর বাইরের পরিবেশের সাথে তাল মেলানো ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও সব পরিস্থিতি মোকাবেলা করা আমরা স্কুলে থাকতেই শিখেছিলাম। তবুও বাস্তব জ্ঞান সবসময় ভিন্ন।

আমি আইসিটি বিষয়টি খুব ভালো পারতাম। কলেজে একবার আইসিটি স্যার ছিল না। তখন আমি আমার সহপাঠীদের আইসিটি পড়াতাম। সি প্রোগ্রামিং সবার কাছে কঠিন হলেও আমি সবাইকে সহজভাবেই বোঝাতাম। একপর্যায়ে শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় বাবা আমার পাশে ছিলেন। আমি একাই যেতে পারতাম। কিন্তু তারপরেও বাবা আমার সাথে গিয়েছিলেন যাতে আমি মনোবল না হারাই।

পরীক্ষার আগে আমি ভেবেছিলাম গণিত আমার মেইন সাবজেক্ট তাই ভর্তি পরীক্ষায় গণিত অংশ থেকে অবশ্যই উত্তর দিতে হবে। এজন্যে আইসিটি

ভালো পারার পরেও আমি আইসিটি থেকে কোনো নৈর্ব্যক্তিকের উত্তর দেই নি। কিন্তু গণিত প্রশ্নগুলো কঠিন ছিল। সমাধান করতে সময় লাগছিল, তাই সবগুলোর উত্তর সময়ের সাথে দিয়ে উঠতে পারি নি।

আবার মন খারাপ হলো। আরো বেশি খারাপ লাগল যখন জানতে পারলাম—গণিত না দাগালে কোনো সমস্যা হতো না। আইসিটি দাগালেও চলত। কেন আমি এই ভুল করলাম! চোখে পানি চলে এলো। বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে। আফসোস কোরো না। এখন তো আর চাইলে কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু আমার জীবনে একটা মিরাকল ঘটে গেল। দেখা গেল এই ভুল করার কারণেই পছন্দের সাবজেক্টটি পেলাম। কারণ গণিত দাগানোর জন্যেই আমি সাবজেক্ট চয়েজে আমার কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্টটি দিতে পেরেছি এবং শেষ পর্যন্ত আমি নির্বাচিত হতে পেরেছি। এই সময়টা আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তখন আমি শুধু প্রার্থনা করতাম আর মেডিটেশন করতাম নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে।

তিন ভাইবোনের মধ্যে আমি সবার ছোট। ছোটবেলা থেকেই মা-বাবা আমাকে নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন দেখতেন। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর প্রতি মাসের শেষ শুক্রবার কখনো বাবা আবার কখনো মা আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। আমাকে বলতেন, বড় হয়ে তুমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হবে। এখন মনে হয় আমি তাদের সেই স্বপ্ন পূরণের পথে আছি।

এই স্বপ্ন হয়তো স্বপ্নই থেকে যেত যদি আমি এই স্কুলে না পড়তাম। কারণ সেই ২০০৮ সালে যখন আমি প্রথম কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে আসি, তখন বয়স পাঁচ বছর হবে। তখন থেকে আমার শিক্ষাজীবন শুরু। বাবা ভালোমতোই জানতেন—আমাকে এমন একটি স্কুলে না দিলে তার পক্ষে প্রচুর অর্থ খরচ করে এভাবে পড়ানো সম্ভব হবে না। আমি ভর্তি হয়েছিলাম প্রথমে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের অনাবাসিক শাখায়, সেটা বর্তমানে বোধিছড়া পাবলিক স্কুল নামে পরিচিত। অনাবাসিক শাখা হলেও সমস্ত কার্যক্রম—পড়ালেখা, প্যারেড, ডিসপ্লে একইসাথে হতো। সেখানে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর ২০১৩ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের আবাসিক সেকশনে ভর্তি হই।

আর সেই বছর আমি প্রথম কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। কোর্স করার পর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছাটা আমার মনছবিতে পরিণত হয়। নিয়মিত

মেডিটেশন করতাম। সাদাকায়ন, আলোকায়নে অংশগ্রহণ করতাম। আর ভাবতাম আমার মা-বাবার স্বপ্ন আমি পূরণ করব।

আমি এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করতে চাই। এটাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেন ব্যবহৃত হয় সৃষ্টির কল্যাণে। কারণ আমি মনে করি শিক্ষিত হওয়া বা গবেষণা করা তখনই ফলপ্রসূ হয় যদি সেটা মানুষের কল্যাণে কাজে লাগে।

আমি এমন একটি জিনিস বানালাম যেটা বানানোর পেছনে কোনো কল্যাণ চিন্তা নেই বা সেটা সমাজ বা দেশের কোনো উপকার করতে পারে না, তাহলে লাভ কী! যেমন, আমি প্রোগ্রামিং করে এমন একটি অনলাইন গেম বানালাম যেটার প্রতি আসক্ত হয়ে কিশোর-তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে। এতে হয়তো অর্থ উপার্জন হবে, কিন্তু নৈতিক মানদণ্ডে আমি ব্যর্থই থেকে যাব। তাই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি—আমি যেন আমার মেধাকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে পারি। □

দেশের দুর্গম জায়গাটি পরিণত হলো আলোকিত জনপদে

সামসন বম
মৃৎশিল্প বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

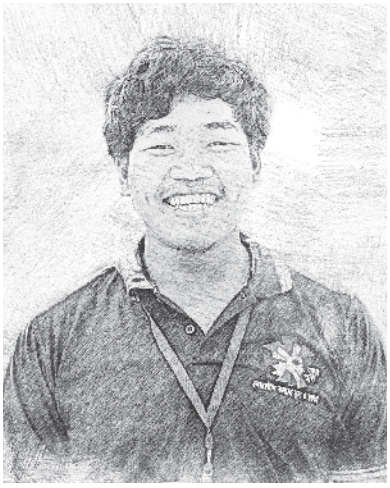

আমি সামসন বম। আমার আরেকটি পরিচয়—কোয়ান্টা নম্বর ১৫৭। আমি বান্দরবানে রোয়াংছড়ি উপজেলার পাইক্ষ্যং পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমি কৃষক পরিবারের সন্তান। আমার বাবা ২০০৬ সালে এক দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন আমি খুব ছোট। সে-সময় পরিবারে নেমে আসে অন্ধকার। তখন আমার মা খুব কষ্ট করে আমাদের দুই ভাইকে নিয়ে থাকতেন।

আমার বড় ভাই ভানরাম বম। আমার আগে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হন তিনি। এরপর ২০০৭ সালে আমি ভর্তি হই। তারপর শুরু হয় আমার কোয়ান্টা জীবন। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ থেকেই আমি পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেছি।

বড় ভাইও এখান থেকে এইচএসসি শেষ করে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশনের প্রস্তুতির সময় ভাই আমার পাশে সবসময় ছায়ার মতো ছিলেন, এজন্যে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এছাড়াও

ছোটবেলায় আমি আর বড় ভাই (ডানে)

আমার ও পরিবারের জন্যে ভাই অনেক কষ্ট করেছেন। সে বরাবরই একজন ভালো হ্যান্ডবল খেলোয়াড়। স্কুলে থাকতেও ভালো খেলেছে, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলে অর্জিত অর্থ মাকে প্রায় সময় পাঠান। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—আমাদের দুই ভাইয়ের এই সম্পর্কটা যেন সারাজীবন অটুট থাকে।

আমি প্রায় ১৪ বছর কোয়ান্টামে থেকেছি। ফলে অনেক কিছু শিখেছি। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি ধ্যানের মাধ্যমে নিজের মনছবিকে স্থির করা। আসলে একজন মানুষকে বড় কিছু করতে হলে অবশ্যই লক্ষ্যস্থির করা প্রয়োজন।

তাই বলে জীবনকে উপভোগ করতে কার্পণ্য করি নি। ছোটবেলায় বন্ধুদের সাথে খুব মজা করেছি। মাঝে মাঝে ভাবতাম সেই অতীতের সময়টা যদি আবার ফিরে পেতাম! ক্যাম্পাসে আমি সবসময় হাসিখুশি থাকতাম। সেইসাথে বন্ধু, সহপাঠী, সিনিয়র, জুনিয়র যারই মন খারাপ থাকত, সুযোগ পেলে তার কাছে গিয়ে হাসির কথা বলে তার মন ভালো করে দিতাম।

আমি ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এবং উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিই। মনছবিও ছিল যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাব এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলার মৃৎশিল্প বিভাগে চান্স পেয়েছি। আমি এখান থেকে ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু করতে চাই। আমি পড়াশোনা শেষ করে নিজেকে সৃষ্টির সেবায় উৎসর্গ করতে চাই। এছাড়া আমি জীবনের অন্যান্য দিকগুলোতেও সাফল্য অর্জন করতে চাই।

কোয়ান্টামমে আমার একটা মজার কাহিনী আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে—আমি যখন ২০০৭ সালে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসি তখন আমার ছোট চাচার সাথে আসি। তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। তেমন কোনো যানবাহন পাওয়া যেত না। তারপর আবার পায়ে হেঁটেও যেতে হতো অনেকটা রাস্তা। তখন আমিরাবাদ থেকে কোয়ান্টামম পর্যন্ত আসতে প্রায় সারাদিন লেগেছিল আমাদের। কিন্তু এখন যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতি হওয়ায় ঘণ্টাখানেক সময়ও লাগে না। আগের চিত্র আর এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কোয়ান্টামম এখন অনেক উন্নত। আসলে শূন্য থেকে শুরু হওয়া একটি জায়গা কীভাবে ফুলে-ফলে বিকশিত হলো, এটা আমি আমার চোখের সামনে দেখলাম। দেশের দুর্গম একটি জায়গা পরিণত হলো আলোকিত এক জনপদে। দিন দিন যার আলো আরো ছড়িয়ে পড়ছে। এখনই যদি কোয়ান্টামমের আলো এতটা ছড়াতে পারে, তাহলে আরো ১০ কিংবা ২০ বছর পর কী হবে তা ভাবতে অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করে। □

ঋণের দুষ্টচক্রের ভয়াবহতা আমি দেখেছি

মো. ইমন বিশ্বাস

ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

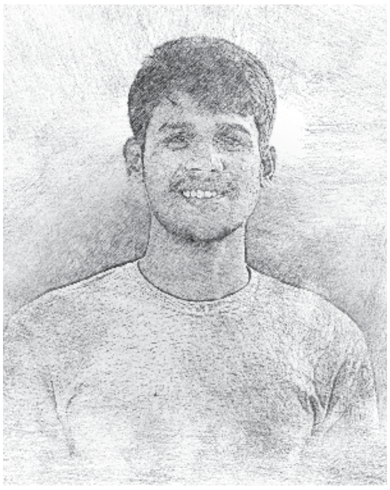

মা-বাবা ও তিন ভাইকে নিয়ে আমাদের পরিবার। পরিবারের ভরণপোষণ বাবা একাই করতেন। বাবা ছিলেন একজন দিনমজুর। কখনো মাছ ধরে, কখনো অন্যের জমিতে কাজ করে তার আয় রোজগার হতো। তাই বাবার পক্ষে পরিবারের সবার মুখে প্রতিদিন তিন বেলা খাবার তুলে দেয়া সহজ ছিল না।

আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। অভাব-অনটন লেগেই থাকত। এভাবে আর কতদিন চলে? হয়ে গেল একগাদা ঋণ। বাড়ি ভাড়া বাকি, দোকানে চাল-ডালের টাকার ঋণ, এই ঋণ, সেই ঋণ করে বাবা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। পরিবারে সবসময় ঝগড়া, কথা কাটাকাটি এবং অশান্তি লেগেই থাকত। মাঝে মধ্যে তো মা আমাদেরকে নিয়ে নানা বাড়ি চলে যেতেন। আমরা ছোট ছিলাম। একবার মা বড় ভাইকে নানা বাড়িতে রেখে দিলেন। বাবা ঋণের চাপে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলেন। পাড়ি জমালেন ঢাকায়।

উদ্দেশ্য একটাই—যেভাবে হোক ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আমার বাবার সেই আশাও পূরণ হলো না। খেয়ে না খেয়ে থাকতে হলো ঢাকায়। গ্রামের বাড়িতে আর ফেরা হলো না। তাই সপরিবারে চলে এলাম নানা বাড়ি। সেই ঋণ পরিশোধের তাগিদে বাবা আবার নতুনভাবে শুরু করলেন। এবারও তিনি হতাশ হলেন। ঋণের দায়ভার থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না। বরং পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে লাগল। এদিকে আমার বড় দুই ভাই লেখাপড়া ছেড়ে ভবঘুরে হয়ে বেড়ানো শুরু করল।

হঠাৎ করে বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেল। মেজো ভাই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ল। আমাকে বাবা কাজে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মা দিতে চান নি। মা আমাকে পড়তে উৎসাহ দিতেন এবং বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখাতেন। কোনোদিন না খেয়ে, কোনোদিন শুধু পান্তাভাত বা কলা-রুটি খেয়ে থাকতে হতো। কিন্তু পড়ালেখার প্রতি আমার আগ্রহ কমে নি। এভাবে চলতে চলতে ঋণের চাপে পরিবারটা একদম ভেঙে গেল। পরিবার বলতে আর কিছুই রইল না। এরই মধ্যে আমি অষ্টম শ্রেণি পাশ করে ফেললাম। কিন্তু এরপর কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

আমাদের গ্রাম থেকে একজন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি আমাকে সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্যে বললেন। আমিও ভাবলাম এবার ভালো কিছু একটা হতে পারে। নবম শ্রেণিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ পেলাম। মা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। মা আমাকে সবসময় বলতেন, বাবা! আমার যদি সামর্থ্য থাকত আমি তোমাকে ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াতাম। এখন মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা মায়ের সেই আশা পূরণ করেছেন।

ছোটবেলা থেকে যে-সব প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাববোধ করেছি, তার সবই এই স্কুলে পেলাম। বরং প্রত্যাশার চেয়েও বেশি পেয়েছি। পেলাম আদর্শ শিক্ষকদের। এখানকার প্রত্যেকটা নিয়মকানুন আমাকে অভিভূত করল। নতুনভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর থেকে আমার জীবন নতুন মোড় নিল।

আসলে প্রত্যেকের জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট থাকে। আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ছিল কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। নিয়মিত মেডিটেশন করতে লাগলাম। মনছবি ঠিক করলাম। আর বুঝে গেলাম কীভাবে জীবনকে সাজাতে হয়। পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও আমার ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। তাই দুইটাতেই ভালো করার চেষ্টা করতাম। জাতীয় পর্যায়ের খেলা ও এসএসসি

পরীক্ষা যখন একসাথে চলে এলো, আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। কী করব? পরক্ষণেই নিজের ওপর বিশ্বাস রাখলাম, আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে। পরীক্ষা ও খেলা দুইটাতেই ভালো করলাম। পরীক্ষায় বৃত্তিও পেলাম। ফলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।

জীবন শুরু করলাম আবার নতুন উদ্যমে। এবার লক্ষ্য ঠিক করলাম আরো ভালো কিছু করার। কিন্তু চলে এলো করোনা মহামারি। পড়ালেখায় বেশ খানিকটা ছেদ পড়ল। পরীক্ষা হলো সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে। প্রস্তুতিও নিলাম তাড়াহুড়ো করে। ভালো কিছু হবে বলে মনে আশা ছিল। আশা পূরণ হলো। জিপিএ-৫ পেলাম।

এবার মনে প্রশ্ন জাগল, কোচিং কোথায় করব? সামনে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা। অনেক বন্ধু ঢাকায় চলে গেল কোচিং করতে। কেউ কেউ বাড়ি গেল নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিতে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ক্যাম্পাসেই থেকে যাব। শুরু করলাম প্রস্তুতি।

কিছুদিন পরই আমি কিছুটা অসুস্থ হলাম। তিন মাস তেমন কোনো পড়ালেখা করতে পারি নি। পরীক্ষা চলে এলো। কী আর করব? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। ইংরেজি লিখিত পরীক্ষায় এক নম্বরের জন্যে চান্স পেলাম না। মন ভেঙে গেল। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তাহলে আমি কি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় হেরে যাব? শিক্ষকেরা উৎসাহ দিলেন, আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে বললেন। পরের পরীক্ষাগুলো ভালো করতে হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ৩৩৩ তম স্থান অর্জন করলাম। আলহামদুলিল্লাহ!

এসএসসি পরীক্ষায় বৃত্তি, এইচএসসি-তে জিপিএ-৫ এবং নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া পর্যন্ত সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কারণে। আসলেই একটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে যদি প্রয়োজনীয় সুবিধা দেয়া হয়, তাহলে সে-ও বড় কিছু করতে পারে। এর দুর্দান্ত দৃষ্টান্ত বোধহয় আমি নিজেই। আর আমার এই সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো নিয়মিত মেডিটেশন। মনছবি মেডিটেশনে জীবনের লক্ষ্য অবলোকন করছি ক্লাস নাইন থেকে। তাই 'মনছবি মেডিটেশন' আমাকে বাকি সবার থেকে এগিয়ে রেখেছে। পরীক্ষা সবাই দেয়। কেউ ভালো করে আবার কেউ খারাপ করে। আসলে এই ভালো ও খারাপ ফলাফলের পেছনে রয়েছে মনছবির ক্ষমতা। সুনির্দিষ্ট মনছবি থাকলে সাফল্য আসবেই।

এখন আমি নিজেকে নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন দেখি। বাঁচাতে চাই ঋণ-কিস্তির দাবানলে পড়া আমার পরিবারকে। কারণ এর ভয়াবহতা আমি দেখেছি। ঋণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে সমাজকে সচেতন করতে চাই। কারণ গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো এ সম্পর্কে একদম সচেতন নয়। তারা প্রতিনিয়ত ঋণ করে বিপদ ডেকে আনছে নিজের এবং তার পরিবারের জীবনে। আর চাই একজন আদর্শ মানুষ হতে। করতে চাই দেশ ও মানুষের সেবা। এ সকল স্বপ্ন আমাকে দেখতে শিখিয়েছে আমার প্রিয় কোয়ান্টাম, যার সংস্পর্শে এসে লাভবান হয়েছে বিভিন্ন জাতিধর্মবর্ণের মানুষ। সেইসাথে আমিও।

আর হ্যাঁ, আমি তো বেশ বড় হয়েই এখানে এসেছিলাম। তাই বাড়ি থেকে দূরে থাকা, নিজ এলাকার বাইরে থাকা আমার জন্যে একটু কষ্টকর ছিল। কিন্তু ক্যাম্পাসের শিক্ষকেরা এত ভালো যে, আমি তাদেরকে নিজের মা-বাবার মতো শ্রদ্ধা করতাম। তারা আমাকে আগলে রেখেছিলেন নিজের মা-বাবার মতো করে। তাই একটা নতুন পরিবার পেয়েছি। এই কয়েক বছর বেশ ভালোভাবেই থেকেছি। আমার জীবনে সাফল্যের এ ফল্গুধারা যেন বহমান থাকে এজন্যে আমি দোয়াপ্রার্থী। আরো বড় সাফল্য অর্জন করতে চাই। সবকিছুর জন্যে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই। □

আজ মা থাকলে খুব খুশি হতেন

উটিংমং চাক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাক অন্যতম। এই জনগোষ্ঠীর একটি পরিবারে আমার জন্ম। নাইক্ষ্যংছড়ির মধ্যম চাক পাড়া গ্রামে আমার পরিবারের বসবাস। তিন ভাইবোনের মধ্যে আমি সবার বড়। আমার বাবা একজন জুমচাষী। দাদা-দাদি, মা-বাবা ও তিন ভাইবোনসহ আমরা একসাথে থাকতাম। অর্থের অভাবে আমার বাবা যখন আমাদের পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের খোঁজ পান। নিখরচায় আলোকিত মানুষ গড়ার এই সুযোগ পেয়ে বাবা আমাকে ভর্তি পরীক্ষার জন্যে নিয়ে আসেন এখানে। আমি এই পরীক্ষাতে মনোনীত হই। আমার বয়স তখন পাঁচ হবে।

এটা ছিল ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের কথা, তারিখটা ঠিকভাবে মনে পড়ছে না। আমি কোয়ান্টামে সূচনা শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। আমি নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করলাম। আমরা যখন ভর্তি হই তখন খুব কম শিশুই বাংলা বুঝত ও বলতে পারত। এতে আমাদের যে-রকম অসুবিধা হতো তেমনি স্যার, ম্যাডাম আর সিস্টারদেরও অসুবিধা হয়ে যেত।

তাই আমাদের সবসময় চোখে চোখে রাখা হতো।

ক্লাস ওয়ানের মজার একটি ঘটনা বলি। আমার নিচের পাটির একটা দাঁত কয়েকদিন ধরে ব্যথা করছিল। দাঁতটি পড়ে যাবে যাবে অবস্থা। তাই এক বড় ভাইয়ের কাছে গেলাম। ভাই আমার দাঁত তুলতে গিয়ে উল্টো ঠেলে গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। অনেকক্ষণ কাশি দিয়েও যখন বের হলো না তখন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। তবে এতে পরবর্তী সময়ে কোনো সমস্যা হয় নি। কিন্তু সেই পড়ে যাওয়া দাঁতের জায়গায় একটা বাঁকা দাঁত উঠলে অনেকে বলতে থাকে দাঁত গিলে ফেলায় নাকি এরকম হয়েছে।

এভাবে একটা একটা করে ক্লাস পার করতে থাকি। আমি বরাবরই মাঝারি লেভেলের ছাত্র ছিলাম। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া ও ঘুরে বেড়াতে খুবই ভালো লাগে। তাই সুযোগ পেলেই লাইব্রেরিতে পড়তে যেতাম এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতাম। একদিন হোস্টেলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে গিয়েছিলাম আর এদিকে হোস্টেলে আমাদেরকে কোনো একটা কারণে একত্রিত করা হলো। আমি ও আরো অনেকজন কোয়ান্টা সেখানে দেরিতে উপস্থিত হই।

তখন দায়িত্বশীলেরা নিয়মের ব্যাপারে বেশ কড়া ছিলেন। আর না জানিয়ে হোস্টেলের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই আমি অনেক ভয় পেয়ে গেলাম এবং কোয়ান্টা ভঙ্গি (যোগাসনে যা জ্ঞানমুদ্রা হিসেবে পরিচিত) করলাম। কারণ কোনো এক বড় ভাই বলেছিলেন বিপদের সময় এই ভঙ্গি করলে নাকি প্রশান্ত থাকা যায়। ফলে পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসে। স্যার আমাদের কিছু বললেন না। এগুলো মনে পড়লে এখন অনেক মজা পাই।

২০১৪ সালটা আমার জন্যে কষ্টদায়ক ছিল। হঠাৎ আমার মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তার একমাস পর আমার ছোট কাকিও পরলোকগমন করেন। ক্লাস ফাইভে সমাপনী পরীক্ষায় যখন আমি এ প্লাস পাই নি, তখন মা মন খারাপ করেছিলেন। আমি মাকে কথা দিয়েছিলাম আগামী পরীক্ষাগুলোতে আমি আমার সর্বোচ্চ রেজাল্ট করব। এরপর আমি জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা দেই। যদিও কোনো পরীক্ষাতে এ প্লাস পাই নি। এ গ্রেড পেয়েছিলাম। মায়ের ইচ্ছেটা অপূর্ণ থেকে যায়।

কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে আমি বরাবরই ভালো করতাম। তাই বিজ্ঞান নিয়েই ভবিষ্যতে পড়ার ইচ্ছে ছিল। এখন আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছি। আজ যদি

ছোটবেলায় আমি

ছোট ভাই খিয়ামং

আমার একবছর পরেই ভর্তি হয় ছোট ভাই খিয়ামং চাক, সে এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। এই ছবিগুলো দেখলে ছোটবেলার দিনগুলো মনে পড়ে।

মা বেঁচে থাকতেন, আমার এই খবর জানতে পেরে নিশ্চয়ই খুব খুশি হতেন। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি। প্রভুকে ধন্যবাদ।

আমার ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। রেজাল্ট ভালো না হওয়ার কারণে সে ইচ্ছে দমন করতে হয়। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক সুজন স্যার আমাদের বলতেন যে, 'বিজ্ঞান হলো অজানাকে জানার চেষ্টা করা আর মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটন করা।' একবার বিজ্ঞান বিষয়ক একটা বই থেকে জানতে পারলাম—মানুষ এই মহাবিশ্বের মাত্র ৪.৬% জানতে পেরেছে। ২৪% ভাসা ভাসা আর ৭১.৪% এখনো অজানাই থেকে গেছে। তারপর থেকে স্যারের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এই অজানাকে জানতে চাইতাম। এজন্যে মনে সুপ্ত ইচ্ছা ছিল, আমি পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়ব। এখন এটা নিয়ে আমি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চাই। □

নেশায় বুঁদ থাকা ছেলেটা এখন স্বপ্ন দেখে ভালো মানুষ হওয়ার

জোসীময় চাকমা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলা সদর থেকে গাড়ি দিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর আবারো পায়ে হেঁটে দেড় ঘণ্টা যেতে হয়। তারপর দেখা মেলে আমাদের গ্রাম উগলছড়ির। বিদ্যুৎ নেই, কাঁচা রাস্তা, পাওয়া যায় না মোবাইল নেটওয়ার্কের সুবিধা। সেই দুর্গম এলাকায় আমার জন্ম। মা-বাবা জুমচাষ করতেন। আমরা তিন ভাই। আমি সবার ছোট। গরিব হলেও বেশ সুখে ছিলাম আমরা।

হঠাৎ আমার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসা চলতে থাকে। আত্মীয়স্বজন সবাই মিলে সহযোগিতা করে চিকিৎসার জন্যে। প্রচুর অর্থ খরচ করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় বাবাকে। তারপরেও অসুখ ভালো হচ্ছিল না। সবাই চিন্তায় পড়ে যায়, কোথায় নিয়ে গেলে তিনি সুস্থ হবেন। এভাবে প্রায় দুবছর চলতে থাকে চিকিৎসা। দিন দিন খারাপ হতে থাকে বাবার অবস্থা। একদিন বাবা আর এই ভোগান্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করার জন্যে বিষ খেয়ে নেন। কোনোরকম তাকে এই বিপদ থেকে বাঁচানো গেল। কিন্তু

কয়েকদিন পর অসুখ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। শত চেষ্টায়ও রাখা গেল না তাকে, অবশেষে চলে গেলেন বাবা।

সবাই চিন্তায় পড়ে গেল, আমাদের অবস্থা কী হবে! তখন আমার বয়স আট বছর। প্রাইমারিতে পড়তাম। বড় ভাই পড়ত অষ্টম শ্রেণিতে আর মেজো ভাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে। এসময় কেউ কেউ বলতেন মাকে আবারো বিয়ে করতে। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, মা আর বিয়ে করলেন না। মা আমাদের ওপর ভরসা রেখে কাজ করতে লাগলেন।

টাকার অভাবে পড়ালেখা ছাড়তে হয় বড় ভাইকে। আর মেজো ভাইকে পাঠানো হয় এক আত্মীয়ের বাড়িতে। মা সংসার সামলানোর পাশাপাশি দিনমজুরি করে টাকা জোগাড় করতেন। স্কুল থেকে যখন আসতাম, বাড়িতে ভাত থাকত না। বাড়ির আশেপাশে কাঁঠাল গাছ ছিল, কাঁঠাল খেয়ে ক্ষুধা মেটাতাম। এভাবে পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষাও দিলাম ২০১৩ সালে।

এবার ক্লাস সিক্সে কোথায় পড়ব? কীভাবে পড়ব? সমস্যা আরো বেড়ে গেল। গ্রামে একটা জুনিয়র স্কুল ছিল। ঐ স্কুলে মাসিক বেতন ২০০ টাকা। কারণ স্কুলটি ছিল বেসরকারি, এজন্যে ফি একটু বেশি। যাক, তবুও মা হাল ছেড়ে দেন নি। অনেক কষ্ট করে মা উত্তর মুবাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমাকে ভর্তি করে দিলেন। কয়েকদিন পরে ক্লাস শুরু হলো। তারপরেও আমি ক্লাসে যেতে পারছি না। কারণ তখনো আমার স্কুল ড্রেসের ব্যবস্থা হয় নি।

বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই মা একদিন ইউনিফর্ম ছাড়া স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ দিন ছিল মঙ্গলবার। মা বলতেন মঙ্গলবার দিয়ে শুরু করলে নাকি মঙ্গল হয়। ক্লাসে যখন ঢুকলাম সবার চোখ আমার দিকে। কারণ অনেকদিন পর ক্লাসে উপস্থিত হওয়া, আবার স্কুলের পোশাক নাই, যা ছিল তা-ও পুরনো। স্যার ক্লাসে এসে বললেন, এতদিন পর কেন? আর তোমার স্কুলের ইউনিফর্ম কোথায়? আমি বললাম, স্যার, মা এখনো কিনে দিতে পারেন নি। স্যার বললেন, তাহলে আজকে পুরো সময়টা দাঁড়িয়ে ক্লাস করো। তোমার মাকে বলো স্কুল ইউনিফর্ম কিনে না দিলে স্কুল থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হবে।

ঘটনাটা মাকে যখন বললাম, মা এক সপ্তাহের মধ্যে ইউনিফর্ম সংগ্রহ করে দিলেন। তারপর থেকে খুশিতে স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। বহু কষ্টে বছরটা শেষ করলাম। একসময় জেএসসি পরীক্ষাও সম্পন্ন করে ফেললাম। এভাবে তিনটা বছর কেটে গেল সেই স্কুলে। মা চিন্তায় পড়ে গেলেন আমার পরবর্তী ভর্তি নিয়ে। একদিন আমার বন্ধু রিকন বলল, আমার বাবা আমাকে দূরের

একটি স্কুলে ভর্তি করে দেবে। আমার সাথে যাবে? সে আরো বলল, সেই স্কুলে নাকি পড়ালেখা অনেক ভালো। আমি বললাম, বাড়িতে বলে দেখব। ব্যাপারটা রাতে মাকে বললাম, তখন পাশে বড় ভাইও ছিল।

কী সৌভাগ্য! বড় ভাই বলল ঠিক আছে ভর্তি করে দেবো। তারপর বড় ভাই আমার বন্ধুর বাবার সাথে কথা বলে সব ঠিক করে ফেলল। স্কুলটি আমাদের কাউখালী থেকে ৪০/৪২ কিলোমিটার দূরে। ভর্তি হতে যাওয়ার সময় গাড়িতে বমি বমি ভাব হচ্ছিল আমার। কারণ ঐদিন ছিল আমার প্রথম দূরের ভ্রমণ। এর আগে কোনোদিন এত দূরে যাওয়ার সুযোগ হয় নি। অনেক কষ্ট করে পৌঁছে গেলাম স্কুলে। মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়ে গেলাম সেদিন। ভর্তি শেষ করে রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। এবার বমি না করে আর পারলাম না। গাড়িতে চড়ার অভ্যাস নেই যে!

কয়েকদিন বাড়িতে কাটানোর পর ক্লাস শুরু হলো, তাই চলে গেলাম দুজনে হোস্টেলে। হোস্টেলটা ছিল একটু অন্যরকম। নিজের টাকা দিয়ে নিজে রান্না করে খেতে হয়। হোস্টেলের ভাড়া দেয়া লাগে না। টাকার অভাবে লাকড়ি কিনতে না পারায় বিভিন্ন জায়গা থেকে তা খুঁজে নিয়ে আসতাম। আমি আর আমার বন্ধু দুজনে মিলে রান্না করে খেতাম। আলু আর ডাল একটু সস্তা বলে সবসময় আলু ও ডাল দিয়ে ভাত খেতাম।

ক্লাসের প্রথমদিন গিয়ে দেখি আমার বন্ধু ছাড়া কাউকে চিনি না। তাছাড়া বাংলাও শুদ্ধভাবে বলতে পারতাম না। ক্লাসে স্যার এসে জিজ্ঞেস করলেন আমার পরিচয়। আমি কোনোরকম উত্তর দিলাম। আমার কাণ্ড দেখে সবাই হাসল। একদিন এক মজার ঘটনা ঘটল—সেদিন আমি আলু ভাজা করেছিলাম। রান্না শেষে যখন খেতে বসলাম, দেখি আলু ভাজাতে লবণ এত বেশি হয়েছে যে একদম খাওয়া যাচ্ছে না। অন্য খাবার তো নেই। তাই আমার বন্ধু আলু ভাজাটা নতুন করে ধুয়ে আবার রান্না করল। তারপরেও খেতে পারলাম না, আলু ভাজায় এত লবণ।

হোস্টেলে যারা থাকে সবাই মদ সিগারেট খেত। ধীরে ধীরে আমিও একসময় আসক্ত হয়ে গেলাম। এভাবে চলে গেল ঐ বছরটা। নিয়মিত মদ খাওয়াও আমার চলতে থাকল। কোনোরকম কাটিয়ে দিলাম ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষাটা।

দশম শ্রেণিতে মডেল টেস্ট পরীক্ষার আগে স্যারেরা বলে দিয়েছেন, এই পরীক্ষাতে যারা ফেল করবে তাদের ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে দেয়া হবে না।

এটা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম মদ-সিগারেট খাওয়া বাদ দিতে হবে। কিন্তু এটা তো খুব কঠিন! চেষ্টা করলাম পড়াশোনায় মন দেয়ার। মায়ের কষ্টকে অনুভব করলাম।

এসএসসি পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষা শেষ করে বাড়িতে চলে গেলাম। একদিন আমার মা বললেন, পাশ করলে বাবা তুমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে চলে যাও। ঐদিন প্রথম শুনলাম নামটা, এর আগে কখনো শুনি নি। মা আরো বললেন ঐখানে তোমার মামাতো ভাই অমিয় পড়ে। আগে জানতাম সে বান্দরবানে পড়ে কিন্তু এই স্কুলে পড়াশোনা করে সেটা জানতাম না। মা বললেন, ঐখানে কিছুই দেয়া লাগে না, সব ফ্রি। মনে মনে চিন্তা করলাম, ঐখানে যাওয়াটা ভালো হবে। বাড়িতে থাকলে অনেক কষ্ট হবে, পড়াশোনাটাও হবে না। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি যাব। তারপর বড় ভাই ভর্তির ফরম জোগাড় করে ফেলল। কয়েকদিন পরে খবর এলো ভর্তি হওয়ার জন্যে নাকি পরীক্ষা দিতে হবে চট্টগ্রামে। তাই পরীক্ষা দিতে চট্টগ্রামে গেলাম। তারপর কয়েকদিন পরে এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। যাক, ভগবানের আশীর্বাদে পাশ করলাম।

তারপর কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে খবর এলো মে মাসের ১৯ তারিখে আসতে হবে। মা এসব বিষয় বোঝেন না তাই আমার সাথে বড় ভাই গেল পৌঁছে দিতে। কোয়ান্টামে এসে আমার প্রথম চোখে পড়ে এটি ধূমপানমুক্ত এলাকা! নতুন পরিবেশে, নতুন নিয়মকানুন আমার কাছে কিছুই ভালো লাগছে না। তাই অমিয় ভাইকে বললাম, আমি চলে যাব বাড়িতে। সে আমাকে বুঝিয়ে বলল কয়েকদিন থাকো সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর ক্যাম্পাসের বড় ভাইয়েরা এসে সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন, এখানে থাকো তোমার জীবনে অনেক কিছু হবে। আরো বলতেন তুমি এখান থেকে ভার্সিটি পড়তে পারবে। শুরু করে দিলাম পড়াশোনা। স্কুলের দৈনিক রুটিন সব মেনে চলতাম। নিয়মিত মেডিটেশন করতাম আর মনছবি দেখতাম, যেভাবে হোক ভার্সিটি পড়তেই হবে। একসময় হয়ে গেলাম প্রকৃত কোয়ান্টা।

একটা জিনিস খুব ভালো লাগত, সেটা হচ্ছে ক্যাম্পাসে রাগ জিনিসটা একদম দেখা যেত না। একটা কাগজে দেখলাম লেখা আছে—রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। তারপর থেকে আমিও রাগটা একেবারে কমিয়ে দিলাম। এভাবে চলতে লাগল। একসময় এইচএসসি পরীক্ষাও শেষ হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় ভার্সিটি ভর্তি কোচিং। আমরা কয়েকজন কলেজে থেকে নিজেরাই

পড়াশোনা করলাম। পরে চান্স পেলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। গ্রামের সবাই আমার প্রশংসা করে এখন। কারণ আমাদের এলাকায় আমি প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি।

এসব সাফল্যের কারণ হলো কোয়ান্টামের শিক্ষা এবং আমার আত্মবিশ্বাস। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সও করানো হয়েছিল আমাদের কলেজ থেকে। এই কোর্সের শিক্ষা অনুসরণ করে আমার জীবনে ইতিবাচকতা এসেছে। তাই আমি গুরুজী দাদুর কাছে বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

বর্তমানে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়ালেখা করছি। ভবিষ্যতে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে গিয়ে সেখানে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশে ফিরতে চাই। কারণ দেশের মানুষের জন্যে আমাকে কাজ করতে হবে।

আর একজন দাতা হতে চাই। বৌদ্ধধর্মে দানের গুরুত্বের কথা বলা আছে। আমাদের ধর্মে সবচেয়ে বড় দানের উৎসব হচ্ছে 'কঠিন চীবর দান'—(এই অনুষ্ঠানে পুণ্যের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ শ্রমণদের পরিধেয় পোশাকসহ প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ দেয়া হয়) এই মহতি পুণ্যানুষ্ঠান আমাদের স্থানীয় বিহারে এখনো অনুষ্ঠিত হয় নি। সুতরাং আমি প্রথমবারের মতো সেই মহতি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হতে চাই।

বৌদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য সত্যকে উপলব্ধি করে দুঃখমুক্তি। বুদ্ধের শিক্ষা—মানুষ কর্মের অধীন, জগতে কর্মই সব। যার যেমন কর্ম, তিনি ফলও পাবেন তেমন। এ দর্শনের মূলমন্ত্র—সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করুক। সাধু সাধু সাধু! □

অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই

রেমন্ড ত্রিপুরা
জিমন্যাস্টিক্স প্রশিক্ষক

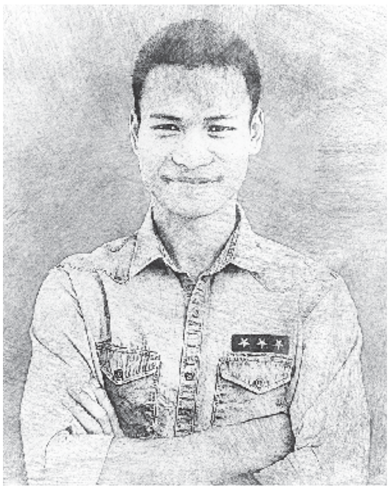

বান্দরবানের গজালিয়া ইউনিয়নের বধুঝিরি পাড়ায় আমার বাড়ি। আমরা তিন ভাই এক বোন। মা-বাবা দুজনেই জুমচাষ করেন। সারাবছরই তারা চাষাবাদের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাদেরকে দেখলে ধারণা পাওয়া যায়—যত ব্যস্ত তত সুস্থ। কোয়ান্টামে আসার সময়কার কথা কিছুটা মনে আছে। মোটামুটি সে-সময়ে আমি মায়ের কোলে থাকি। বাড়িতে অ, আ অল্প শিখেছি, ভর্তি পরীক্ষাতে যদি বলতে বলে যেন কিছু হলেও বলতে পারি। ভর্তির সময় যখন এলাম, আমাকে একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমার বয়সী অনেক ছেলে বসে কাঁদছে। পেছনে ফিরতেই দেখি বাবা চলে যাচ্ছেন।

আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেখান থেকে এখানকার খাওয়াদাওয়া, নিয়মকানুন, ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমিও এসবের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে থাকলাম। একসময় আমি আমার বাড়ির কথা একেবারে ভুলেই গেলাম। মা-বাবার অনেক স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এলো। একদিন খাবারের সময় কেউ

একজন আমার জুতা নিয়ে চলে গেল। খালি পায়ে আমি খেতে এসেছি। কিন্তু স্যার বললেন যাও জুতা নিয়ে আসো। বাংলা বুঝি আর না বুঝি চলে গেলাম জুতা আনতে। কে আমার জুতা নিয়ে গেছে তা বলতে পারলাম না। একটু দূরে গিয়ে দেখি একজোড়া জুতা আছে। তবে সেটা আমার মতো তিন জনের পা দেয়া যাবে এমন সাইজের এবং অনেক ভারি। তারপরও আমি পা টেনে টেনে ঐ স্যান্ডেল পরে খেতে এলাম। আমি একটু বেশিই সরল ছিলাম ছোটবেলায়। এখন মনে পড়লে হাসি পায়।

সেই সময় আলী আহসান স্যার হাতের লেখা শিখাতেন। সবাই মিলে খাবারের টেবিলে বসে হাতের লেখা শিখতাম। তিনি আমার লেখার অনেক প্রশংসা করতেন।

একবার ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে আমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের একটা ত্রিপুরা পাড়াতে। আমাদের খ্রিষ্টানদের বড়দিন ধর্মীয় উৎসব হচ্ছিল। রাতে অনুষ্ঠান শেষে আমি ওখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি ত্রিপুরা ভাষায় কয়েকজন কথা বলছে। হঠাৎ মনে হলো আমার মা-বাবা এভাবেই তো কথা বলতেন। বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়।

একবার অভিভাবক সাক্ষাতের দিন বাবার বদলে আমার চাচা আমাকে দেখতে আসেন। চাচাকে আমি চিনতে পারছিলাম না। আমি গিয়ে আমার বাবাকে অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাই নি। পরে আমার চাচা আমাকে দেখে কাছে ডেকে কোলে তুলে নিলেন।

আমরা যখন ফাইভে পড়ি তখন জাহিদ স্যারকে পাই। শিক্ষক হিসেবে তাকে খুব ভালো লাগত। দেখতাম কোয়ান্টারা যেমন প্র্যাকটিস করছে, স্যারও তাদের সাথে প্র্যাকটিস করছেন। কোচ থাকা অবস্থাতেও তিনি অনেক গেমে অংশ নিয়েছেন। প্রতিদিন ভোরে গ্রাউন্ড অলিম্পিয়ান মাঠে তিনি কোয়ান্টাদের আগেই উপস্থিত থাকতেন। আজ স্যার নেই, কিন্তু স্যারকে এখনো মনে পড়ে, যেন তিনি আমার চোখের সামনে মাঠে দৌড়াচ্ছেন!

কোয়ান্টামে বন্ধুদের সাথে আড্ডা, গল্পের আসরের সময়গুলো খুবই মজাদার ছিল। গল্প করার সময় কে কী নিয়ে বলছে তার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। সবাই গোল হয়ে খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। হাসিঠাট্টায় মেতে সময় কেটে যেত। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে কেউ বলতে পারত না এতক্ষণ কী নিয়ে কথা হয়েছে।

২০১৩ সালে আমাকে স্কুলের কারাতে স্পোর্টসে দেয়া হয়। আমি নরম

স্বভাবের মানুষ ছিলাম বলে শুধুই মার খেতাম। পরে টেবিল টেনিস নিয়েছিলাম। একদিন ছালেহ স্যার আমাদেরকে জিমন্যাস্টিক্সের একটা ভিডিও দেখালেন। তখন ঢাকা থেকে দুজন কোচ এসে আমাদেরকে বাছাই করলেন। তখন আমরা যা দেখতাম তা-ই হতে চাইতাম। আমি কোচদের প্রদর্শনী দেখে চিন্তা করলাম যেভাবে হোক এটা শিখতে হবে, পারতে হবে। প্র্যাকটিস শুরু করার কিছুদিন পর আমাকে পা স্ট্রেচ করে সোজা করে দেয়া হলো। সেদিন খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। অনেক কান্না করেছিলাম। প্রত্যেক জিমন্যাস্টের জীবনে এটি ঘটে থাকে।

আমার জীবনে প্রথম ঢাকা যাওয়া হয় জিমন্যাস্টিক্স খেলার জন্যে। সেখানে গিয়ে আমরা পুরনো খেলোয়াড়দের টেকনিকগুলো কপি করতাম। ঢাকা থেকে ফিরে যেগুলো করতে দেখেছি সেগুলো প্র্যাকটিস করতে শুরু করলাম। আমাদের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। আর অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই এই প্রত্যয়টা শুরু হয় আমাদের স্কুলে ২০১৩ সাল থেকে।

আসলে সময় সবসময় একরকম যায় না। আমার লেখাপড়া কেন যেন অতটা ভালো লাগত না। খেলাধুলা নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে একসময় এসএসসির মডেল টেস্ট চলে আসে। মডেল টেস্টে ভালো করি নি। বাসায় চলে যেতে চাইলাম। কী যে তখন মনের মধ্যে চলছিল, বলতে পারব না।

বাসায় যাওয়ার পর ভাবছিলাম গজালিয়া স্কুলে ভর্তি হবো। কিন্তু আর্থিক

সামর্থ্য না থাকার কারণে ভর্তি হতে পারি নি। বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পর কাজের দিকে মন চলে যায়। মা-বাবা কাজ করতে না বললেও তাদেরকে দেখলে আমার কষ্ট লাগে। আমার মনে হলো, আমি পরিবারকে চাইলে সহায়তা করতে পারি। বাসায় থাকাকালীন সময়ে আমি একমাস কৃষিকাজ করেছিলাম। যদিও অনেকে বলেছে আমি এ-কাজ করতে পারব না! স্বাভাবিকভাবেই এসব কাজের কোনো অভিজ্ঞতাও আমার নেই। কিন্তু উপলব্ধি করলাম আমাকে কাজ করে খেতে হবে।

বিশাল পাহাড়ের উপর ধান মাড়াই করার মেশিন না থাকায় তখন মানুষকেই মেশিন হতে হয়। আমি প্রথম যেদিন গেলাম সেদিনই ছিল ধান মাড়াই করার কাজ। আমাকে কাজ করার জন্যে কিছু না বললেও আমি নিজেই হাত লাগাতে থাকি। জুমচাষ করা আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। ধান বস্তায় করে বাসায় নিয়ে আসতাম আমি আর আমার মা। আমি বস্তা তাড়াতাড়ি বাসায় রেখে আবার মায়েরটা নিতে দৌড়ে যেতাম। তখন কোয়ান্টামের কথা, বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ত।

আমি কোয়ান্টাম থেকে বাড়িতে যাই ২০১৮ সালে। বাসায় যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর কোয়ান্টাম থেকে আমাকে ফোন করে বলা হয় জিমন্যাস্ট কোয়ান্টাদের ট্রেইনার হিসেবে আসতে।

আমি আবার কোয়ান্টামমে এলাম। জিমন্যাস্টিক্সের ট্রেইনার হিসেবে যোগদান করলাম।

তখন বেশ ছোট আমি, গুরুজী দাদু আমাদের স্বপ্ন দেখালেন যে, অলিম্পিকে সোনা আমরা জিতবই—তখন থেকে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার সেই সুযোগটা এখন নেই। কিন্তু আমি পারি নি তাতে কী হয়েছে, আমি যদি কাউকে অলিম্পিক পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমার যাওয়ার আশাটা পূরণ হবে। আমি আমার ছাত্রদের অর্থাৎ কোয়ান্টাদের মধ্য থেকে কাউকে দিয়ে জিমন্যাস্টিক্সে অলিম্পিকে সোনা জেতাবই। ইতোমধ্যে অনেকে খুবই ভালো করছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখতে শুরু করেছে। □

স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেয়েছি

এম. শহিদ উল্যা
গণিত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটবেলার স্মৃতিগুলো খুব একটা মনে নেই। তবে যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে জেনেছি আমাদের আশেপাশে মাত্র তিনটি পরিবার বসবাস করে। এরাই আমাদের প্রতিবেশী। লামা উপজেলায় কাটাপাহাড় নামে পরিচিত এই পাহাড়ের চূড়ায় আমরা থাকতাম। সেখানে পানির কষ্টটা সবচেয়ে বেশি ছিল। পাহাড় থেকে নেমে পানি সংগ্রহ করে আবার পাহাড়ের চূড়ায় বাসায় নিয়ে যেতাম। মাথায় করে কলসি আনতে আনতে ব্যালেন্স এমন হয়েছে যে কলসি না ধরেই হাঁটতে পারি। পাহাড়ের একপাশ থেকে খাবার পানি আর অন্য পাশ থেকে অন্যান্য ব্যবহারের পানি আনতে হতো। বর্ষার দিনগুলোতে পানির অভাব না থাকলেও চলাচলের অসুবিধা ছিল বেশি।

পুরো পরিবার বাবার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্ষা এলেই বাবার কাজ বন্ধ। যখন ঝড় হতো, চালের টিন উড়ে যেত, ঘরের জিনিসগুলো স্তূপ করে পলিথিনে ঢেকে রাখতাম।

আর বর্ষা ছিল স্কুল ফাঁকি দেয়ার উপযুক্ত সময়। যেদিন স্কুলে যেতে মন চাইত না, সেদিন বাসা থেকে বের হয়ে কিছুদূর গিয়ে ইচ্ছে করে পা পিছলে পড়ে যেতাম। সবাই বিশ্বাসও করত। কারণ যেখানে বড়রাই পিছলে পড়ে গায়ে কাদা মেখে বাড়িতে আসে, আমরা তো ছোট। বেশি বৃষ্টির সময় মা নিজেই যেতে দিতেন না।

একসময় মা রেশম চাষ শুরু করলেন। রেশম পোকা যে গাছের পাতা খায় সে পাতার নাম তুঁত পাতা। পোকার জন্যে পাতা খুঁজতে খুঁজতে অনেক কম সময়ে লামার একটা অংশ আমার পরিচিত হয়ে যায়। আমাদের পাহাড়ের উপরে যে তুঁত গাছ ছিল তা দিয়ে পোকা পালন করা কঠিন। আরো পাতার খোঁজে আমরা বিভিন্ন স্থানে যেতাম। অনেক সময় গাছের মালিকরা গরুকে খাওয়াবে বলে পাতা দিতে চাইত না। কাজ না থাকলে বাবাও আমাদের সাথে যেতেন পাতা খুঁজতে। অনেক সময় দুপুরে বের হতাম, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হতো। তখন আর পড়াশোনা হতো না। ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে যেতাম। জনমানবহীন এমন লোকালয়ে রাত ৮টা-৯টা মানে গভীর রাত। বিদ্যুৎ না থাকায় আলোর একমাত্র উৎস কেরোসিন তেলের কুপি বাতি।

আমার বড় ভাই যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে তখন এক দুর্ঘটনায় সে মাথায় আঘাত পায়। কিছুদিন ওষুধ খেয়ে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু আঘাতের প্রভাবটা প্রকাশ পায় ছয় মাস পর। একদিন গভীর রাতে প্রচণ্ড খিঁচুনি হতে থাকে। আমরা কেউ এমন পরিস্থিতির সাথে পরিচিত না। সবাই ভৌতিক কিছু ভেবে ঝাড়-ফুঁক দেয়ার জন্যে হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে বলল। তাতেও কাজ না হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার বলেন এটা মৃগী রোগ। টাকাপয়সা জোগাড় করে শুরু হয় এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ।

এই পরিস্থিতিতে আমার ছোট ভাই মনসুরকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে শিশুশ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। এরপর আমি একটু দূরে নানা বাড়িতে চলে যাই। সেখানে মামার কাছে বড় হতে থাকি। বছর তিনেক নানা বাড়িতে পড়াশোনা করি। আমার প্রাইমারি স্কুল যেখানে ছিল সেটা অনেক দূরে। প্রতিদিন সকালে স্কুলে যেতাম আর দুপুরে টিফিনের পর চলে আসতাম। মজার বিষয় হলো যেদিন আমি আমার প্রাইমারি স্কুলের সার্টিফিকেট নিতে গেলাম, সেদিন দেখি স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক আমাকে চিনতে পারছেন না। কারণ আমি কখনো তার ক্লাস করি নি। যেহেতু টিফিনের সময় আমি বাড়ি চলে আসতাম, আর টিফিনের পরেই ছিল স্যারের ক্লাস।

২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসে আমার ছোট ভাইকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে দেখতে গেলাম। সেখানে খবর পাই ষষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন ছাত্র ভর্তি নেয়া হবে। বুঝতে পারলাম আমারও এখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে। তখনই একটা ফরম পূরণ করে ফেলি। কিছুদিন পর আমি এক নবীন শিক্ষার্থী হিসেবে সেখানে ভর্তি হই। আমি এখনো মনে করি, আমার জীবনে সঠিক সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে একটি হলো স্বেচ্ছায় এই স্কুলে ভর্তি হওয়া।

আমি এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে আমার ছোট ভাই এখানে আসে। মাঝে মাঝে ছোট ভাইকে দেখার জন্যে কোয়ান্টামে আসতাম। কিন্তু ভাবতেও পারি নি আমি একসময় এখানে পড়াশোনা করব। আমার নামের সামনে কোয়ান্টা শব্দটা থাকবে। আটটি বছর কেটে যাবে এই স্কুলে।

এখানকার নিয়মকানুন আমার একদম ভালো লাগত না। সকালে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হতো। সকালে যে ঘুম থেকে ডাকতে আসত, তাকে মনে হতো জগতের সবচেয়ে খারাপ মানুষ। পরিবারের কথা খুবই মনে পড়ত। প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে বুঝতে পেরেছি কোয়ান্টাম আমার আরেকটা পরিবার। শিক্ষকেরা ছিলেন মা-বাবার মতো। আর সবচেয়ে ভালোলাগার বিষয় হলো গুরুজী দাদুর কথাগুলো।

গুরুজী দাদু ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষার আগে মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—'ইনশাআল্লাহ ভালো হবে'। আল্লাহর রহমতে জেএসসি পরীক্ষাসহ সব বোর্ড পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হয়েছে। কোয়ান্টামে এসে অনেক নতুন শব্দ জেনেছি—মেডিটেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, বুয়েট আরো কত কী? পরে বুঝলাম যদি ডাক্তার হতে চাই তাহলে মেডিকেল কলেজে পড়তে হবে। ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে বুয়েটে পড়তে হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই। কলেজের পড়াশোনা শেষে এগুলোতে ভর্তি হতে হয়। যদিও তখন ভালো প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ স্বপ্নের মতো ছিল।

এখানে এসে আমি কিছু সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাই। ব্যান্ড দলের সদস্য হিসেবে আমি ড্রাম বাজাতাম। ড্রাম বাজিয়ে ২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত পর পর টানা পাঁচ বার ঢাকায় জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে অংশ নিয়েছি। পাঁচ বারেই সকলকে পেছনে ফেলে প্রথম হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। এছাড়া ভলিবল খেলাও আমার খুবই ভালো লাগত।

ছোটবেলায় যে স্বপ্ন দেখেছি, ২০২২ সালে এসে তা পূরণের সুযোগ আসে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল হলো। গণিত

বিভাগে ভর্তি হলাম। এখন পড়াশোনার পাশাপাশি কোয়ান্টামের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়মিত কাজ করছি।

কোয়ান্টামে 'মনছবি' নামে একটা শব্দের সন্ধান পাই। নিজের বিবেকের কাছে সৎ থাকতে পেরে আমি শান্তি পাই। আমার কাছে আমার পরিবারের চাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কোনো আবদার পূরণ করতে পারলে আমার অনেক ভালো লাগে। খুব ইচ্ছা বাংলাদেশ যখন সেরা দশ জাতির একটি জাতি হবে, তখন যেন আমি এই সাফল্যের একটি অংশ হতে পারি।

জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন বই আমার প্রিয় বই। সর্বশেষ অটোসাজেশনটি হলো—

'জীবনে আমি হবো লাখো মানুষের ভরসাস্থল।
মরণেও তারা হৃদয়ের অশ্রুতে শেষ বিদায় জানাবে আমাকে।
তারপরও প্রজন্মের পর প্রজন্মের হৃদয়ে বেঁচে থাকব আমি
তাদের আনন্দ বেদনায় সংকটে সম্ভাবনায়
প্রেরণার উৎসরূপে।'

আল্লাহর কাছে এই জীবনে আমি তো এটাই চাই! □

ভোকেশনাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

দিমান্ত চাকমা

ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

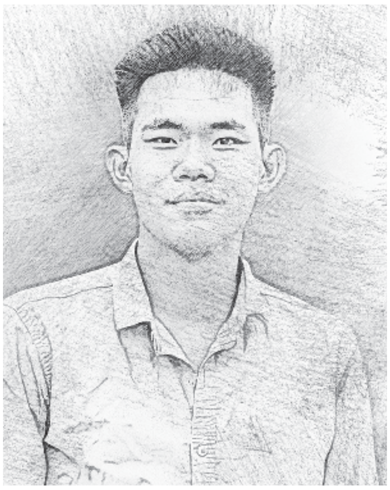

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছরি উপজেলার অনেকটা ভেতরে আমাদের বাড়ি। জুরাছরির পানি পথ দিয়ে যাওয়ার পর আবারো পায়ে হেঁটে যেতে হয় খানিকটা পথ। তারপর আমাদের গ্রাম বারাবান্যা। এই গ্রামেই আমার জন্ম। বাবা একজন জুমচাষী। পাহাড়ে কৃষিকাজ আমাদের প্রধান পেশা।

ছোটবেলায় বাবা আমাকে *বাল্যশিক্ষা* ও *ধারাপাত* নামের দুটি বই পড়িয়েছিলেন। তারপর আমাকে ২০০৯ সালে গ্রামে শিলছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। আমি অনেক দুষ্টু ছিলাম। মা-বাবার খুব আদরের হওয়ায় পড়াশোনা ঠিকমতো করতাম না। এভাবেই ক্লাস ফাইভ শেষ করলাম।

কাছাকাছি কোনো হাই স্কুল না থাকায় মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার জন্যে বাবা চিন্তায় পড়ে যান। অবশেষে বাবা আমাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার বলীপাড়া বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে আমি ষষ্ঠ শ্রেণি ভালোমতো পার করলাম। এরপরে সপ্তম শ্রেণিতে চার-পাঁচ মাস পড়ে,

সেখান থেকে সবকিছু ছেড়ে বাড়িতে পালিয়ে গেলাম। বাড়িতে পালিয়ে যাওয়ার পর, আবার আমাকে অন্য একটি স্কুল ঘিলাতলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেয়া হয়। সেই স্কুল থেকে আমি জেএসসি পরীক্ষা দিলাম।

জেএসসি পরীক্ষার পর আবার ভর্তি হলাম বান্দরবান জেলায়। এবার নবম শ্রেণিতে জেনারেলে ভর্তি না হয়ে ভর্তি হলাম বান্দরবান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। কারণ আমার তখন স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। নবম ও দশম শ্রেণি আমি সেই কারিগরি স্কুলেই পড়েছিলাম এবং ২০১৯ সালে ভোকেশনাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিলাম।

এবার বাবা বললেন, আমি আর খরচ দিতে পারছি না। তিনি আমাকে নিজ উদ্যোগে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে বললেন। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, কী করা যায়। তারপর আমার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়। কিন্তু কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলাম। কোয়ান্টাম কসমো কলেজে মানবিক বিভাগে ভর্তি হলাম। কোনো খরচ দেয়া লাগল না। সবকিছু কলেজ থেকেই দেয়। তারপর শুরু হলো কলেজ জীবন, এখানে এসে পেলাম নতুন পরিবেশ।

প্রথমে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে একটু কষ্ট হয়েছিল। যদিও পরে সব ঠিক হয়ে যায়। সাধারণত এসময় ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু হতে পারব না, তাই আমি মানসিকভাবে ভেঙে গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন চিন্তা করলাম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্বাদ কেমন তা জানা দরকার।

তারপর একদিন বন্ধুদের ছবি আঁকা দেখে আমিও মজা করে আঁকতে বসলাম। তখন থেকে ঠিক করলাম আমি চারুকলায় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেব। মেডিটেশনে মনছবি দেখতাম চারুকলা নিয়ে। তারপর থেকে সময় পেলে মাঝে মাঝে ছবি আঁকতাম, ভালোই লাগত। এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম জিপিএ ৪.৯৩ নিয়ে।

তারপর শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যুদ্ধ। অনেকে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় কোচিং করার জন্যে। আর আমরা কয়েকজন ক্যাম্পাসে নিজেরাই পড়ি। মাঝে মাঝে বড় ভাইয়েরা আসতেন পড়াশোনার সমস্যাগুলো সমাধান করে দিতেন। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সময় এসে গেল। পরীক্ষা দিলাম চ ইউনিটে। বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করছিলাম ফলাফলের

জন্যে। সবসময় বিশ্বাস করেছি যে, আমি পারব। আমি সত্যিই পেরেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি।

মানুষের জীবনের লক্ষ্যটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো তোমরা বড় হয়ে কী হতে চাও? তখন আমরা উত্তর দিতাম যে—পাইলট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, সৈনিক, শিক্ষক ইত্যাদি। একজন মানুষের অনেক ইচ্ছা থাকতে পারে। আমিও একদম ছোটবেলায় হতে চেয়েছিলাম ডাক্তার। আবার আমি যখন একটু বড় হলাম তখন হতে চেয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ার। সেই সুবাদে জেএসসি পরীক্ষার পর ভর্তি হয়েছিলাম কারিগরিতে। আবার শিক্ষক হতে চাই এটাও বলতাম।

তারপর কোয়ান্টাম কসমো কলেজে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত বলা হতো তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? আমার কাছে তখন আর কোনো উত্তর ছিল না। কারণ ছোটবেলা থেকে আমার মাঝে নানা দ্বিধা কাজ করত। তারপর স্কুলে আমাদেরকে 'শিক্ষার্থী মেডিটেশন' করানো হলো। মনছবি দেখতে বলা হলো। সকল দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে কোথায় আমার মেধা এবং আগ্রহ তা নিয়ে চিন্তা করলাম। ধ্যানে আমি আমার করণীয় বুঝতে পারলাম। আমি তখন মনে মনে ঠিক করলাম চারুকলা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে।

একজন ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষাটা পায় পরিবারের কাছ থেকে। একজন ছাত্রের গাইডলাইন তার পরিবার সবচেয়ে ভালোভাবে দিতে পারে। আমি ছোটবেলায় ভালো গাইডলাইন পাই নি। কোনোকিছু করতে গেলে আমাকে হাজার বার চিন্তা করতে হয় পরিবার টাকা দিতে পারবে কিনা। তবে আমার এত মানসিক চাপ আর আর্থিক সমস্যার মধ্যেও আমি কখনো পড়ালেখা ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবি নি। সবসময় চিন্তা করেছি, যে করেই হোক পড়ালেখা চালিয়ে যাব। আজ পর্যন্ত লেখাপড়ার জন্যে সকল বাধা অতিক্রম করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পেরেছি। এটাই আমার কাছে অনেক গর্বের বিষয়।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পাশাপাশি কোয়ান্টামের সাথে থেকে সৃষ্টির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই। আমার লক্ষ্য এখন মানুষের সেবা করা। সবসময় হাসিমুখে আমি মানুষের সেবা করতে চাই। আর ভবিষ্যতে আমি একজন বড় ভাস্কর হবো। □

আমার এলাকায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে চাই

মো. আব্দুর রহিম
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, রংপুর সরকারি কলেজ

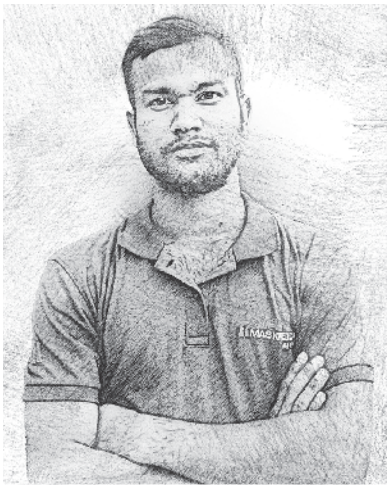

রংপুর জেলার মমিনপুর ইউনিয়নে আমি বড় হয়েছি। আমি গ্রাম থেকে উঠে আসা সেই ছেলে যার জীবনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে অক্লান্ত পরিশ্রমের চিত্র। আমার বাবা একজন কৃষক। বাবার উপার্জনে দুমুঠো খাবার জুটলেও পড়াশোনার খরচ জোগানো সম্ভব ছিল না। এমনকি কয়েক বছর আগেও আমাদের উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলোর দারিদ্র্য ছিল চরম পর্যায়ে।

সকালবেলা সূর্যের লাল আভা দেখা দিতেই যাকে মাঠে কাজ করতে যেতে হয়, তার কাছে লেখাপড়া ছিল কল্পনাতীত বিষয়। কোনো এক রাতে আমি বাবার পকেট থেকে একটি ১০ টাকার নোট নিই। এই টাকা দিয়ে স্কুলে ভর্তি হবো বলে ঠিক করি। কিন্তু বাবা বিষয়টি টের পেয়ে গেলেন। না বলে টাকা নেয়ায় বাবা আমাকে অনেক মারধর করলেন। আমার স্কুলে পড়ার স্বপ্নটার গোড়াতেই ছেদ পড়ে। ইচ্ছা ছিল সবার সাথে স্কুলে যাব। সবার সাথে খেলব, কিন্তু সেটা করতে পারি নি। ইচ্ছাগুলো কেন জানি মারা যেতে থাকে।

আমার বাবা এবং আমি সারাদিন মাঠে কাজ করতাম। দিনশেষে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন মনে হতো আমরা যেন যুদ্ধ থেকে ফিরে এলাম। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্যে কিছু খাবার খেয়ে ঘুমাতাম এবং পরের দিন সকালবেলা থেকে শুরু হতো আবার সেই একই কাজ।

দুঃখ, সুখ, হাসি ও কান্না—সব মিলিয়ে মানুষের জীবন। সময় যেভাবেই যাক আমি সবসময় চেয়েছি পড়াশোনা করবই। অনেক কষ্টে মাকে রাজি করিয়ে আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত আমি সেই স্কুলে পড়াশোনা করি।

তখনকার সময়ে এনজিও পরিচালিত কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু ছিল। বই থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ সম্পূর্ণভাবে স্কুলটি বহন করত। তবে ওখানে সুযোগ পাওয়াটা ছিল কষ্টের, তারা যাকে নির্বাচন করবে তারাই শুধু পড়তে পারবে। ৩০ জনের মধ্যে আমি একটু বড় ছিলাম, যার কারণে সেখান থেকে আমি বাদ পড়ে যাই। আমার আর ফ্রি-তে পড়ার সুযোগ হলো না।

অন্য স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পাস করলাম। একদিন বিনা বেতনের সেই স্কুলের এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমাকে কি তোমাদের স্কুলে নেয়া যাবে? সে বলল, আমি আগে স্যারকে বলে দেখব। তারপর তোমাকে জানিয়ে দেবো। পরের দিন স্যার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমাকে বলা হলো—তুমি যদি এখানে পড়তে চাও তাহলে তোমাকে অতিরিক্ত ছাত্র হিসেবে পড়তে হবে এবং যাবতীয় খরচ তোমার নিজের থেকে বহন করতে হবে। যেহেতু আমার সেখানে পড়ার ইচ্ছা, তাই রাজি হয়ে গেলাম।

শুরুতে আমি তেমন ভালো ছাত্র ছিলাম না। আমি সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের থেকে পড়ালেখায় অনেক পিছিয়ে ছিলাম। অন্যরা স্কুলের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, কিন্তু আমি কোনোকিছুই পাই নি। সবকিছু চিন্তা ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে লাগলাম। স্কুলে ক্লাস করতে দেয়ার সুযোগটাকে কাজে লাগালাম। কয়েক মাসে আমি হলাম ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র। এটা ছিল আমার জীবনের একটা বড় সাফল্য।

সেখান থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে ভর্তি হই দাখিল মাদ্রাসায়। দাখিল মাদ্রাসা থেকে অষ্টম শ্রেণিতেও আমি জিপিএ-৫ পেয়ে ভর্তি হলাম গ্রামের এক হাই স্কুলে এবং সেখান থেকে এসএসসি পাশ করি।

ভাবছিলাম আর পড়ালেখার সুযোগ হবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম গার্মেন্টসে গিয়ে কাজ করব। কিন্তু হঠাৎ করে খবর পেলাম কোয়ান্টাম কসমো কলেজের। শুনলাম সেখানে নাকি সবকিছু বিনামূল্যে সরবরাহ করে পড়াশোনা করানো

হয়। একটা ফরম সংগ্রহ করে ঢাকায় পরীক্ষা দিলাম। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আবার পড়াশোনা করার সুযোগ পেলাম। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে একজন কোয়ান্টা হিসেবে আমি জায়গা করে নিলাম।

কোয়ান্টামে এসে প্রথমদিকে একটু কষ্ট হলেও পরবর্তী সময়ে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি। কেননা এটাই তখন আমার শেষ সম্বল। কোয়ান্টামের বাণীগুলোকে নিজের মনে ধারণ করার চেষ্টা করলাম। আল্লাহর রহমতে এখান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় আমি ৪.৮৩ পেয়েছি।

আমি এখন জীবনে ভালো ও বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছি। আসলে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কোনো না কোনো ভিশন থাকে। কেউ সেই ভিশনকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে সাফল্য নিশ্চিত। আমি যদি তখন গার্মেন্টসে চলে যেতাম তাহলে আজ উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থাকত না। ভালোভাবে পড়াশোনা শেষ করে আমি আমার এলাকায় শিক্ষার আলো সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে চাই। যারা আমার মতো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, আমি তাদের এই অন্ধকার জীবন থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে চাই।

মানুষ বলে, তার লক্ষ্য পূরণ হলেই সে সফল মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি আমার দিক থেকে এই কথাটা সঠিক মনে করি না। সফলতা কেবলমাত্র যাত্রা, এমন যাত্রা যার কখনো 'দাঁড়ি' হয় না। কেবল 'কমা' হতে পারে। আমি সফলতার সেই পথেই হাঁটতে চাই। □

বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে চাই

রিমন কান্তি দে

লোক-প্রশাসন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

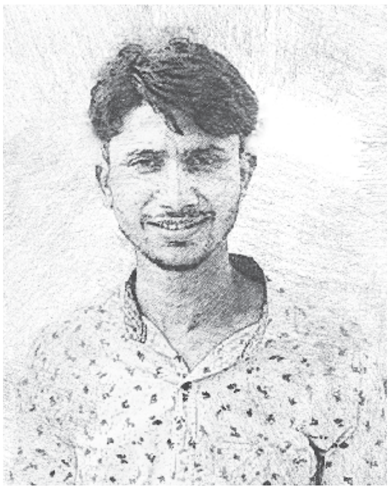

আমি সেই ছেলে, যার দিনগুলো কাটত দুষ্টামি আর হাসিখুশিতে। আমার জীবনের গল্পটা তেমন একটা বড় না হলেও কিছু তো গল্প থেকেই যায়। ছোটবেলায় যেমন পড়ালেখায় ভালো ছিলাম তেমনি ছিলাম দুরন্ত স্বভাবের। আমার বাড়ি কক্সবাজার জেলায় ঈদগাঁও উপজেলার ইসলামবাদের হিন্দুপাড়ায়। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন গ্রামে লেখাপড়া করার তেমন পরিবেশ ছিল না। বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে যেতে হতো। গ্রামের পরিবেশে ভালোই কেটেছিল আমার শৈশবের দিনগুলো। পড়ালেখায় ভালো ছিলাম বলে স্যারদের কাছেও ছিলাম প্রিয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ভালো সময়গুলোর মাঝেও খারাপ সময় এসে উপস্থিত হয়। তেমন এক ঘটনা ঘটল আমার জীবনে।

আমার বাবা একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। কিন্তু বাবার একদিন হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হলো। পরিবারে আমরা চার ভাই। বাবার অসুস্থতার কারণে বড় ভাই পড়ালেখা বন্ধ করে সংসারের হাল ধরলেন। মেজো ভাই বান্দরবানে কষ্ট করে

লেখাপড়া চালিয়ে গেলেন। আর মা চট্টগ্রামে চলে গেলেন কাজের সন্ধানে। আমি আর আমার ছোট ভাই মামার বাড়িতে থেকে পড়ালেখা শুরু করলাম।

আমি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কখনো মামার বাড়িতে, কখনো মাসির বাড়িতে থেকে পড়ালেখা করেছি। অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমাকে আমার মামা ও মাসি বললেন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে। তখন আমার একজন মামাতো ভাই কোয়ান্টামে পড়ত। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মামার সহায়তায় পরের বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়েছিলাম।

সেখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বন্ধুদের দেখে হতবাক হয়েছিলাম। এত ভিন্ন ধরনের মানুষ একসাথে থাকব কীভাবে! সবাই কি একই খাবার খায় নাকি ভিন্ন? সবাই বাংলায় কথা বলবে তো? বিভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু একপর্যায়ে তাদের সবার সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আমি ভর্তি হয়েছিলাম বাণিজ্য বিভাগে। পড়াশোনার পাশাপাশি আমি যোগ দিয়েছিলাম আর্চারিতে। কোয়ান্টামে স্যারদের আদর-যত্নে আমি বেড়ে উঠতে লাগলাম। কয়েকজন স্যার খুবই ভালো ছিলেন, তাদের কথা খুব মনে পড়ে। নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি আর আমার বন্ধুরা যে মজা করেছিলাম তা বলে শেষ করা যাবে না। তাছাড়া আমি বিভিন্ন ক্লাসের বড় ভাইদের সাথে মিশতে শুরু করলাম। তাদের কাছ থেকে আমি পড়ালেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম।

মা-বাবা ও ভাইদের ছেড়ে থাকতে একটু কষ্ট হতো। কিন্তু আমি মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। জীবনে সবকিছু তো পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। ছোটবেলা থেকে অনেক সংগ্রাম করে বেড়ে উঠেছি। তাই কোয়ান্টামে এসে আমি আমার জীবন সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলাম। আমার লক্ষ্যকে ঠিক করতে পেরেছিলাম যে, জীবনে কিছু একটা হতে হবে। কারণ গ্রামে পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না বলে তেমন একটা ভালো পরিবেশ পাই নি। অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে আমার অনেক মজার স্মৃতি রয়েছে। ক্লাসে ও কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে বন্ধুদের সাথে দুষ্টামি করতাম। কয়েকজন মিলে আম আর গুটগুটি ফল পাড়তে যেতাম। স্কুলে আবাসিক দায়িত্বশীলদের ও স্যারদের সাথেও অনেক স্মৃতি রয়েছে। তাদের সাথে আমরা গল্প করতাম। মাঝে মাঝে তাদের সাথে খেলাধুলাও করতাম। সবার সাথে

হেসেখেলে দিন কাটালেও আমার মনের মধ্যে অনেক কষ্ট জমে ছিল, যা আমার বন্ধু এবং স্যারদেরকে বুঝতে দিতাম না।

আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, পৃথিবীতে শুধু কষ্ট করতে এসেছি নাকি? ধনীর ছেলেমেয়েরা যখন নানা সুযোগ-সুবিধা পেত, তা দেখে আমি মাঝে মাঝে আমাদের অবস্থা ভেবে হতাশ হতাম। কিন্তু যেদিন সাফল্য দোরগোড়ায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলাম সেদিন শান্তি এবং খুশিতে চোখ থেকে পানি ঝরে পড়ল। আশা করি, আমি আমার সামনের জীবনেও সাফল্য ধরে রাখত পারব।

ভগবানের আশীর্বাদে আমি ২০২১-২২ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাতালিকায় চান্স পেয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে যার অবদান না বললে হয় না, তিনি হচ্ছেন গুরুজী দাদু। আমি তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। তাকে যেন ভগবান আরো ভালো কাজ করার সুযোগ দেন।

আমি যেন আমার লক্ষ্য পূরণ করতে পারি, এই প্রার্থনা করি। অতীত আমাকে অনেক হতাশ করার চেষ্টা করবে, ভবিষ্যৎ আমাকে স্বপ্ন দেখাবে আর বর্তমান সবসময় আমার সাথে থাকবে। তাই আমি বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে চাই। বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে সংগ্রাম করে যেতে চাই। আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাব—এটাই আমার বিশ্বাস। □

রুটিন ও মেডিটেশনের শক্তি এনে দিয়েছে সাফল্য

অংসাইনু মার্মা
মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যদের সাফল্যের গল্প জানা নিজের সাফল্যের জন্যে যথেষ্ট নয়। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বাধাবিপত্তি আসবেই। সঠিক গাইডলাইন পেয়েও তা যদি মেনে না চলি তবে লাভ হয় না। আমার জীবন থেকে আমি তা-ই উপলব্ধি করেছি। আমি জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষা পাশ করেছিলাম বান্দরবানে ডন বস্কো উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। স্কুলটা সব দিক দিয়ে ভালো এবং শিক্ষকেরাও ভালো গাইডলাইন দিতেন।

কিন্তু আমি সেই গাইডলাইন পালন করতাম না। কারণ মা-বাবা কাজের কারণে আমার থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আমাকে শাসন করার মতো কেউ না থাকায় ইচ্ছেমতো সময় অপচয় করতাম। ক্লাস শেষ হলে বন্ধুদের সাথে এদিক-সেদিক ঘুরতে যেতাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আমার পড়াশোনার প্রতি ভালবাসা ছিল। আমি সবসময় ক্লাসে প্রথম হতে চেয়েছি। শিক্ষকদের

সাথেও ভালো সম্পর্ক রাখতাম, যাতে আমি তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি। হলোও তা-ই। পরীক্ষার আগে কয়েক মাস শিক্ষকদের কথা মেনে চলার চেষ্টা করেছিলাম। দশম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে গেলাম। স্বাভাবিকভাবেই স্কুলের সকল শিক্ষক আমার থেকে ভালো কিছু আশা করা শুরু করলেন। বিশেষ করে তারা এ প্লাস আশা করতেন। কারণ আমাদের স্কুল থেকে এর আগে শুধু একজন বড় বোন এ প্লাস পেয়েছিলেন।

আমার লক্ষ্য সেটাই ছিল অথচ এসএসসি-তে যে সকল বিষয় আমি বুঝতাম এবং পারতাম সেই বিষয়গুলোতে ভালো রেজাল্ট আসে নি। জীবনে একটা ধাক্কা খেলাম। সবার আশা যেখানে এ প্লাস সেখানে পেলাম ৪.৭৮। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে একটাই প্রচলিত কথা, 'অনার্স' না হলে 'ডিগ্রি'। যদি কোনো সিনিয়রদের জিজ্ঞেস করতে যাই, বলে ভালো রেজাল্ট করার দরকার নেই, রেজাল্ট খারাপ হলেও ডিগ্রিতে ভর্তি হতে পারবে। এরকম একটি পরিবেশ থেকেও যে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারব তা কল্পনাতীত ছিল। আমাকে তখন পথ দেখানোর মতো কেউ ছিল না।

আমি ছোটবেলায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম। দুই দুইবার চেষ্টা করেছিলাম ভর্তি হতে। কিন্তু আমি ভর্তি হতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত বাবা এসএসসি পাশ করার পর আমাকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন।

আগেই বলেছিলাম, সফল হতে হলে একটা গাইডলাইন থাকা খুবই জরুরি। আমার ক্ষেত্রে সেই গাইডলাইন হচ্ছে কোয়ান্টাম কসমো কলেজ। এখানে যখন ভর্তি হলাম, প্রথমদিনেই অনেক কিছু লক্ষ করলাম, যেগুলো ছিল অজানা এবং জীবনে কখনো কল্পনাও করি নি। কী চমৎকার রুটিন!

পড়ালেখার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকা অনেক ভালো। আমার সাথে হয়েছিল এটা। হোস্টেলে তো সবাইকে একই নিয়ম পালন করতে হয়। একসাথে পড়তে হয়, একসাথে খেতে হয়। আমি দেখলাম কয়েকজন আমার সাথে লড়াই করতে নেমেছে, আমি যদি তিন ঘণ্টা পড়ি সে চার ঘণ্টা পড়ে। আর আমি যদি সকাল ৫টায় ঘুম থেকে উঠি, সেও ঝটপট উঠে যায়। আমিও আমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিলাম। সারাদিনের যে ক্লান্তি, সেটা আমাকে স্পর্শও করতে পারে নি। শুধু একটাই চিন্তা থাকত পড়তে হবে।

কলেজের নিয়মকানুন আমার অগোছালো জীবনটাকে পুরোপুরি সুশৃঙ্খল করতে বাধ্য করল। আমিও সেই নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। যথেষ্ট বিশ্রাম, পড়াশোনা, খাবার, খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়মের মধ্যে আমি দিন অতিক্রম

করেছিলাম। যতই দিন যাচ্ছিল ততই শিখছিলাম।

একসময় ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানার কৌতূহল সৃষ্টি হলো। এটা কী? কীভাবে চান্স পাব? কীভাবে পড়তে হবে? হঠাৎ একদিন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ভর্তি পরীক্ষার সহায়ক কিছু বই দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বইগুলো পড়তে এতই ভালো লেগেছিল যে, সেগুলো ছাড়তে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্যে অনেক সময় পড়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তারপরও আমি যতটুকু সময় পেয়েছিলাম পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি ঐ বইগুলো পড়ার চেষ্টা করতাম। কলেজে থাকার সময় ক্যাম্পাসের শাহীন ভাই, তিনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন, তিনি এ সম্পর্কে আরো ধারণা দিলেন। তখন থেকে আমার একটাই লক্ষ্য ছিল—আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাব।

এরপর আমি যখন কলেজের ২য় বর্ষে উঠলাম, তখন অলি ইসলাম নামে এক বড় ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯৯ তম হয়েছিল। এই খবর শুনে আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম—মেধাতালিকায় আমাকেও থাকতে হবে।

আমার একটা রুটিন ছিল এবং আমি প্রতিদিন সেটা অনুসরণ করতাম। অনেক পরিশ্রমের পর আমি স্বপ্নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮৯ তম হলাম। আমার এই সফলতার পেছনে শিক্ষকদের অবদানকে স্মরণ করছি।

আর নিয়মিত মেডিটেশনের গুরুত্ব অনেক। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, মেডিটেশনের শক্তি আজ আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। সেই সাথে সকলের দোয়া ও আশীর্বাদ সবসময় আমার সাথে ছিল। যারা আগামীতে ইউনিভার্সিটি ভর্তির প্রস্তুতি নিবে, তারা যদি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে মনছবি ঠিক রাখতে পারে তাহলে সাফল্যকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর এর সাথে অবলোকন করতে হবে জীবনের লক্ষ্য—আমি কী হতে চাই! □

মেধাকে সেবায় রূপান্তর করতে চাই

মো. হোছন
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটবেলা আমার খুব আনন্দে কেটেছে। ভোরে খাওয়াদাওয়া করে বাবা কাজে যেতেন আর বাবা যাওয়ার পরপরই আমি বই নিয়ে বের হতাম স্কুলের উদ্দেশ্যে। এত সকালে অবশ্য স্কুল শুরু হতো না। সকাল সকাল বের হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করা। মার্বেল, লাটিম খেলতাম এবং জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল বানিয়ে খেলতাম। আরো অনেক রকমের খেলা ছিল আমাদের। একটু বড় হওয়ার পর ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা শুরু করলাম। ফুটবল ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। বিকেলেও স্কুল ছুটির পর সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাটাতাম। মাঝে মাঝে বাজারে যেতাম টিভি দেখার জন্যে।

যখন আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, বেসরকারি এক সংস্থা থেকে আমাদের স্কুলে ছোট একটি লাইব্রেরি করে দেয়া হয়। সেখান থেকে আমার বই পড়ার হাতেখড়ি। এভাবে লামার ইয়াংছা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জেএসসি সম্পন্ন করলাম। শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা বললেন বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে। কিন্তু

আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। তাই বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন কক্সবাজারের চকরিয়ার একটি স্কুলে আমাকে ভর্তি করাবেন।

এতদিনের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমার এক শিক্ষকের সহায়তায় আমাকে চকরিয়া কেন্দ্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হলো। সেখানে ছাত্রাবাসে থাকতাম। এ অধ্যায়টা আমার জীবনের অনেক সুন্দর একটা সময়। খেয়াল করলাম, ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকে বীজগণিত আর পরিসংখ্যান ছাড়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলো কিছুই আমি পারি না। রসায়ন আর জীববিজ্ঞান একেবারেই পারি না। বুঝতে পারলাম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমি আসলে খেলাধুলা আর ঘোরাফেরা করে কাটিয়েছি, পড়াশোনা খুব কম করেছি। সেখানকার শিক্ষার্থীদের সাথে কোনোভাবেই পেরে উঠতে পারছিলাম না। ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করা যায়। তাই তাল মেলানোর জন্যে সবকিছু মুখস্থ করতে শুরু করলাম।

অবসর সময়গুলোতে খেলাধুলা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান সবকিছুই মুখস্থ করতাম আর নিচের ক্লাসের বইগুলো কিছু কিছু পড়ার চেষ্টা করতাম। এভাবে অন্যান্য বিষয়গুলোর সমস্যা কাটিয়ে উঠলেও জীববিজ্ঞান কম পারতাম। জীববিজ্ঞান ভালোও লাগত কম। আবার অনেক জনকে দেখেছি জীববিজ্ঞান খুব পছন্দ করে। তখন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভবিষ্যতে এমন বিষয় নিয়ে পড়ার চেষ্টা করব যেখানে জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত জিনিস কম পড়তে হবে।

এসএসসি পরীক্ষার মাসখানেক আগে আমরা যারা পরীক্ষার্থী ছিলাম আমাদেরকে আলাদা একটা কক্ষে থাকতে দেয়া হলো। সেখানে আমি পড়ালেখার পরিবর্তে মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ি। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হলো না। এবার কলেজে ভর্তি হওয়ার পালা। সবাই বলল চট্টগ্রাম বা ঢাকার কোনো কলেজে ভর্তি হতে।

কিন্তু বাবার পক্ষে আমার পড়াশোনার খরচ বহন করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব বাবাকে কোয়ান্টাম কসমো কলেজের কথা বললেন। আমাদের এলাকার আরেকজন সম্মানিত ব্যক্তি ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। ২০১৯ সালে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হলাম। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে যে জিনিসগুলো আমাকে আকৃষ্ট করেছে তা হলো আবাসন, স্থাপনা, বাগানসহ আরো অনেক কিছু।

এখানকার শিক্ষার্থীদের বলা হয় কোয়ান্টা। বাইরে যেটা দেখেছি সাধারণত ছোটরা বড়দের আগে সালাম দেয়। অনেকসময় কিছু মানুষকে আগে সালাম না দেয়ার কারণে বেয়াদব বলতে শুনেছি। এখানে এসে অন্যরকম চিত্র দেখতে পেলাম। আমাদের শিক্ষকরা এবং অন্য যারা দায়িত্বশীল আছেন, তারাই বেশিরভাগ সময় আগে সালাম দিচ্ছেন। এতে করে আমরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেষ্টা করি আগে সালাম দিতে।

ভর্তির পরে সাত দিনের একটা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ছিল। এই সাত দিনে অনেক কিছু শিখেছি এবং জেনেছি। এই স্কুল সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেয়েছি। সবচেয়ে ভালো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যারা নতুন ভর্তি হয়েছিলাম, পরস্পরের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল এই কয়েক দিনে। আমাদের সাথে অনেক ছোট, বড় এবং সহপাঠী কোয়ান্টা ছিল যারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পদক পেয়েছে। মনে করেছিলাম তারা খুব ভাব নিয়ে চলবে, যেহেতু অনেক জনের মধ্যে দেখেছি সামান্য অর্জনেও কত অহংকার! কিন্তু ওরা সবাই খুব বিনয়ী ও মিশুক ছিল।

প্রথমে নিজেকে গুছিয়ে নিতে একটু কষ্ট হয়েছিল। পরে একসময় হয়ে গেলাম প্রকৃত কোয়ান্টা। এভাবে খুব ভালোভাবে কেটে গেল আমার কোয়ান্টা জীবন। করোনার সময় আমাদের সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে দেশের সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। চিন্তা করলাম কী করা যায়। এমন সময় বন্ধু রাহিম হোসেন, সে-ও একজন কোয়ান্টা, সে বলল, আমাদের একটা পুরনো ঘর আছে। চাইলে আমরা সেখানে একসাথে পড়তে পারি।

সেই সময় আমরা চার জন—ফয়সাল, মোমেন, রাহিম আর আমি মিলে একসাথে পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা একটি রুটিন তৈরি করলাম এবং সেই রুটিনমাফিক পড়াশোনা চলল।

আসলে রুটিন অনুযায়ী আমরা চলতে শিখেছি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে। কারণ সেখানে সবকিছু রুটিনমাফিক চলে। এই সিদ্ধান্তটাই ছিল আমাদের সঠিক সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত। নিয়মিত ধ্যানচর্চার ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আমার জন্যে অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আমি প্রকৌশল গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম।

আমার জীবনের এইটুকু পথচলায় যে সকল ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান—আমার শিক্ষকবৃন্দ, আমার সহপাঠী, অগ্রজ, অনুজ এবং সর্বোপরি আমার পরিবার অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রয়োজনীয় সময়ে সাহস দিয়ে, দোয়া করে বা অন্য কোনোভাবে আমাকে সহোযোগিতা করেছেন সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার জীবনে এমন কিছু মানুষকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি যারা মানুষ হিসেবে খুবই অসাধারণ। আমার মা এবং বাবা হচ্ছেন আমার কাছে সেরা দুজন শিক্ষক যারা আমাকে ভালবেসেছেন এবং ভালবাসতে শিখিয়েছেন।

যেহেতু ছোট থেকে আমার বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি একটা আগ্রহ ছিল, তাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছাটা আমার সবসময় ছিল। আল্লাহ আমার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করার সুযোগ করে দিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার মাধ্যমে। এখন আমি এই পথেই নিজের মেধাকে বিকশিত করতে চাই। আরো চাই ভবিষ্যতে আমি একজন আদর্শ মানুষ হয়ে মানুষের সেবা করতে। আমি মনে করি, নিজের মেধা ও অর্জিত জ্ঞানকে সেবায় রূপান্তর করতে পারাই হলো জীবনের আসল সার্থকতা। □

এলাকায় আমার মতো জেগে উঠুক আরো অনেকে

পাঅং বম

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

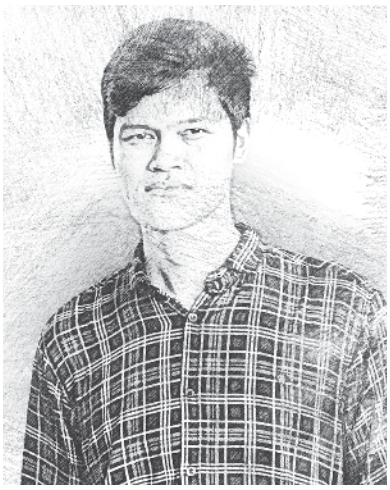

চার ভাই এক বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বাবা আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন (১ জানুয়ারি ২০০৭ সালে)। ভর্তি করানোর সময় আমি খুব কেঁদেছিলাম। তখন আমার কী-ই বা করার ছিল! জীবনে কিছু করতে হলে তো এসব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। যদিও ছোট্ট বয়সে এটা আমি বুঝি নি, কিন্তু আমার বাবা ঠিকই বুঝতে পেরে আমাকে এখানে দিয়ে গেলেন। সেই ছোট্ট পাঅং আজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সামর্থ্য অর্জন করেছে।

যখন আমি প্রথম কোয়ান্টামে আসি, তখন বাংলা ভাষা বলা তো দূরের কথা বুঝতেও পারতাম না। কিন্তু সে-সময়ে যারা আমাদের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন, তারা খুব আন্তরিকতার সাথে আমাদের আপন করে নিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যে বাংলা ভাষায় লিখতে, পড়তে এবং সাবলীলভাবে কথা বলতে

পেরেছিলাম। যত সময় যেতে লাগল আমার কাছে কোয়ান্টাম তত আপন হতে লাগল। একসময় মনে হতে লাগল—কোয়ান্টাম আমার নিজের পরিবার। আর কোয়ান্টামম আমার নিজের বাড়ি। কোয়ান্টামমের স্থাপনার বিশেষত্ব হচ্ছে—বেশিরভাগ ছাদের টিনের রং লাল।

দূর থেকে কোয়ান্টামমের লাল টিনগুলো যখন চোখে পড়ে, তখনই আমার মনের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। মনে হয়—এই তো আমি আমার বাড়িতে চলে এসেছি। এভাবে আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে পিইসি পরীক্ষায় ৪.৬৭, জেএসসি-তে ৫.০০ নিয়ে, এসএসসি পরীক্ষায় ৪.৭২ এবং এইচএসসি-তে ৫.০০ নিয়ে উত্তীর্ণ হলাম।

আমি শুধু লেখাপড়ায় নয় খেলাধুলাতেও নিজেকে বেশ এগিয়ে নিয়েছিলাম। টেবিল টেনিসে স্কুল ন্যাশনাল খেলায় আমি এবং আমার আপন চাচাতো ভাই রামহিম বম—দুজনে মিলে টানা চার বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আর আমাদের সাফল্য দেখে আমাদের ছোট ভাইয়েরা এই সাফল্য এখনো ধরে রেখেছে। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল আমাদের সুশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে রেখেছিল। সেখানে আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক ফিটনেসকে সুগঠিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগই আমার মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। কিন্তু এসব কিছু আমাদের সফলতাকে থামিয়ে রাখতে পারে নি। কোয়ান্টামে কাটানো প্রতিটি বছর আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমদিকে কোয়ান্টামে খেলার মতো কোনো ভালো মাঠ ছিল না, ছিল না ভালো ক্লাস রুম। ধীরে ধীরে সব গড়ে উঠল। আজ কোয়ান্টারা ভালো ভালো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বুয়েট, চুয়েট এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছে। এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে কঠিন পরিশ্রম আর বিশ্বাসে। আমাদের সিনিয়ররা যখন কলেজ পাশ করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাচ্ছিল, তখন থেকে আমার স্বপ্ন ছিল যে, আমিও পারব।

তাই আমি যত উপরের ক্লাসে উঠতে লাগলাম তত বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। অবশেষে আমি কঠিন পরিশ্রম ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি।

আজও আমি খুব মিস করি সেই জীবনটা। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত জেগে থেকে বন্ধুরা মিলে বসে গল্প করা, গান করা, হাসি-মজা করা। এই স্কুলের স্যারেরা আসলে এত আন্তরিক যে, তারা প্রতিটি কোয়ান্টাকে নিজের সন্তানের

মতো করে দেখেন, উৎসাহিত করেন, যা আমাদের সাফল্যের পথে অন্যতম কারক। কয়েকজন স্যারের নাম উল্লেখ না করে পারছি না, তারা হলেন—ছালেহ আহমেদ স্যার, মাহফুজ স্যার, ইমতিয়াজ স্যার, কলেজের আসাদ স্যার, জাহিদ স্যার এবং খ্রিষ্টফার স্যার।

তাদের মধ্যে জাহিদ স্যার এবং খ্রিষ্টফার স্যার আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার। খেলাধুলার জগতে জাহিদ স্যারের হাত ধরেই আমি প্রথম সফলতা পেয়েছিলাম। তার কাছ থেকে শিখেছি কীভাবে ধৈর্যধারণ করতে হয় এবং মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়।

খ্রিষ্টফার স্যার, যাকে আমি নিজের বাবার মতো সম্মান করি, তিনি আমার সাফল্যের পথে একজন সক্রিয় যোদ্ধা। তার প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে সবসময়ের জন্যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা। স্যারেরা আমাদের সব চাহিদা পূরণ করতে না পারলেও তাদের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিল না।

সবারই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকে, আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম না। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে নিজের পরিবারের পাশে, নিজের আত্মীয়দের পাশে এবং সমাজ ও দেশের পাশে দাঁড়াতে চাই।

আমার ইচ্ছা আছে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত, পথভ্রষ্ট তরুণ-তরুণীদের জন্যে কিছু করার। তাদেরকে আমি এই গাইডলাইন দিতে চাই যে, কীভাবে প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। না বোঝার কারণে অনেক উদীয়মান তরুণ-তরুণীর উজ্জ্বল জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি চাই আমার এলাকায় আমার মতো আরো অনেকে জেগে উঠুক, তারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুক। তাদের চেষ্টা যখন বাস্তবে রূপ নেবে, সমাজের জন্যে তখন তা আশীর্বাদ বয়ে আনবে। □

সৎ থাকতে চাই সবসময়

মো. বখতিয়ারুল ইসলাম

ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমি শুকরিয়ার সাথে বলতে পারি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আমি এবং আমার পরিবার বেশ ভালো আছি। আমরা পাঁচ ভাইবোন। বাবার একার উপার্জনে পুরো সংসার চলে। বাবার কৃষিকাজ দিয়ে আমাদের পড়াশোনা, ভরণপোষণের খরচ চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল ঐ সময়। কোয়ান্টাম সম্পর্কে পাড়ার লোকদের ও আত্মীয়স্বজনের নেতিবাচক কথা শোনার পরও আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাবা আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন নবম শ্রেণিতে। যখন বাবা আমাকে ভর্তি করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলেন, তখন বাবাকে আমার বড়ই একা মনে হচ্ছিল।

আল্লাহর রহমতে ক্যাম্পাসে যাওয়ার একবছরের মধ্যে পরিবারের অবস্থা পাল্টে যায়। বাবার হাত ধরে যখন এখানে এসেছিলাম, তখন বাড়ির অবস্থা ছিল ভাঙা। সেই বছর যখন আমি বার্ষিক ছুটি কাটাতে বাড়িতে যাই, তখন বাড়িটি নতুন করে ইট দিয়ে তৈরি শুরু হয়েছে। মায়ের সাথে ছুটির সময়ে একদিন গল্প করতে করতে জিজ্ঞেস করি, আমাদের পরিবারে উন্নতি হয়েছে।

কারণটা কী? মা আমাকে বললেন, তুমি কোয়ান্টামে যাওয়ার পর থেকে পরিবারে প্রত্যেক কাজে বরকত হচ্ছে। সেই দিন মায়ের একথা শুনে আমার খুব ভালো লেগেছিল।

সেইবার মা আর আমি খালের পাড়ে গরুর ঘাস কাটতে যাই। ঘাস কাটতে কাটতে দেখি খালের অপর পাড়ে তিনটি বরশিতে তিনটি শোল মাছ ধরা পড়েছে। মা আমাকে বলে, কেউ নাই নিয়ে আসো। আমি বললাম, মা আরেকজনের মাছ আমি আনব কেন? এই মাছ খেলেও দিন যাবে, না খেলেও দিন যাবে। মা আমার সততা দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন। আসলে ঐ দিনের ঘটনাটি ছিল আমার জন্যে পরীক্ষা। সেই দিন আমি পাশ করেছিলাম। কারণ আমি সৎ থাকতে চাই সবসময়।

বাড়িতে থাকাকালে 'ইউনিভার্সিটি' শব্দটা শুধু দোকানে খাতা কিনতে গেলে খাতার উপরে দেখতাম। ইউনিভার্সিটিতে যে আমি পড়ব তার স্বপ্ন কোনোদিনই দেখি নি। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে আমি কোয়ান্টাম মেথড ৪৩১ তম ব্যাচে অংশ নিয়েছিলাম। কোর্সের সব কথা আমি মনে রাখতে না পারলেও একটি কথা আমাকে প্রত্যেকটি কাজে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই অমর কথাটি হলো—তোমার দ্বারা সব সম্ভব।

কোর্সে গিয়ে আমি মনছবি ঠিক করি যে, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে। তাই আমি রুটিন অনুসারে পড়াশোনা শুরু করি। সত্যিকার অর্থে আমার মনছবি পূরণ হয়েছে।

আমি বাড়িতে থাকতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করি। সেখানে থাকতে আমি প্রায়ই স্যারদের মার খেতাম। কারণ আমার স্কুলে আসতে প্রায়ই দেরি হতো। যদিও স্কুলে ছাত্রছাত্রী এতই বেশি ছিল যে, বসার জন্যে পর্যাপ্ত জায়গা হতো না এবং দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হতো। কিন্তু কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পড়েছি বলে আমি সুন্দর একটা পরিবেশে পড়াশোনা, খেলাধুলা এবং কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মতো জীবন গড়ার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। বাড়িতে থাকতে আমি কখনো ভাবি নি এত ভালো পরিবেশে পড়তে পারব। ভালো ছাত্র হবো, ভালো খেলোয়াড় হবো, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব!

আমার সহশিক্ষা কার্যক্রম ছিল কাবাডি। ছোট বড় সবাই একসাথে কাবাডি খেলার মজাই ছিল আলাদা। এছাড়াও সপ্তাহে একদিন করে আমাদেরকে নির্দিষ্ট খেলার বাইরে ইচ্ছেমতো খেলার সুযোগ দিত। সেই একদিনের জন্যে আমরা সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করতাম।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের যে শৃঙ্খলা বা রুটিন তা প্রত্যেক মানুষের জন্যে দরকার। ক্যাম্পাসে থাকার সময় মনে হতো, যদি স্মার্টফোন পেতাম! কিন্তু এখন বুঝতে পারি স্মার্টফোন যদি আমার হাতে থাকত তাহলে আমার দ্বারা কিছুই করা সম্ভব হতো না।

আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করার পর আমি ক্যাম্পাসে থেকেই ইউনিভার্সিটি ভর্তির প্রস্তুতি নিলাম। অ্যাডমিশনের এত অল্প সময়ের মধ্যে বাইরে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, থাকা-খাওয়ার ব্যাপার সহজ না।

প্রস্তুতিরত অবস্থায় আমাদের যখন একেকজন একেকদিকে চান্স পেয়ে যাচ্ছিল, তখনো আমার কোথাও অ্যাডমিশন না হওয়ায় একটু আফসোস হচ্ছিল। সেই সময়ে স্যার-ম্যাডামেরা যে যেখানে আমাকে পেয়েছেন, সবাই সাহস জুগিয়েছেন। সবাই বলতেন যা হয়ে গেছে এটা নিয়ে চিন্তা করবে না। সামনে যেটা আছে ওটার জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুতি নাও। আসলে আমার মন খারাপ হলেও আমি সাহস হারাই নি। নিয়মিত মনছবি দেখতাম যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বই।

আমার শেষ পরীক্ষা ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষা দিতে গিয়ে অনেক কিছু খেয়াল করেছি। তার মধ্যে একটি হলো—যখন আমরা পরীক্ষা হলে প্রবেশ করি তখন দেখি অনেকে কথা বলছে, অনেকের আবার হাত-পা কাঁপছে কিন্তু আমি চুপ করে বসে থেকে মেডিটেশন করি, যা আমাকে পরীক্ষার হলে মাথা ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করেছিল। ২০২২ সালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে মেধাতালিকায় ১২ তম হলাম। এর পেছনের কারণ ছিল আমার স্কুল ও কলেজের স্যার এবং স্টাফদের সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও দোয়া। □

ভাবনার দুয়ার খুলে গেল

মো. আব্দুল মোমেন

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

২০০৭ সাল, তখন আমি শিশুশ্রেণিতে পড়ি। বাবার কাছে প্রথম জানতে পারলাম কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কথা। লেখাপড়া, খেলাধুলা করা যায় এমন এক স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি নিচ্ছে। বাবা আমাকে জানালে আমি প্রথমে রাজি হই নি। পরে পরিচিত একজন আমাকে রাজি করায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে।

কুয়াশাচ্ছন্ন এক সন্ধ্যায় ভারি কাপড় পরা দুজন ব্যক্তি একটি মোটরবাইক নিয়ে আমাদের গ্রামে আসেন। আমি স্কুলের খেলার মাঠ থেকে ময়লা কাপড় পরা অবস্থায় তাদের সামনে যাই। আমাকে বলা হয় ডান হাত মাথার উপর দিয়ে বাম কান ধরার জন্যে। আমি মনে করি, এটা পারলে মনে হয় আমি কসমো স্কুলে যেতে পারব। কিন্তু না, কান ধরার সাথে সাথে বলে দিল হবে না। আমি মন খারাপ করে চলে আসলাম।

কী আর করা! ২০০৮ সালে গ্রামের হযরত শাহ আব্দুল মালেক (রাহ) একাডেমিতে ভর্তি হই। আমাদের পাঁচ ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ বহন করা

বাবার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু বাবা চাইতেন কৃষিকাজ করে যেন তার সন্তান জীবনযাপন না করে। ২০০৯ সালে বড় ভাই কলেজে পড়ত, মেজো ভাই অষ্টম শ্রেণিতে। তাদের পড়ার চাপ বেশি থাকায় আমাকে বাবার কাজের সঙ্গী হতে হয়েছিল। এভাবে চলতে চলতে ২০১৩ সালে পিইসি পরীক্ষায় সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পাই।

আবারো আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তির কথা উঠল। কিন্তু তখন বাবা দিতে ইচ্ছুক নন। কারণ বাবার সঙ্গী বলতে কেউ থাকবে না। আমারও ইচ্ছে ছিল না। ২০১৪ সালে ভর্তি হই শাক্যমুনি উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমার পিইসি রেজাল্ট দেখে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ আমাকে খুব পছন্দ করতেন।

তখন থেকে বাবার সাথে নিয়মিত ক্ষেতে কাজ করে নিজের পড়ার খরচ নিজেকে বহন করতে হতো। ক্ষেতে কাজ করতাম আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। আমি আর আমার বাবা রাত ৩টা/ সাড়ে ৩টায় বাড়ি থেকে টর্চ লাইট নিয়ে বের হয়ে ভোর ৬টায় জমিতে পৌঁছাতাম। সেখান থেকে সবজি নিয়ে সকাল ৮টায় গ্রামের বাজারে নিয়ে যেতাম। তারপর স্কুলে যেতাম। মাঝে মাঝে ক্লান্তির কারণে স্কুলে যাওয়া হতো না। এভাবে চলতে থাকে আমার জীবন। লেখাপড়া খারাপ হতে থাকে। তাই শিক্ষকেরা আগের মতো খবরও নেন না। কয়েকজন শিক্ষক আমাকে আদর করে 'ফাঁকিবাজ' নাম ধরে ডাকা শুরু করলেন। পরিবারের আর্থিক অনটন আর কৃষিকাজের মতো কষ্টের মধ্য দিয়ে আরো দুটি বছর পার করলাম।

পাশাপাশি পড়াশোনা চলছে, জেএসসি মডেল টেস্ট দিলাম। আমার রেজাল্ট তেমন ভালো হলো না। আমার বড় ভাই, চাচাতো ভাই, বাবাসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে একটি মিটিং করলাম। আমার দাবি ছিল অক্টোবরে একমাস কাজে যাব না, বাড়ির কোনো কাজ করব না। পরীক্ষার পর নিয়মিত কৃষিকাজ ও বাড়ির কাজ করব। এমন না হলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। কারণ এসময়টা আমি পড়তে চাই।

পরে সবাই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমি একমাস পড়াশোনা করব। এই একমাস পড়াশোনা হলো রুটিন মতো। পরীক্ষা শেষ হলো নভেম্বরে। তারপর বাবা আমাকে বড় ভাইয়ের দোকানে কাজের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন লামায়। আমিও নতুন কাজ শিখতে আগ্রহী, তাই রাজি হয়ে গেলাম।

জেএসসি রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। আমাদের স্কুল থেকে চার জন গোল্ডেন এ প্লাস পেল। তাদের মধ্যে আমি একমাত্র আমাদের গ্রাম থেকে সকল

বিষয়ে এ প্লাস পাওয়া ছাত্র। পরিবারে সবাই অনেক খুশি হয়েছিল। আমি দোকানের কাজ ছেড়ে বাড়ি চলে এলাম। গ্রামে যারা শিক্ষিত তারা আমার বাবাকে বলতে থাকে আমাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করে দেয়ার জন্যে।

বাবা পড়ে যান মহাবিপদে। বাবারও স্বপ্ন জাগে আমাকে ডাক্তারি পড়ানোর। আর তিনি জানতেন এজন্যে অনেক টাকা প্রয়োজন। কিন্তু তখন আমার চিন্তা—আমি একজন ডেকোরেশন মিস্ত্রি হবো। কারণ এই কাজ অনেকটা আমার আয়ত্তে চলে আসে সে-সময়।

২০১৫-এর ডিসেম্বরে আমি জানতে পারলাম, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে শিক্ষার্থীরা লামায় আসবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। আমার আগ্রহ জন্মে তাদের একবার হলেও দেখতে যাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় দোকানে কাজের চাপ বেশি থাকায় তাদের দেখার সুযোগ হলো না, দেখলাম শুধু তাদের গাড়ি। ২০১৭ সালে হঠাৎ বাবা ফোন করে আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হবো কিনা। আমি কোনো উত্তর না দিয়েই কথা শেষ করি। পরে আমি আমার বড় ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে ভর্তির পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু আমার সেখানে ভর্তি হওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। অবশেষে আমাকে বসতে হলো ভর্তি পরীক্ষায়। আমাদের গ্রাম থেকে আমরা চার জন আসি, তার মধ্যে আমার চাচাতো ভাই একজন। আমরা দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা ভালোমতো পরীক্ষা দেবো না। কিন্তু বাবার দিকে তাকিয়ে মনে হলো—ভালোমতো পরীক্ষা দেই। লিখিত পরীক্ষা শেষ করলাম। চান্সও পেলাম। শুরু হলো আমার কোয়ান্টা জীবন।

প্রাকৃতিক পরিবেশ, শিক্ষকবৃন্দ ও কোয়ান্টাদের আচরণ আমাকে মুগ্ধ করল। ক্লাসে গিয়ে দেখলাম একেকজন একেকটি বিষয়ে অসাধারণ মেধাবী। অনেকের আবার খেলাধুলায় জাতীয় পুরস্কার আছে। তাদের দেখে আমারও ইচ্ছে হয় এই পুরস্কার অর্জনের। আমাকে দেয়া হয় ভলিবলে। এর মধ্যে নতুন ভর্তি হওয়া কয়েকজন কোয়ান্টা—আশরাফ আলী, ওসমান, সাকিব ও হ্লানুমং মার্মা আমার খেলার সঙ্গী হয়। বড় ভাই শৈক্যচিং, তিনি আমাকে অনেক পছন্দ করতেন। সময় পেলেই তার সাথে কথা বলতাম। তার কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে পারলাম।

কিছুদিন পর আমাদের ট্রেইনার বজলুর স্যার যোগ দিলেন। আমাদের পুরোদমে অনুশীলন শুরু হয়। আমরা স্বপ্ন দেখতে থাকি জাতীয় স্কুল

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। মাঠে চলে তুমুল প্রতিযোগিতা। আমাদের চান্স পেতে হবে ১২ জনের স্কুল টিমে।

একদিকে নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা অন্যদিকে ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় প্রতিযোগিতা। ডিসেম্বরে পরীক্ষা হলো। কিছুদিন পর রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। পাশও করলাম।

জানুয়ারিতে আমাদের খেলা শুরু। জীবনে প্রথম গ্রামের বাইরে স্টেডিয়ামে খেলা। ফাইনাল খেলায় আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। এটা ছিল কোয়ান্টাদের প্রথম ভলিবল জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। তারপর শুরু হয় আমাদের এসএসসি প্রস্তুতি। ২০১৯ সালে এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করে কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু বছর শেষ না হতেই চলে আসে করোনা ভাইরাস। তারপরও এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিলাম। এ প্লাস পেলাম। যদিও মেডিকেলে চান্স পেলাম না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হাতছাড়া হয় নি।

এখন মনে পড়লে অবাক লাগে, আগে চিন্তার পরিধি কত ক্ষুদ্র ছিল! আগে হতে চাইতাম ডেকোরেশন মিস্ত্রি। ভাবতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিয়ে বাড়িতে ডেকোরেশনের কাজ করাটা মস্ত বড় কাজ। অথচ কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে ভাবতে শুরু করলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। সেই ভাবনাটাই সত্যি হলো। আমি এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী।

২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ছিল আমার কোয়ান্টা জীবন। এসময় আমি শিক্ষকদের অনেক ভালবাসা পেয়েছি। আর শিখেছি ভালো আচরণ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। সবকিছুর জন্যে মহান আল্লাহর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। □

শিখেছি কীভাবে মানুষের সাথে মিশতে হয়

ক্য সাইন উ মার্মা
অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশিপ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় একদিন স্যার সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তুমি কী হতে চাও? উত্তর আমি ভাবতেও পারছিলাম না। কিছুক্ষণ ভাবার পর আমিও অন্যদের মতো বলে উঠলাম আমি ব্যাংকার হবো।

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় আরেকজন স্যার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন বলেছিলাম শিক্ষক হয়ে দুর্গম অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে শিক্ষার আলো ছড়াব।

যখন আমার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলো, তখন আমিও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মতোই ভুগেছিলাম। কারণ আমার মা-বাবার পক্ষে আমার লেখাপড়া করিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার সামর্থ্য ছিল না।

২০১৯ সালে আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই। তখন আমাদের একাডেমিক ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সাত দিনের

ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয়েছিল। সেখানে আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি।

সাত দিনের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করে যখন আমরা একাডেমিক পড়াশোনা করার জন্যে ক্যাম্পাসে যাই, তখন ওখানকার স্যার ও দায়িত্বশীলদের স্নেহ-ভালবাসা এবং অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। এই ক্যাম্পাসের সকল কার্যক্রম রুটিনমাফিক পরিচালিত হয়—এটা শুরু থেকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ক্লাসে যখন আমরা স্যারদের সান্নিধ্যে যাই, তখন বুঝতে পারি স্যারেরা বেশ দক্ষতার সাথে আমাদের পড়াচ্ছেন। সেই স্যারদের অবদানে আমি আজ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারছি।

আমি আমার শিক্ষকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের গুরুজী দাদুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমাদেরকে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছেন।

কোয়ান্টাম আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে মানুষের সাথে মিশতে হয়, কীভাবে মানুষ হয়ে বাঁচতে হয়। মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়। কারণ আমি মনে করি একজন মানুষ তখনই বড় হতে পারে যখন সে শুধু নিজের চিন্তা না করে আশেপাশের সবার সাথে মিলেমিশে থাকে। আর সমাজের বঞ্চিতদের জন্যে কাজ করে। আমিও আগামীতে এই বড় কাজটি করতে চাই। □

একজন আদর্শ ভাস্কর হয়ে বেঁচে থাকতে চাই মানুষের হৃদয়ে

হাস্তরাম ত্রিপুরা
ভাস্কর্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজ ২ অক্টোবর ২০২২। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবুও কয়েকটি ঝিঁঝিঁ পোকা নিজের উপস্থিতি বোঝানোর জন্যে ক্ষীণ স্বরে শব্দ করছে। বিকেলে খুব বৃষ্টি পড়েছে। হয়তো এজন্যেই এখন বাইরে মৃদু বাতাস বইছে। দক্ষিণমুখী জানালা দিয়ে শীতল বাতাস ভেতরে ঢুকছে। শরীর ও মনকে সজাগ করে দিয়ে রুমে দুয়েক পাক খেয়ে উত্তরের জানালা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। যতবারই ঠান্ডা মাতাল হাওয়া রুমের ভেতরে হানা দিচ্ছে, ততবারই যেন নিজের অতীতের চেহারা ভেসে আসছে। যেন নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি। নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি সেই শৈশবে মায়ের কোলে।

যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমার একটা পছন্দের খাবার ছিল শুঁটকি মাছ। বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসত। আর আমি বাড়িতে না ফিরে উঠানে খেলতাম। তখন মা করত কী—শুঁটকি পুড়িয়ে কড়া একটা ঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে

দিত। আমি সবকিছু রেখে বাড়িতে দৌড় দিতাম। এটা আমার মায়ের সহজসরল একটা পদ্ধতি ছিল নিজের সন্তানকে কাছে টেনে নেয়ার।

আমাদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে গল্পের আসর বসত। পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে বসে যেত। দেখতাম সবার হাতে একটা করে ছোট পানের কৌটা। কিছুক্ষণ পর পর পানের বোটা ছাড়িয়ে সুপারি আর চুন দিয়ে সুন্দর একটা আকৃতি তৈরি করে চোখ বন্ধ করে চিবোচ্ছে আর গল্প করছে। এভাবে কিছুক্ষণ চিবানোর পর যখন সেগুলো লাল রসে পরিণত হতো তখন সেই পানের পিকটার জায়গা হতো বাড়ির বিভিন্ন কোণায়। আমি অবশ্য বড়দের গল্পের কিছুই বুঝতাম না। মাথাটা মায়ের কোলে রেখে মায়ের পান তৈরি করা দেখতাম আর বড়দের গল্প করার ভঙ্গি দেখতে দেখতে সেখানেই ঘুমিয়ে যেতাম। পরের দিন সকালে দেখতাম মায়ের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে অথবা মাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছি। এভাবে চলে যাচ্ছিল দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর।

তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। মা আমাদের সবাইকে রেখে পরলোকগমন করেন। সেই থেকে আমার ঘুম, শান্তির ঠিকানা মিলিয়ে যায়। মায়ের একটা কোলের জন্যে ছোট বোন আর আমার ঝগড়া, রাগ-অভিমান সব আজ শুধুই স্মৃতি। এরপরে নয়-দশটা বছর কেটে গেল। আজকের দিনের আগের প্রত্যেকটা মুহূর্তও অতীত। তবুও মায়ের মৃত্যুর দিনটি এবং পরের দিনগুলোকে অতীত বলে মেনে নিতে পারি না। যদি কখনো কোনো সূর্যোদয়, ক্লান্ত অলস দুপুর অথবা পড়ন্ত বিকেলে অতীত মনে করিয়ে দেয়, তাহলে মায়ের আদরের স্মৃতিগুলোই মনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে। বাকি স্থানে থাকে কোয়ান্টামমে শৈশবে বন্ধুদের সাথে স্কুলে কাটানো দিনগুলো।

আমি ছোটবেলা থেকে খুব একগুঁয়ে। সবার সাথে তেমন মিশতে পারি না। কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যেতেই ভালো লাগত। সেই কল্পনার রঙ মিশিয়ে ছবি আঁকতে ভালো লাগত। যদিও সেই ছবিগুলো কোনোদিন কেউ নেড়েচেড়ে দেখত না। ছবি আঁকা, বিভিন্ন খেলার উপকরণ বানানো—এসব ছিল আমার পছন্দের বিষয়। আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন থেকে একটা লক্ষ্য ঠিক করেছি—পৃথিবী বিখ্যাত একজন ভাস্কর হবো। তার জন্যে আমাকে ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া দরকার। আমি সেই লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করলাম। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগও হয়ে গেল। আসলে আজ যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছি, তার পেছনে ছোট্ট একটা কাহিনী বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

এর আগে একটা কথা বলা প্রয়োজন। মা মারা যাওয়ার পর বাবা আলাদা থাকতেন। আমার সম্পত্তি হিসেবে ভিটেবাড়ি ছাড়া কিছুই ছিল না। এখন তো সেটাও প্রতিবেশীদের গোয়াল ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরিবারে চার বোন ও আমি একমাত্র ভাই। তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। এদিকে আমি আর ছোট বোন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুল-কলেজে দৌড়াচ্ছি। এইচএসসি পরীক্ষার পর আমার খুব চিন্তা হচ্ছিল কী করব? যদি ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হই তাহলে নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হবে। আর যদি চাকরি করি তাহলে পড়ালেখা ছাড়তে হবে।

কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পড়ি, তাহলে ভর্তি ফি কে দেবে? তাছাড়া আমার পরিবারে এমন কেউ ছিল না যে, আমার পড়ালেখার খরচ বহন করবে। বুঝতে পারছিলাম না কী করব! তখন মাথায় একটা চিন্তা এলো, যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারি, তাহলে সব সমস্যার সুন্দর সমাধান হবে। সে আশায় প্রস্তুতি শুরু করলাম এবং চান্স পেয়ে ভর্তিও হয়ে গেলাম। আমি আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারতাম না যদি কোয়ান্টাম পাশে না থাকত। আমার এই অনুভূতি হয়তো কেউ বুঝতে পারবে না।

আমি ছোটবেলা থেকেই বাবার কোনো আত্মীয়স্বজনকে কাছে পাই নি। আমাদের বাড়ি ছিল মায়ের এলাকায় অর্থাৎ নানার গোত্রের মানুষেরা যেখানে বাস করে। আজ এত দূর এসেছি, বাবার জন্মস্থানে কেবল একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু সেদিন হয়েছে কী—বাজারে বসে এলাকার বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলাম। হঠাৎ একটা মাঝবয়সী ছেলে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে আমি হাস্তরাম কিনা? আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। ও তখন বলল, সে নাকি আমার দূর সম্পর্কের ভাই। বাবার ভাইয়ের ছেলে। আমি মনে মনে ভাবছি অন্য কিছু, এতদিন যাকে চিনতামও না, সে-ও আজ আমার আত্মীয় ভাই হয়ে গেল। দুনিয়াটা আসলেই বিচিত্র!

আমি ছোট থেকেই কোয়ান্টামে বেড়ে উঠেছি। এককথায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের প্রত্যেকটা ধূলিকণা যেন আমাকে চিনে। কারণ ১৫-১৬টা বছর আমি এখানে থেকেছি।

মাঝে মাঝে গভীর রাতে একাকী বসে অতীতে হানা দিই। আমি বেশি

কথা বলতে পারি না। কিন্তু এর একটা উপকারও পেয়েছি। কথা বলতে ভালো না লাগার কারণে বেশি করে ভাবার সুযোগ পাচ্ছি।

বেশি ভালো লাগে কোনো বইয়ের গল্পের রাজ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে। যখন কোনো শিল্পীর ছবি অথবা ভাস্কর্য দেখতাম, তখন সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার কল্পনাতে কাহিনী তৈরি হয়ে যেত। এভাবেই শিল্প ও নান্দনিকতার সাথে পথ চলা শুরু। তাই ছোটবেলার স্বপ্নটা এখনো জেগে আছে—পৃথিবীর বিখ্যাত একজন ভাস্কর হবো। আমার কাজের জন্যে মানুষ আমাকে মনে রাখবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। মানুষের হৃদয়ে উষ্ণ আলো হিসেবে বেঁচে থাকব আমি। সেই লক্ষ্যেই অটল আছি। □

গহীন জঙ্গল থেকে আলোর পথে যাত্রা

রেংওয়ই ম্রো
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বান্দরবান সরকারি কলেজ

বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার কুরুকপাতা ইউনিয়নে, লাম্বু নামে এক নির্জন ও দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে আমার জন্ম। সেখানে শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করা দূর আকাশের তারার মতো। মা-বাবা শিক্ষিত না হলেও আমার জন্মের পর বাবা চাইতেন আমি যেন পড়াশোনা করি। কিন্তু মা এমনটা চাইতেন না। কারণ ঐসব অঞ্চলে অধিকাংশ মহিলার প্রত্যাশা—সন্তানরা বড় হয়ে জুমচাষ করে নিজের মা-বাবাকে দেখাশোনা করবে।

বাবা আগ্রহের সাথে আমাদের প্রত্যেক ভাইবোনের শিক্ষা অর্জনের পথ খুলে দিলেন। গ্রামে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকাতে বাবা ছিলেন আমার জীবনে প্রথম শিক্ষক ও প্রথম জ্ঞানের গুরু। বাবা বলতেন, তিনি মাত্র ছয় মাস 'সবুজ শিশু' নামের একটি বই পড়ে তার জীবনে লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটাতে বাধ্য হন। কারণ বাবা এতিম ছিলেন। তিনি তার নিজের থেকে যতটুকু সম্ভব আমাকে শিখিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন এবং আমি নিজেও শিখতে চেষ্টা করি।

বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন বাইরে কোথাও ভালো একটা স্কুলে আমাকে ভর্তি করাবেন। তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আমার চাচার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন।

এমন একটা সময় হঠাৎ করে মা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। যদিও পড়ালেখার ব্যাপারে মা এত বেশি বুঝতেন না। তবুও বাবার আগ্রহ দেখে তিনি আমাকে নিয়ে আশা করতেন যে, একদিন আমি গ্রামের বাইরে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করব। আমি অনেক বড় মানুষ হবো, এই ছিল তার প্রত্যাশা। মাত্র সাত বছর বয়সে মাকে হারালাম। বাবা তার বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত থেকে সরে যান নি। যেভাবে হোক তিনি আমাকে লেখাপড়া করাবেনই।

একবছর পর আমার চাচা আমাকে নিতে এলেন এবং লামার একটি মিশনারি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করালেন। আমি প্রথম আমাদের গ্রাম থেকে বাইরে এসে স্কুলে পড়াশোনা শুরু করলাম। কিন্তু আমাদের পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে একবছর পর আমার বাবা আর কোনো খরচ দিতে পারেন নি। তাই সেখানে আমি বেশিদিন লেখাপড়া করতে পারি নি। বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হই। কিন্তু বাবার সিদ্ধান্ত একটাই, যেভাবে হোক লেখাপড়া করাবেনই। একবার সে-সময় ভোটার তালিকাভুক্তি চলছিল। এ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের সাথে বাবা পরিচিত হন এবং আমাকেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারা ছিলেন আলীকদম আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের সাহায্যে ঐ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম। কিন্তু সেই হোস্টেলে কখনো কখনো খাবারের অভাবে থাকতে হতো। এভাবে প্রাইমারি স্কুল জীবন শেষ করলাম।

শুরু হলো হাই স্কুল। হাই স্কুলে এসে অষ্টম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষায় একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলাম এবং সে-বছর নবম শ্রেণিতে প্রমোশনের সুযোগ হলো না। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনকে নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে আবার মনোযোগ দিলাম পড়ালেখায়। মনে মনে বিশ্বাস করতাম, এই ফেল করা মানে আমার ব্যর্থতা নয় বরং আমার শিক্ষা জীবনের আরেকটা ধাপ শুরু। মনে মনে বিশ্বাস রাখলাম আমি অবশ্যই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবো।

পরবর্তী বছরে নবম শ্রেণিতে ওঠার সুযোগ হয়। কিন্তু নবম শ্রেণিতে ওঠার চার মাস পর ১ মে ২০১৭ বাবা মারা যান। আমার জীবনে নেমে আসে আরেকটা অন্ধকার সময়। মনে শুধু প্রশ্ন জাগে, কীভাবে এই পরিস্থিতিতে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া যায়? তখন থেকে বড় বোন, আমি এবং আমার ছোট ভাইকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব পড়ল আমার বড় ভাইয়ের ওপর। কিন্তু তার

আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তার স্ত্রীসহ তিন সন্তান নিয়ে কোনোরকমে সংসার চলে। তবুও তিনি নিজের ছেলেমেয়ের মতো আমাদের দেখাশোনা করতেন। কাউকে কমবেশি না করে সবাইকে সমানভাবে ভালবাসতেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি আমাকে এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে পড়ালেখা বন্ধ করার প্রস্তাব দিলেন। তার অবস্থা বুঝতে পেরে সাথে সাথে সম্মতি জানালেও মনে মনে ঠিক করলাম দিনমজুরের কাজ করে হলেও আমি পড়ালেখা চালিয়ে যাব। এভাবে দেখতে দেখতে চলে যায় হাই স্কুল জীবন। এবার আমি হলাম এসএসসি পরীক্ষার্থী। এসএসসি পরীক্ষা ততটা ভালো না হলেও বিশ্বাস করতাম আমি অবশ্যই পরীক্ষায় পাশ করব। ভেবে রেখেছিলাম কোনো একটা সরকারি কলেজে ভর্তি হবো।

একবার মনে হলো কোয়ান্টাম কসমো কলেজে পরীক্ষা দিয়ে দেখব। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে একটা ভর্তি ফরম সংগ্রহ করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গেলাম। সেখানে আরেকটা আনন্দের বিষয় হলো, প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাশে থাকা বন্ধু নিংথাওয়াং মার্মাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেখে খুবই খুশি হলাম। ভর্তি পরীক্ষা শেষ করে কর্তৃপক্ষ আমাকে কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিলেন। বন্ধু নিংথাওয়াংও সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেল।

তারপর কলেজে নতুন ক্লাস শুরু হলো। আস্তে আস্তে পরিচিত হলাম নতুন বন্ধুদের সাথে। নতুন যারা ভর্তি হয়েছে তাদের সবাইকে ব্যান্ড বাদনে দেয়া হয়। কেউ বাঁশি, কেউ ড্রাম বাজাতাম। আমি এবং আমার বন্ধু দুজন মিলে আমাদের পছন্দের বাদ্যযন্ত্র বাঁশি বেছে নেয়ার সুযোগ পেলাম। এর আগে কখনো হাতে এ ধরনের বাদ্যযন্ত্র ধরে দেখারও সুযোগ হয় নি।

শুনলাম প্রতিবছর নাকি ব্যান্ডদলকে ঢাকা জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে নিয়ে যাওয়া হয়। সমাবেশে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে খুব আগ্রহের সাথে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত করোনা মহামারির কারণে প্রোগ্রামটি হয় নি।

পড়ালেখার পাশাপাশি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব যেমন ঈদ, পূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা পালন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পিঠার উৎসব আয়োজন করা হয়। কখনো কখনো ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ভ্রমণে যেতাম।

এইচএসসি পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা শেষে আমাদের ক্যাম্পাসে 'ঘরে ফেরার আনন্দ উৎসব' আয়োজন করা হয়। সেখানে সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে, ফলে অনেক বড় ভাইবোনদের সাথে দেখা হয়।

কোয়ান্টাম কসমো কলেজে পড়ার সুযোগ পাওয়ার পেছনে কিছু মানুষের অনেক অবদান রয়েছে, তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আমি আমার বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তকে কাজে লাগিয়ে দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করতে পেরেছি। এখানে ভর্তি হয়ে মেডিটেশন করার সুযোগ পেয়েছি। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়েছে। এখন আমি বান্দরবান সরকারি কলেজে অনার্সে পড়ছি। পাশাপাশি কাজও করছি।

আমি উপলব্ধি করি, আমাদের ম্রো নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আমি দেখেছি কোয়ান্টামে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে উৎসাহিত করা হয়। আমাদের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্যে ম্রোদের 'ক্রামা' বর্ণমালা অধ্যয়ন করা উচিত এবং সেটাও কোয়ান্টামের এক বড় ভাই আমাকে উৎসাহিত করেছে। একসময় আমার মা-বাবা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন, আজ তারা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে অনেক খুশি হতেন।

আমার একটি অণু কবিতা—

ভাগ্য সবারই সমান নয়, সত্যি
কিন্তু সিদ্ধান্ত সবারই আছে।
ভাগ্য কখনো সিদ্ধান্ত নেয় না,
কিন্তু সিদ্ধান্ত সবারই ভাগ্যে
পরিবর্তন এনে দিতে পারে।

□

আমি পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রেখে যেতে চাই

মো. হায়দার আলী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

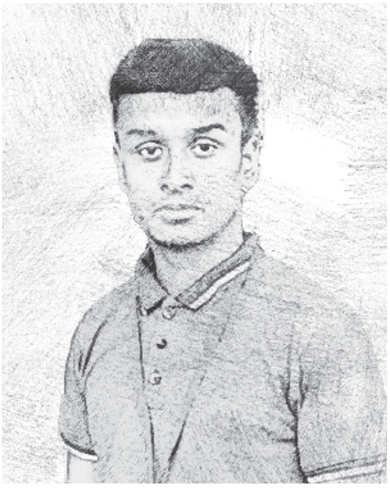

আমরা তিন ভাই, তিন বোন। বাবা রিকশা চালাতেন। কিন্তু পরিবার সম্পর্কে ছিলেন চরম উদাসীন। পরিবারে অভাব লেগেই থাকত। অভাবের সংসারে মা কখনো কখনো নিজে না খেয়ে আমাদেরকে খাওয়াতেন। বোনদের বিয়ে দিতে হয়েছিল যৌতুক প্রদান করে। যার ফলে আমাদের আর্থিক অবস্থা আরো নাজুক হয়ে যায়। কিন্তু আমার মাকে কখনো হার মানতে দেখি নি। মাকে দেখলে মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে তিনি এসেছেন আমাদের প্রত্যেক ভাইবোনদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্যে।

মা আমাদের ভাইবোনদের অনেক কষ্ট করে বড় করেছেন কখনো অন্যের বাড়িতে কাজ করে, মাটি কাটার কাজ করে, আবার কখনো কাঁথা সেলাইয়ের কাজ করে। তিনি যেভাবে পারেন আমার জন্যে টাকা জোগাড় করে দিতেন। তিনি না থাকলে হয়তো আজ আমি এত দূর আসতে পারতাম না। হয়তো কোনো ফ্যাক্টরিতে বা গার্মেন্টসে কিংবা অন্যের জমিতে কাজ করে জীবনযাপন করতে হতো।

আমিও পরিশ্রম করতে ভয় করি না। যখন আমি দশম শ্রেণিতে পড়তাম, তখন থেকেই নিজে উপার্জন করতে শিখেছি। ছোটবেলা থেকে আমি পড়ালেখার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলাম। অনেকে বিভিন্ন মন্তব্য করলেও একমাত্র আমার মা আজ পর্যন্ত বলে নি যে, বাবা তুই পড়াশোনা বাদ দে। তিনি হাসিমুখে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে আমাকে সাহায্য করেছেন। সুযোগ পেলে এখনো করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯। বাবা চলে গেলেন পরপারে। কিন্তু তখন আমার এসএসসি পরীক্ষা। বাবার মরদেহ বাড়ির আঙিনায় রেখে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। পৃথিবীতে নিজেকে তখন এক অসহায় মানুষ বলে মনে হয়েছিল। ধরে নিয়েছিলাম কপালে হয়তো এটাই লেখা ছিল।

তারপর যখন ভাগ্যান্বেষণের জন্যে জীবনে প্রথম পরিবারের বাইরে চলে গেলাম ঢাকায়, সেখানে গিয়ে মাটি কাটার কাজ করলাম। দিন শেষে মজুরি হিসেবে যা পেতাম তা জমাতে শুরু করলাম। কখনো খেয়ে, কখনো না খেয়ে থাকতে হতো।

সেখানে কাজ করা অবস্থায় আমার এক বন্ধু আমাকে ফোন করে জানায়, বান্দরবানে একটা স্কুল আছে, যেখানে দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনা করে। উত্তরে আমি বললাম, আমি সেখানে ভর্তি হতে চাই। একটা ফরম সংগ্রহ করে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম।

রংপুরের চানকঠি গ্রামে আমার বাড়ি। বাড়িতে বললাম, আমি বান্দরবান লামায় গিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। কিন্তু আমার পরিবার কোনো অবস্থাতেই রাজি নয়। তবুও পরিবারকে বুঝিয়ে, ভাইকে সাথে নিয়ে রওনা দিলাম সুদূর বান্দরবানে, কোয়ান্টামের উদ্দেশ্যে। সেখানে ভর্তি হলাম।

তারপর সাত দিন ওরিয়েন্টেশন ক্লাস করলাম। সেখানে শিক্ষক মহোদয় আমাদেরকে অনেক কিছু শেখালেন। তাদের আলোচনা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখাতে সহযোগিতা করল। মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বড় ভাইয়েরা আসতেন। তাদের সংগ্রাম ও সফলতার কথা তুলে ধরতেন। সেখান থেকে আমি অনুপ্রাণিত হলাম যে, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে।

তারপর পড়াশোনায় মনোযোগ দিলাম। ধীরে ধীরে সবকিছুই কেমন যেন আপন হতে শুরু করল। শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসা, বড় ভাইদের আদেশ উপদেশ এবং আদর-যত্ন যেন আমাকে ভাবিয়ে তুলল। লেখাপড়ার প্রতি

আগ্রহটাও বেড়ে গেল। আমি পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে শুরু করলাম। ২০২১ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলাম। চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে সাধারণ বৃত্তিও পেলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিয়ে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

আজ দূরে এসেও সেই কোয়ান্টামমের স্মৃতিগুলো এখনো আমাকে নাড়া দেয়। যখন ক্যাম্পাসে ছিলাম তখন এই মায়ার মর্মটা বুঝতে পারি নি। আর গুরুজী দাদুর একটি বাণী আজও আমার মনে আছে। তিনি বলতেন— বেশিরভাগ সফল ব্যক্তিই শুরু করেছিল একদম শূন্য থেকে এবং তারা অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের।

আমিও সংকল্পবদ্ধ যে, একদিন সফল হবো। আমার এই সাফল্যের রোল মডেল হলেন আমার মা। আমার মনছবি একদিন পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। আমি পৃথিবীর বুকে চিহ্ন রেখে যেতে চাই। □

জীবনের কাছে কখনো হার মানি নি, মানব না

হ্লানুমং মার্মা

পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

একসময় আমাদের পারিবারিক অবস্থা ভালোই ছিল। গ্রামের একমাত্র টিভি ছিল আমাদের বাসায়। গ্রামের সবাই আমাদের বাড়িতে টিভি দেখতে আসত। আমার বাবা ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি গাছের ব্যবসা করতেন। তাছাড়া আমাদের হাঁস, মুরগি, গরু ছিল। জমি চাষের জন্যে পাওয়ার টিলার মেশিনও ছিল।

একদিন বাবাকে কয়েকজন মিলে মদ খাইয়ে দিয়ে বিভিন্ন কথা বলে বিভ্রান্ত করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। বাবা বাড়িতে এসে জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করলেন। তখন আমি ছোট ছিলাম। খুব ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। তারপর থেকেই আমার বাবার আচরণে আমরা পরিবর্তন লক্ষ করি। দিন দিন বাবা অন্যদের কথায় প্রভাবিত হয়ে বাড়িতে সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলেন। একসময় আমাদের পরিবারটা ভেঙে গেল। মা চলে গেলেন নানির বাড়িতে এবং আমি চলে যাই দাদির বাড়িতে। আর বাকি চার ভাইবোন বাবার

সাথে বাড়িতে থেকে গেল। আমার বয়স তখন চার বছর। দাদির বাড়িতে কিছু বন্ধু পেলাম আমি। তাদের সাথে খেলতাম। আমার বন্ধুরা যখন স্কুলে যায়, তখন আমি তাদের দেখতাম আর ভাবতাম—আমিও যদি তাদের মতো পড়ালেখা করতে পারতাম! অন্যদের স্কুলে যেতে দেখে একদিন দাদিকে বললাম, দাদি আমিও পড়াশোনা করতে চাই। পড়াশোনা করে শিক্ষিত হতে চাই। আমার আগ্রহ দেখে দাদি আমাকে স্থানীয় একটা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আমি নিয়মিত দাদির বাড়ি থেকে স্কুলে যেতাম ও মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে লেখাপড়া করলাম।

এরপর যখন শুনলাম মা বাড়িতে ফিরে এসেছেন, আমিও বাড়িতে চলে এলাম। এর মধ্যে বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার চিকিৎসার জন্যে বাড়িতে হাঁস-মুরগি যা আছে এমনকি পাওয়ার টিলার মেশিনসহ সব বিক্রি করে দেয়া হলো। কিন্তু বাবাকে কোনোভাবেই বাঁচানো গেল না।

তারপর থেকে আমার জীবন অন্যরকম হয়ে গেল। আমাকে মাটি কাটার কাজ করতে যেতে হতো। মায়ের সাথে কাঠ কাটতে যেতে হতো। কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে কোনোমতে তিন বেলা খাবার জুটত। সকালে প্রায় ঘণ্টাখানেক হেঁটে স্কুলে যেতাম। কখনো কড়া রোদ, কখনো ঝড়ের মধ্যে যেতে হতো স্কুলে। বাড়িতে কোনো বিদ্যুৎ ছিল না। কুপি বাতি জ্বালিয়ে পড়াশোনা করতাম। কোনো সময় তেল না থাকার কারণে মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়াশোনা করেছি। এভাবে জেএসসি পরীক্ষা দিলাম।

শুরু হয় আরেক সমস্যা। নবম শ্রেণিতে ভর্তি হতে টাকা লাগবে। মাসে মাসে বেতন, তাছাড়া বই কেনা থেকে শুরু করে স্কুল ড্রেস। না পেরে একদিন মা আমাকে ডেকে বললেন, বাবা তুমি পড়াশোনা ছেড়ে দাও। মায়ের সেই কথা শোনার পর আমি প্রতিদিন আড়ালে গিয়ে কান্না করতাম। কিন্তু তাকে বুঝতে দিতাম না।

সেই দুঃসময়ে মেজো দুলাভাই আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন, শুনেছি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল নামে বান্দরবানে একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। তুমি চাইলে সেখানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দেখতে পারো। পড়াশোনা খুব ভালো, তাছাড়া থাকা-খাওয়া, কাপড়চোপড় সব ফ্রি। আমার মা বললেন এরকম প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেলে তো অনেক ভালো। সে-সময় আমি কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম যাতে পরে কোনো স্কুলে ভর্তির সময় অসুবিধা না হয়। সেই জমানো টাকা থেকে কিছু টাকা দুলাভাইকে দিলাম

যাতায়াত খরচের জন্যে, তার সাথেই চলে এলাম কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে।

পরের দিন আমার ভর্তি পরীক্ষা হলো। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। প্রায় সপ্তাহখানেক পার হলো। কোনো খবর নেই। চিন্তায় পড়ে গেলাম। একপর্যায়ে খবর এলো আমি ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ভর্তির নির্দিষ্ট তারিখে এলাম আমার মা আর দুলাভাইয়ের সাথে। ভর্তির দিনে দেখি আমিসহ মাত্র পাঁচ জন ভর্তি হতে এসেছে। আমি অবাক হলাম এতজন পরীক্ষা দিল অথচ আমরা মাত্র পাঁচ জন ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছি! আমার সেই প্রথম বন্ধুরা হলো রিগ্যান চাকমা, আব্দুল মোমেন, আশরাফ আলী এবং উযওয়াং মার্মা। ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে সন্ধ্যায় মা আর দুলাভাইকে বিদায় দিলাম। মা অনেক কান্না করেছিলেন। আমিও কান্না করেছিলাম।

এরপর থেকে আমার নতুন পরিচয় হলো কোয়ান্টা। ভর্তি হলাম নবম শ্রেণিতে। একসপ্তাহ ধরে ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম চলল। প্রোগ্রাম করাতেন আমাদের মামুন স্যার ও জহুরুল হক স্যার। কোয়ান্টামে এসে 'মেডিটেশন' শব্দের সাথে পরিচিত হলাম। মেডিটেশনে মনছবি, মনের বাড়ি কিছুই জানতাম না। পরে ধীরে ধীরে নিয়মিত সাদাকায়ন ও আলোকায়নে অংশগ্রহণ করে মেডিটেশন করতে শিখলাম। আমার লক্ষ্য ঠিক করলাম এবং মনছবি দেখতে শুরু করলাম।

একসপ্তাহ পর আমাদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে খেলার সুযোগ দেয়া হলো। আমি পেলাম ভলিবল। ভলিবলের নাম আমি অষ্টম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা বইতে পড়েছি কিন্তু বাস্তবে খেলি নি, খেলতেও দেখি নি। ভলিবল খেলতে গিয়ে পেলাম আমার খেলাধুলার অভিভাবক বজলুর রশিদ স্যারকে। তার হাতেই আমার খেলাধুলার হাতেখড়ি।

কিছুদিন পর আমাদের স্কুল ড্রেস দেয়া হলো। ড্রেস পরে গেলাম স্কুলে। সেখানে পেলাম আমার স্কুলের অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক শরিফুল আলম স্যারকে। আমাদের নতুন বই দিয়ে তিনি ক্লাসে পাঠালেন। প্রথমে একটু খারাপ লেগেছিল। কারণ নতুন পরিবেশ, নতুন জায়গা, তাছাড়া পরিচিত কেউ নেই। ক্লাসে শিক্ষকদের সাথে পরিচিত হলাম। ক্লাসে প্রত্যেক শিক্ষককেই আমি শুধু পাঠদানকারী নয় বরং জীবনের অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে পেয়েছি। এভাবে কোয়ান্টাম আমার নতুন বাড়ি হয়ে উঠল এবং নতুন একটা পরিবার পেলাম। সিনিয়র জুনিয়র অনেক ভাই পেয়েছি। অবসর সময়ে ছোট ভাইদের আমার সংগ্রামের গল্প বলতাম। এই স্মৃতিগুলো কখনোই ভুলতে পারব না।

একদিন বজলুর স্যার বললেন, আন্তঃস্কুল খেলা হবে। ভালো করে প্র্যাকটিস করা দরকার। যে ভালো খেলবে সে আন্তঃস্কুল খেলায় যেতে পারবে। রীতিমতো কঠোর অনুশীলন করতে লাগলাম। আমাদের একটাই লক্ষ্য, চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে। কারণ তার আগে কোয়ান্টাম ভলিবলে কখনোই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। ১২ জন খেলোয়াড় বাছাই করা হলো, তাদের মধ্যে আমি একজন। আমাদের প্রিয় জাহিদ স্যার খেলতে যাওয়ার আগের দিন আমাদের ১২ জনকে অফিসে ডেকে 'চীনা মুরগি'র গল্প শোনালেন। গল্পের মর্মার্থ হলো—আমাদের বাহ্যিকভাবে দেখে যেন মনে হয় আমরা তেমন কিছু পারি না। কিন্তু মাঠে যখন নামব তখন যেন আমাদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সামনে কেউ টিকতে না পারে। অর্থাৎ বিনয় ও দক্ষতা অর্জনের শিক্ষাই তিনি দিতেন আমাদের।

আমাদের বিশ্বাস ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে আমরাই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে নেব। ২০১৭ সালে জাতীয় পর্যায়ে খেলা হলো বরিশালে। আমি প্রথমবারের মতো ট্রেনে যাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। সেইবার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ভলিবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়। এটা আমার জীবনের পাতায় অনন্য একটি স্মৃতি।

আমার জীবন পরিবর্তনের আরেকটি দিক হলো কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। কোয়ান্টাম মেথড ৪৩১ তম ব্যাচে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলাম নবম শ্রেণির শেষের দিকে। কোর্সে এসে নিজেকে নতুনভাবে অনুভব করলাম। আমি কে? পৃথিবীতে কী জন্যে এসেছি। আমার কী করা উচিত? আমি উপলব্ধি করলাম আমার এমন কিছু করা উচিত যার কারণে আমি বেঁচে না থাকলেও মানুষ আমাকে মনে রাখবে।

এসএসসি পরীক্ষা এলো। কিন্তু আমার আন্তঃস্কুল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেশা পেয়ে বসেছে। মাঠে অনুশীলন শেষ করে দৌড়ে যেতাম পড়াশোনা করতে। কোচিং শেষ করে আবার মাঠে দৌড়। আমরা আবার দ্বিতীয় বারের মতো অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলাম। এসএসসি পরীক্ষার সাত দিন আগে জাতীয় পর্যায়ে খেলা শেষ হয়। খেলা শেষ হলে আমাদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়া হলো চট্টগ্রামের ফয়েজ লেকে। সাথে ছিলেন আমাদের অধ্যক্ষ প্রিয় ছালেহ আহমেদ স্যার। সাধারণত ফাইনাল পরীক্ষার আগে আমরা প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় অংশ নিই না। কিন্তু সেবার আমাদের আগ্রহ খুব বেশি থাকায় অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছি।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসার পর পড়াশোনায় মনোযোগ দিলাম। পরীক্ষা দিলাম। মানবিক থেকে এ গ্রেড পেলাম। কলেজে উঠলাম। কলেজে এসে পেলাম আসাদুজ্জামান স্যারকে। কলেজে অনেক আনন্দ করেছি। পিঠা উৎসব করেছি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি, গান করেছি। কলেজে ১ম বর্ষ শেষ হতে না হতেই শুরু হলো করোনা মহামারি। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হলো। তাই কোয়ান্টাম থেকে সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো।

বাড়িতে গিয়ে আবার কাজ শুরু করলাম। কখনো জমিতে মাটি কাটার কাজ, কখনো রাস্তা মেরামতের কাজ। নিজের জুমেও কাজ করেছি। জুমের ধান কাটার পর পা দিয়ে মাড়াই করতাম। পা দিয়ে ধান ভানতে ভানতে আমার পায়ের পাতা ফেটে রক্ত বের হতো। সেইবার মায়ের হাতে নিজের উপার্জনের কিছু টাকা দিতে পারলাম। তারপর ক্যাম্পাসে আবার ডাকা হলো। শিক্ষা বোর্ড আমাদের একটা শর্ট সিলেবাস প্রকাশ করল। তাই সবাই ক্যাম্পাসে চলে এলাম। নিয়মিত প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিলাম।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন টেস্ট। সবাই যার যার মতো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে প্রস্তুতি নেয়া শুরু করল। কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার মতো টাকা পরিবারের বা আমার হাতে ছিল না। আবার বাড়ি গেলেও পরিবেশের কারণে আমার পড়াশোনা হবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ক্যাম্পাসে থেকে প্রস্তুতি নেব। শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে গেলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাটা এসেছে আমার মূলত এই স্কুলে এসেই। কারণ বাড়িতে থাকার সময় মনে করতাম বিশ্ববিদ্যালয় পড়তে হলে বিদেশে যেতে হয়। আসলে এখানে এসে আমি আমার জীবনকে সাজিয়েছি। কোয়ান্টাম আমাকে শিখিয়েছে স্বপ্নের পেছনে দৌড়াতে আর পরিশ্রম করতে। এখন আমি বিশ্বাস করি আমার দ্বারা সব সম্ভব।

আমার মতো একজন শিক্ষার্থীর বেড়ে ওঠার পেছনে কোয়ান্টামে যারা কাজ করছেন ও শ্রম দিচ্ছেন সবার কাছে আমি চিরঋণী। এখানে তারা মা-বাবার মতো আমাকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। □

দেশের মানুষের জন্যে কাজ করতে চাই

উচিনচো রাখাইন
ব্যাংকিং এন্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমি রাখাইন সম্প্রদায়ের ছেলে। আমাদের সম্প্রদায়ে মানুষের শিক্ষার হার কম। মূলত আর্থিক সমস্যার কারণে তারা শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না। আমাদের সাথে অনেক মেধাবী রাখাইন শিক্ষার্থী পড়ত। কিন্তু তারা আর্থিক সমস্যা ও নেতিবাচক পরিবেশের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর আর পড়াশোনা করতে পারে নি।

কক্সবাজার সদরে দক্ষিণ রাখাইন পাড়ার চৌফলদন্ডী নামক এক গ্রামে আমার জন্ম, সেখানেই বেড়ে ওঠা। আমি পরিবারের বড় ছেলে। আমার বাবা একটা ছোট্ট মুদি দোকান চালান আর মা গৃহিণী।

ছোটবেলা থেকে আমার পড়াশোনা করতে ভালো লাগত। এটার অবশ্য একটা কারণ আছে। আমার বাবা নিজে তেমন শিক্ষিত না হলেও পড়াশোনাকে গুরুত্ব দিতেন। ছোটবেলায় তিনি আমাকে পড়িয়েছেন। প্রাইমারি স্কুল বাড়ির পাশেই ছিল। কিন্তু হাই স্কুলে ওঠার পর তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে অথবা গাড়িতে করে যেতে হতো। প্রায়ই টাকা না থাকার কারণে হেঁটে স্কুলে যেতাম।

আমি একটু লাজুক স্বভাবের ছিলাম। তাই মানুষের সাথে কম মিশতাম। ক্লাসে আমি একাই রাখাইন ছিলাম। আমার কয়েকজন রাখাইন বন্ধু পাশের স্কুলে পড়ত। এভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাসা থেকে পড়াশোনা করেছি।

জেএসসি পরীক্ষার পর খালার বাসায় লামাতে বেড়াতে যাই। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের এক সিনিয়র ভাই আমার খালুর পরিচিত। তার সাথে আমার বাবারও পরিচয় হয়। তিনি আমাদেরকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ও এই স্কুলের কথা বলেন এবং পরে ঐখান থেকে ভর্তির একটা ফরম সংগ্রহ করতে বলেন। আমার খালুও আমার বাবাকে উদ্বুদ্ধ করেন। বাবা সেখানকার পরিবেশের কথা শুনে ভর্তি করানোর জন্যে রাজি হয়ে যান।

আমি ২০১৭ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হই। এখানে এসে অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বড় ভাইয়েরা পড়ালেখায় অনেক সাহায্য করত। যখন ছুটির দিনে স্যার থাকতেন না, তখন তাদের রুমে পড়া বুঝতে গেলে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন।

আর একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগত, সেটা হলো গুরুজী দাদুর প্রোগ্রাম। বিশেষ করে কোয়ান্টামমে তার সাদাকায়নের আলোচনা এবং মেডিটেশন আমার পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল। এভাবেই চলতে থাকল। এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৬৭ নিয়ে উত্তীর্ণ হলাম।

বাসায় থাকতে কোনোদিন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতাম না। এই স্কুলে আসার পর আমি জানতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। কলেজে ওঠার পর আমাদের একাডেমিক বইয়ের সাথে অ্যাডমিশন প্রস্তুতির জন্যে বিভিন্ন বই দিতেন স্যারেরা। আর মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা এসে ক্লাস নিতেন। কলেজে প্রথম বর্ষের পর করোনা পরিস্থিতির কারণে আমি বাসায় গেলাম। বাসায় গিয়ে ক্যাম্পাসের মতো আর পড়াশোনা হলো না।

করোনা মহামারির কারণে পরিবারের আর্থিক সমস্যা আরো বেড়ে যায়। ফলে পড়াশোনার সুযোগটা সেভাবে হয় নি। পরীক্ষার তিন মাস আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলে যায়। তখন আবার ক্যাম্পাসে চলে আসি। পরীক্ষার আগপর্যন্ত স্যারেরা যত্ন সহকারে আমাদের সিলেবাস সম্পন্ন করে দেন। জিপিএ ৪.৮৩ নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হই।

অ্যাডমিশন কোচিং করার জন্যে বাসায় যাই। আমার পরিবার তখনো করোনার কারণে যে আর্থিক সমস্যায় পড়েছিল সেখান থেকে উঠতে পারে নি।

আরেকটা বিষয়, এসময় আমার ফুফু যদি আমার পড়াশোনার খরচ বহন না করতেন, তাহলে মনে হয় আমার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফরমও তুলতে পারতাম না। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় আমাদেরকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অফিসে থাকা এবং খাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল।

আসলে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে আমার আসার মূল কারণ ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থা। পড়াশোনার পরিবেশ ভালো ছিল না আমাদের এলাকায়। আবার আমাদের আর্থিক অনেক সমস্যাও ছিল। যার কারণে আমাকে এখানে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন আমার বাবা। এখন মনে হয়, এই বাধ্য হওয়াটা আমার জন্যে মঙ্গলজনক হয়েছে। আসলে ভগবান মানুষকে কোনো না কোনো দিক দিয়ে রক্ষা করেন।

ক্যাম্পাসে যারা আবাসিক হলের দায়িত্বে ছিলেন, তারা আমাদের নিজের সন্তানের মতো দেখাশোনা করেছেন। আর ক্লাসের শিক্ষকেরাও অনেক আদর করে পড়াতেন। একবার বুঝতে না পারলে যতক্ষণ পর্যন্ত না বুঝতাম ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিতেন। আর রাতের বেলা তারা আমাদের ক্লাস রুমে আসতেন। কেউ দিনের ক্লাসে পড়া না বুঝলে রাতের বেলা রিক্রিয়েশন ক্লাসে শিক্ষকেরা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন।

কোয়ান্টামে থাকাকালে আমার কিছু বিষয় খুব মজা লাগত। যেমন শুক্রবারে সবাই একসাথে ঝিরিতে গিয়ে মাছ ধরা এবং রাতে একসাথে বসে মুভি দেখা। ভালো পারফরমেন্সের জন্যে আমাদের গিফট টোকেন দেয়া হতো। কোয়ান্টামমে পহেলা বৈশাখ আর ঈদে মেলা বসত। ঐ সময় এই টোকেন দিয়ে খাবার ও খেলনা নিতাম। তারপর রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়াটা আরো মজার ছিল।

২০২২ জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ ২০ বছর পূর্তি হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের। এ উপলক্ষে 'ঘরে ফেরার আনন্দ উৎসব' আয়োজন করা হয়। এই দিনটি আমার জীবনের বিশেষ একটি দিন। সবচাইতে মজা হয়েছিল আবার সবাইকে একসাথে পেয়ে আর একসাথে সময় কাটাতে পেরে। এই দিনটি আমার এতই ভালো লেগেছে যে, বলে বোঝানো সম্ভব নয়। যে বড় ভাইদেরকে ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম তাদের সাথে আবার দেখা হয়েছিল। আর প্রিয় বন্ধুদের সাথে আবার আনন্দ করতে পারলাম।

২০১৭ থেকে ২০২১—এসময় আমার সম্পূর্ণ খরচ কোয়ান্টাম কসমো

স্কুল বহন করেছে। এই পাঁচ বছর কোয়ান্টামে থেকে শিষ্টাচার, নৈতিকতা, মেডিটেশন করতে শিখেছি।

আরো বেশ কিছু বিষয়ে আমি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি। যেমন বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা থাকে। আমারও ছিল। কিন্তু কোয়ান্টামে অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা দেখে আমার সব ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়েছে।

আমি চাই আমাদের রাখাইন সম্প্রদায়ের তরুণরা যেন ভালো পর্যায়ে যেতে পারে। আমি সফল হয়ে তাদের সামনে ভালো একটা দৃষ্টান্ত গড়ে তুলতে চাই। আর দেশের সকল মানুষের কল্যাণের জন্যে মহৎ কাজে অংশ নেব—এটাই আমার লক্ষ্য। □

আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ পেয়েছি

নিয়াজ মাহমুদ গৌরব

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা কলেজ

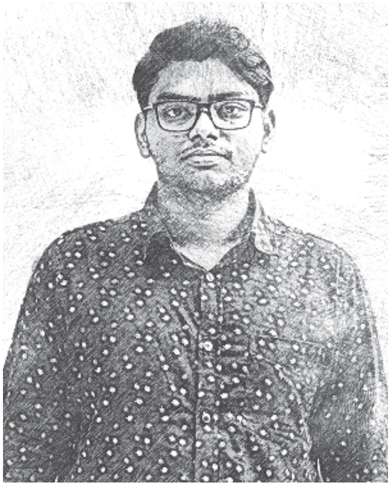

আমার জন্ম ঢাকার সাভারে। কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে যাওয়ার আগপর্যন্ত সাভারে ছিলাম আমার মায়ের সাথে। বর্তমানে আমি ঢাকা কলেজে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে স্নাতক করছি। আমার মা একজন গৃহিণী। কোয়ান্টামের সাথে পরিচয়টা মায়ের সুবাদেই। আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে কোয়ান্টামের বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতাম। তখন ছোট ছিলাম তেমন কিছু বুঝতাম না। কিন্তু আমার ভালো লাগত।

আমার নানির সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতাম। একসময় কোয়ান্টামের সাথে ভালোভাবে পরিচিত হই এবং এখানে যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তখনই জানতে পারি। এমনিতে আমাদের পরিবারের অবস্থা তেমন ভালো না। তাই আমার নানি আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

আমি কোয়ান্টামে ভর্তি হওয়ার পর আমার মা আমাকে হিকমান ক্যাম্পাসে দিয়ে আসলেন। ক্যাম্পাসে গিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণের পর মা আমাকে বিদায় জানিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমি অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম।

যেহেতু তখন অষ্টম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা ছিল, তাই কাগজপত্র এবং পড়ালেখা নিয়ে আমার একটু অসুবিধা হয়েছিল। তার ওপর নতুন একটা পরিবেশ। বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকা। তাই আমার কাছে একটু অন্যরকম লাগত। সবকিছু আমার কাছে খানিকটা জটিল মনে হতো।

যতই প্রতিবন্ধকতা অনুভব করি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আমাকে এখানে থাকতেই হবে। শুরুতে আমার সাথে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। ভর্তি হওয়ার দুই-তিন দিন পর্যন্ত আমার ক্লাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মানে আমি যে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছি এটার কোনো স্লিপ তখনো স্কুলে আসে নি।

যেহেতু আমার সামনে বোর্ড পরীক্ষা তাই আমার মা একটু অস্থির হয়েছিলেন যে, কখন ক্লাস করতে পারব আমি। আবাসিক হল থেকে আমাকে স্কুল ড্রেস দেয়া হলো। আমি নিয়মিতভাবে স্কুলে যেতাম। স্কুলের একজন স্যার আমাকে একটা আইকিউ পরীক্ষা নিয়েছিলেন। স্যার আমাকে বললেন, সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হতে। আমি মনে মনে ভাবলাম সপ্তম শ্রেণি পার করে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্যে এসেছি! তবুও আমি চুপ করে থাকলাম। স্যার আমাকে একজন ম্যাডামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাডামও আমাকে একই কথা বললেন, অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হতে।

আমি ম্যাডামকে বললাম, ম্যাডাম! তাহলে আমার তো একবছর গ্যাপ হয়ে যাবে। আমাকে বললেন, তুমি কি তাদের সাথে টিকে থাকতে পারবে? আমি বললাম, তারা যদি পারে তাহলে আমিও পারব। আমি চ্যালেঞ্জটা নিলাম। কারণ যেহেতু আমি আগে থেকে মেডিটেশন করতাম। তাই মানসিকভাবে প্রশান্ত ছিলাম। আমি মনোবল হারালাম না।

এরপর স্যার আমাকে বললেন, একমাস সময় দেয়া হলো। আমি বললাম, ঠিক আছে স্যার আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। তারপর থেকে পড়াশোনা শুরু করলাম। ঠিক একমাস পর পরীক্ষা হলো। আমি ভালো রেজাল্ট করলাম। স্যার আমাকে আর কিছু বললেন না। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আত্মবিশ্বাস ও ভাবনার শক্তি কত গুরুত্বপূর্ণ। এটাই ছিল আমার জীবনে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা যে, কীভাবে চাপের সম্মুখীন হয়েও স্থির চিন্তা এবং আত্মবিশ্বাসের

মাধ্যমে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষকেরা খুবই আন্তরিক। তারা এতটা পরিশ্রমী তা আসলে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সকালে তাড়াতাড়ি চলে আসতেন, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও রাত পর্যন্ত আমাদেরকে পড়াতেন। এককথায় একজন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করতেন। বাইরের স্কুলে আমি এরকম কোথাও দেখি নি।

এরপর জেএসসি পরীক্ষা দিলাম। নবম শ্রেণিতে উঠে আমি মানবিক বিভাগে ভর্তি হলাম। স্যারেরা আমাকে বিজ্ঞান বিভাগ নিতে বলেছিলেন। তারপরও আমি মানবিক বিভাগ নিয়েছিলাম। কারণ আগে থেকে আমার ইচ্ছে ছিল মানবিক বিভাগে পড়ার। এভাবে এসএসসি পরীক্ষা চলে আসল। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমার একটা অসুখ ধরা পড়ল। ডাক্তার বললেন, অপারেশন করতে হবে।

এদিকে আমার এসএসসি পরীক্ষা আবার অন্যদিকে আমার রোগ। এতে আমার পড়ালেখার একটু সমস্যা হয়ে যায়। তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সিদ্ধান্ত নিলাম পরীক্ষার পর আমি অপারেশন করাব। দোয়া ও হিলিং প্রার্থনায় নাম দিলাম। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, পরীক্ষার পরে স্কুলের দায়িত্বেই আমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে অপারেশন করানো হলো। আসলে কোয়ান্টাম আমাকে সে-সময় শুধু লেখাপড়াই করায় নি, আমার চিকিৎসার যাবতীয় খরচও বহন করেছে।

কয়েকদিন পর এসএসসি রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। আমি ৪.৬৭ পেলাম। তারপর ভর্তি হলাম কলেজে। এইচএসসি-তে আমি এ প্লাস পেলাম, সাথে চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে বৃত্তিও পেলাম! আসলে ভাবনা যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা কোয়ান্টামে না এলে হয়তো বুঝতে পারতাম না। আমার চেতনা, ধ্যানধারণা, মনছবি সবই কোয়ান্টাম থেকে শিখেছি। গুরুজী দাদুর একটি কথা আমি সবসময় মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তা হলো—ভাবুন, বিশ্বাস করুন, অর্জন করুন, সারা পৃথিবী আমার।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে থাকাকালে আমি বাস্কেটবলে সক্রিয় হই। এতে আমার ফিটনেস বেড়ে যায়। ফলে যে-কোনো চ্যালেঞ্জ সহজে মোকাবেলা করতে পারতাম।

আর এখানে দেখলাম অনেক ধরনের জনগোষ্ঠীর ছাত্ররা একসাথে থাকে। মনে হয় সবাই একটা পরিবারের অংশ। সবাই একসাথে পড়ালেখা করি,

একসাথে খেলি। আমি নিজেকে কখনো অসহায় ভাবতাম না।

এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে যাব সঙ্ঘকে ভালবেসে আরো নতুন উদ্যমে। সবকিছুর জন্যে অবদান রয়েছে মেডিটেশনের। আমার মা, নানি এখনো কোয়ান্টামের সাথে সংযুক্ত আছেন। আর আমি অনার্স পড়ার পাশাপাশি কোয়ান্টামের সাথে খণ্ডকালীন কাজ করছি। আসলে কোয়ান্টামের সাথে যখন থাকি, তখন আমি সর্বোচ্চ ইতিবাচক থাকতে পারি।

তাই আমার কাছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন একটি সৎসঙ্ঘ। আর সৎসঙ্ঘের প্রতিটি কাজ একেকটি ইবাদত। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমাকে এই সৎসঙ্ঘের সাথে সংযুক্ত করে দেয়ার জন্যে। □

ভালো কিছু পেতে হলে প্রয়োজন ধৈর্য ও পরিশ্রম

রবি শংকর চাকমা
জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট স্টাডি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আমার বাড়ি রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলায় ফকিরাছড়ি গ্রামে। আমি ছিলাম এক দুরন্ত কিশোর। সারাক্ষণ খেলাধুলা করতাম। পড়াশোনায় আমার একদম মন বসত না। আমার মনে হয়, ছোটবেলায় যদি আমাকে ফুটবল অথবা যে-কোনো ধরনের খেলাধুলায় প্রশিক্ষণ দেয়া হতো, আমি একজন ভালো খেলোয়াড় হতে পারতাম। এখানো মাঝে মাঝে এটা আমি ভাবি।

ক্লাস ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত আমি গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করেছি। আমি ক্লাসে তেমন ভালো ছাত্র ছিলাম না। স্যারদের কাছ থেকে লেখাপড়া না পারার কারণে বকা আর মার খেতাম প্রায়শই। ক্লাসে আমার রোল সবার শেষে ছিল। কোনোমতে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতাম। সবসময় আমাকে পরিবার আর স্কুল থেকে বলত, আমার দ্বারা লেখাপড়া হবে না। অথচ এখন সেই ক্লাসের মধ্যে আমি একমাত্র ছাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি!

২০১৫ সালে রাঙ্গামাটি জেলা সদরে মোনঘর আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ে

সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হই। সেখানে আমি এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে একবছর পড়াশোনা করি। তারপর ২০১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে হোস্টেলে উঠে যাই। অবশ্য এই স্কুলে পড়ানোর সময় আমার পরিবারকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। আমরা নিম্নবিত্ত পরিবার ছিলাম। আমি ছাড়াও আমার ছোট ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ বাবাকে চালাতে হতো।

একটা নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে সেটা কতটা কষ্টের ছিল, তা একজন মানুষ সে অবস্থানে না থাকলে বুঝতে পারবে না। মোনঘর স্কুল থেকেও স্কলারশিপ দিত। যদিও আমি আমার পরিবারের অবস্থার কথা বলে স্কলারশিপ নিতে পারতাম। লজ্জায় আমি বলতে পারতাম না। তখন ভয় আর লজ্জা আমাকে অনেক প্রভাবিত করত।

আমি সেই স্কুলে চার বছর পড়াশোনা করি। ২০১৯ সালে আমি এসএসসি পাশ করি। সেই স্কুলেও অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম। শিক্ষকেরাও চেষ্টা করতেন খুব ভালো করে পড়াতে। এ কারণে আমাকে বাইরে কোচিং করতে হতো না। হাই স্কুলে আমার পড়ালেখারও কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। এসএসসি-র পর আমার বাবা আমাকে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি করে দেয়ার জন্যে অনেক জনের সাথে যোগাযোগ করেন। আমার ভর্তি হওয়ার কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পরিবারের কথা ভেবে আমি ভর্তি হই। আমি আগে যে স্কুলে ছিলাম সেখানে আবাসিকে থেকে কলেজে পড়াশোনা করতে পারতাম। এছাড়া সেখানে কম্পিউটার ভালোভাবে শেখাত। এ কারণে আমি সেখান থেকে আসতে চাচ্ছিলাম না।

কোয়ান্টামে আসার আগে আমাকে বিভিন্ন কথা শুনতে হয়েছিল। আমি যে আবাসিক স্কুলে ছিলাম, সেখান থেকে আমি আসার আগে সহপাঠীরা আমাকে বলত 'কী রে! নিজের ধর্ম বদলাতে সেখানে যাচ্ছিস নাকি'। এসব কথা শোনার পরেও প্রভাবিত হই নি। কারণ যে-কোনো ভালো জিনিস পেতে হলে ধৈর্য এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

২০১৯ সালে কসমো কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হই। প্রথমদিকে যখন আসি কিছুই বুঝতে পারতাম না। যদিও এখানে আসার আগে শুনেছি যে, সেখানে রুটিন মাফিক চলতে হয় এবং বিভিন্ন নিয়ম আছে সেগুলো পালন করতে হয়।

অবশ্য এগুলো নিয়ে আমি বেশি চিন্তা করি নি। কারণ আমি হোস্টেলে থেকে অভ্যস্ত। ক্যাম্পাসে থাকতে থাকতে একপর্যায়ে জীবন সম্পর্কে ভালো

করে জানতে পারলাম। আমি আগে যে স্কুলে ছিলাম সেখানে জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই নি। মনছবি কী, কীভাবে মনছবি পূরণ করতে হয় তা জানতাম না। কোয়ান্টামে এসে আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমার দ্বারা সব সম্ভব। কারণ এখানে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথে সফল হওয়ার জন্যে নানা সূত্র আমি জেনেছি।

সত্যি বলতে এখানে এসে প্রথম আমি ইউনিভার্সিটি বিষয়ে ভালোভাবে জেনেছি। স্কুলে থাকতে আমি ভাবতাম, এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর তো কলেজে ভর্তি হবো। তারপরে আমি কোথায় ভর্তি হবো এই নিয়ে তখন মাঝে মধ্যে ভাবতাম।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা ছুটি পেলে আমাদের পড়াতে আসতেন। কীভাবে ভার্সিটিতে ভর্তি হতে হয়, কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়, কখন থেকে শুরু করতে হয়, কী কী বইয়ের প্রয়োজন হয়—এগুলো সম্পর্কে তারা ধারণা দিতেন।

এভাবেই একসময় ভগবানের দয়ায় রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট স্টাডি বিভাগে আমার পড়ার সুযোগ হয়। আমি আশা করছি একদিন এই সাবজেক্ট নিয়ে বড় কিছু করতে পারব।

গুরুজী দাদুর যে কথাটা আমার সবচাইতে ভালো লাগে সেটা হলো—জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করা। এটা আমি নিজে অনুসরণ করার চেষ্টা করি। আসলে কোয়ান্টামে এসে আমি পড়াশোনার জন্যে একটা ভালো পরিবেশ পেয়েছিলাম। বলতে গেলে একটা সুখী জীবন পেতে হলে যে নিয়মগুলো অনুসরণ করা দরকার তা কোয়ান্টামে এসে আমি শিখেছি।

নিয়মিত খাওয়া থেকে শুরু করে পড়ালেখা ও খেলাধুলা সবই সময়মতো করতাম। জীবনে সফল হতে হলে সময় যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এখানে এসে ভালোমতো বুঝতে পেরেছি।

কলেজেও অনেক ভালো করে পড়াশোনা করতে পেরেছিলাম। কারণ বাইরে যখন ছিলাম, এসএসসি-তে ৩.৬১ পেয়েছিলাম। আর এখানে এসে এইচএসসি-তে ৪.৫৮ পেলাম।

কোয়ান্টাম কসমো কলেজে থাকতে যে জিনিসটা খুব ভালো লাগত তা হচ্ছে, এই স্কুল ও কলেজের কোনো ছাত্রের ক্লাসে রোল নম্বর নেই। ভর্তির সময় যে কোয়ান্টা নম্বর অর্থাৎ আইডি নম্বর দেয়া হয়, সেটা দিয়েই তারা পরিচিত হয়। আমার ধারণা রোল নম্বর দিলে ছাত্রদের মধ্যে মেধার দিক দিয়ে

তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, যে ছাত্র নম্বর কম পায় বা যাদের রোল নম্বর পেছন দিকে তারা অনেক সময় হীনম্মন্যতায় ভোগে। তখন তাদের মনে হয় যে, আমার দ্বারা প্রথম হওয়া সম্ভব নয়। আমি ছোটবেলায় এই সমস্যার ভুক্তভোগী ছিলাম। এজন্যে এখানকার এই সিস্টেমটি আমার খুব ভালো লাগে।

ভবিষ্যতে অনেক বড় স্বপ্ন আছে আমার। এই স্বপ্নগুলো পূরণ করতে হলে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আমার বিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমি স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারব। একদিন আমিও হবো হাজার হাজার মানুষের ভরসাস্থল। সুখে-দুঃখে তখন আমিও তাদের পাশে থাকব। আমি একজন অনন্য মানুষরূপে নিজেকে বিকশিত করতে চাই, যার কাজ হবে অন্যের সেবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করা। □

দেশের ব্যাংকিং সিস্টেমে ভালো কিছু করতে চাই

সৈয়দ শফিকুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

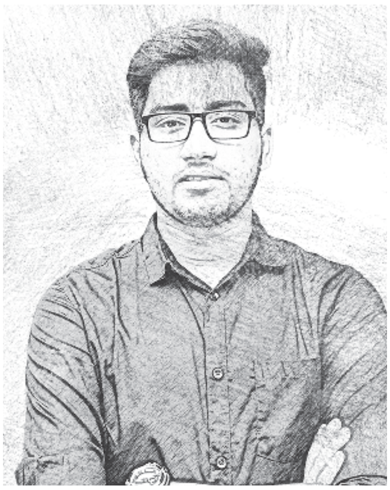

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় আমার বড় দুলাভাইয়ের মাধ্যমে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কোয়ান্টামের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত।

২০১৯ সালে আমি এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেছি। কলেজে পড়ার জন্যে আমার দুলাভাই কোয়ান্টাম কসমো কলেজের কথা বললেন। আমারও সেই কলেজে পড়ার আগ্রহ ছিল। এতদিন কোয়ান্টামের সেবামূলক কাজের কথা শুনে তাদের প্রতি এক ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে একটি ঘটনা আমার আগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। আর তা হলো ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা। সেখানে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ অংশগ্রহণ করে। সেই দিন কোয়ান্টাদের পারফরমেন্স এবং তাদের দক্ষতা আমাকে ভীষণভাবে

অনুপ্রাণিত করে। বার বার মনে হয়েছিল—আমিও যদি সেখানে ভর্তি হতে পারি, তাহলে এমন দক্ষতার অধিকারী হতে পারব।

এছাড়াও আমার চারপাশের পরিবেশ পড়াশোনার জন্যে উপযোগী ছিল না। আমি যেখানে থাকতাম সে জায়গায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্যে মানুষের তেমন আগ্রহ ছিল না। অনেকেই মাধ্যমিক শেষ করে চাকরিতে চলে যায়। এছাড়াও ধূমপান ছিল আমার কিছু বন্ধুদের নিয়মিত সঙ্গী। এমন একটা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে নিজ আগ্রহে কোয়ান্টাম কসমো কলেজে ভর্তি হই।

আমার মা-বাবা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এবং আলোকিত মানুষ গড়ার ভূমি কোয়ান্টামম সম্পর্কে আমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকেই জেনেছিলেন। এখানে এসে আমি আদর্শ, আলোকিত মানুষ হবো এই বিশ্বাসই ছিল তাদের, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। যেহেতু আমি বাইরের পরিবেশে বড় হয়েছি, তাই কোয়ান্টামমে প্রথমে এসে এই পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়েছে। আর সেই কষ্টের ফল এখন পাচ্ছি। আমি এমন একজন মানুষ হতে পেরেছি, যে-কোনো পরিবেশে যে মানিয়ে নিতে পারে। যদি বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে বলতে হবে, আমার জীবন বদলাতে এবং জীবনের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কোয়ান্টামের ভূমিকার কথা।

আসলে এখানে আসার আগে নেতিবাচকতার সাগরে ডুবেছিলাম। এই নেতিবাচকতা বলতে আমার হীনম্মন্যতা এবং যে-কোনো কাজে সংশয়। যদিও কিছুটা আত্মবিশ্বাস ছিল কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম। আগে আমি কোনো কাজের উদ্যোগ নিলে তা পরিপূর্ণভাবে শেষ করতে পারতাম না। সবসময় মনে হতো—পারব, নাকি পারব না? এই কথা ভেবে আর কাজটা করা হয়ে উঠত না। লক্ষ্য নির্ধারণে ছিল নানারকম প্রতিবন্ধকতা। যখন আমি লক্ষ্য নিয়ে ভাবতাম যে, আমি কিছু একটা হবো তখনই আবার মনে হতো—না, এটা আমাকে দিয়ে সম্ভব না, আমি এটা কখনোই পারব না।

আমার মনে আছে, যখন আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি তখন স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষার কথা বলল। যারা পরীক্ষা দিতে চায় তারা যেন নাম দেয়। আমার আত্মবিশ্বাস এতটা কম ছিল যে আমি সেই পরীক্ষাতে নাম দিতেই সাহস পেলাম না। অবাক করার বিষয় ছিল ক্লাসে আমার থেকে কম পারা ছাত্রটাও একসময় মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ হলো। আসলে এখন বুঝতে পারছি তখন আমার কীসের অভাব ছিল। আমাকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে এমন কেউ আমার পাশে ছিল না।

আরো একটি ঘটনা—যখন হাই স্কুলে পড়তাম, তখন আমি কখনোই স্কুলের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতাম না। কারণ ভাবতাম আমি আমার অন্য বন্ধুদের সাথে কখনো প্রতিযোগিতায় পারব না। আমার মনে হয়, তখন একদিকে যেমন ছিল আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং হীনম্মন্যতা, অন্যদিকে ছিল ক্ষুদ্র লক্ষ্য।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে ভর্তির আগে ইনচার্জ ছালেহ আহমেদ স্যার আমাকে ফোন করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি এখানকার প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে থাকতে পারব কিনা। যদিও আমি তখন স্যারকে বলেছিলাম, 'হ্যাঁ স্যার, পারব'। কিন্তু ফোনে কথা বলা শেষ করেই মাথায় ঢুকে গেল সংশয়। ঐখানে থাকতে পারব কিনা এই চিন্তা।

তারপর কসমো কলেজে গিয়ে প্রথমে যে কথাটি শিখেছি তা হলো, 'আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী আমি পারি আমি করব, আমার জীবন আমি গড়ব'। প্রথমে একথাগুলো তেমন না বুঝলেও এখন এর মর্মার্থ বুঝতে পারি। বলতে গেলে যত সময় যাচ্ছে ততই এ কথাগুলো আমি অন্তরে ধারণ করছি।

পাশাপাশি কলেজে প্রতিদিন মেডিটেশন করতাম, যা আমাকে আমার চিন্তাভাবনা, আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করেছে। মেডিটেশন প্রতিটি মানুষের জন্যে উপকারী। বিশেষ করে আত্মপর্যালোচনার জন্যে।

আগে শখ ছিল ক্রিকেট খেলা। কিন্তু এখানে এসে ভালোলাগার আরো একটি বিষয় বেড়ে গেল, তা হলো বই পড়া। কেননা আমাদের কলেজের লাইব্রেরিতে রয়েছে কয়েক হাজার বইয়ের সমারোহ, যা আমাকে বিভিন্ন বই

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের নিকটস্থ এলাকা কেয়াজুপাড়ায় পরিচ্ছন্নতা করসেবা

পড়ায় আগ্রহী করে তুলেছে। পাশাপাশি এখানে যেহেতু স্মার্টফোন ব্যবহার করা যায় না, তাই অনায়াসে বই পড়ার মতো ভালো অভ্যাসটা তৈরি হয়ে যায়।

নিঃস্বার্থ সেবা এবং এখানকার মানুষের আন্তরিকতা আমার খুবই ভালো লাগে। এখানকার মানুষের সর্বদা অন্যের উপকার করার মানসিকতা আমাকে মানবপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে। কোয়ান্টাম কসমো কলেজে থাকাকালে সবচেয়ে আনন্দের অভিজ্ঞতা হলো—নিকটস্থ এলাকা কেয়াজুপাড়ায় পরিচ্ছন্নতা করসেবা। আমরা পুরো কেয়াজুপাড়া বাজারটা পরিষ্কার করতাম। আমরা একসাথে ৫০০ কোয়ান্টা অনেক আনন্দ নিয়ে কাজ করতাম।

কোয়ান্টামে এসে আমার ইচ্ছে জন্মেছিল আমি চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এবং বৃত্তি পাব। আলহামদুলিল্লাহ! আমি এইচএসসি পরীক্ষায় আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছিলাম। আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সরকারি তিতুমীর কলেজে ব্যবস্থাপনায় পড়ছি।

আমাদের প্রিয় গুরুজী দাদুর সাথে সাক্ষাৎ করাটা ছিল আমার জন্যে একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। সেই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম ২০১৯ সালে ৪৬৪ তম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া তিনি প্রায়ই আমাদের কলেজ ক্যাম্পাসে আসতেন, আমাদের সাথে দেখা করতেন। একবার এমন হলো যে, তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি খুব ভয়ে ভয়ে তার পেছনে থেকে তাকে সালাম দিয়েছিলাম। দাদু ঘুরে সালামের উত্তর দিয়ে হাসি দিলেন, আর আমার ভয় তখনই উধাও। আমার এখনো মনে পড়ে তার সেই হাসিমাখা মুখের কথা।

আমার মনছবি হলো—আমি একদিন বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেমে ভালো কিছু করব ইনশাআল্লাহ। আমি আমার এ মনছবি পূরণের মাধ্যমে দেশের জন্যে কিছু করতে চাই। দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্যাবলি পরিবর্তন করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে চাই। ব্যবসায়ীদের জন্যে এমন একটি ব্যাংক ব্যবস্থা করতে চাই যাতে নতুন ও পুরাতন উদ্যোক্তাদের মূলধনের সমস্যায় পড়তে না হয়। স্বপ্ন দেখি একসময় আমাদের দেশ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে সফলতার শিখরে পৌঁছে যাবে। ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব! □

মনছবি ছিল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকব

জসাইমং মার্মা
গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের পরিবারে ছিল চার জন সদস্য। কিন্তু আমি একটু বড় হতে না হতেই সৃষ্টিকর্তা দুই জনকে নিয়ে নেন। প্রথমে আমার বড় ভাই, যার কোনো স্মৃতিই মনে নেই। তার কয়েক মাস পর মা মারা যান। তখনো আমি মায়ের দুধ খাওয়া ছাড়ি নি। মা যখন মারা যান আমি চুপচাপ তাকিয়ে ছিলাম। মনে করেছিলাম মা শুয়ে আছেন। মাকে যখন শ্মশানে নেয়া হচ্ছিল তখন আমি মনে করেছিলাম, মা আমার জন্যে বাজার থেকে বিস্কুট আনতে যাচ্ছেন।

এরপর নানি আমাকে মায়ের মতোই দেখাশোনা করেছেন। আমার এখনো এসব কথা মনে আছে। নানি এখনো বেঁচে আছেন।

২০০৬ সালে বাবা আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করানোর জন্যে নিয়ে আসেন। তখন পাঁচ বছর বয়স হবে আমার। আমাদের বাড়ি থেকে

কোয়ান্টামে আসতে সে-সময় কষ্ট হতো। রাস্তাঘাট ভালো ছিল না। বাড়ি থেকে আসতে হতো ১০ বা ১৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে। তারপর নৌকায় করে তিন-চার ঘণ্টার পর পেতাম গাড়ি। এভাবে আমরা কোয়ান্টামে এসেছিলাম। ভর্তি পরীক্ষা দিলাম এবং সুযোগ পেলাম ভর্তি হওয়ার।

ভর্তি হওয়ার পর একটা রুমের এক কোণায় চুপ করে বসেছিলাম। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। বাবার চোখ দিয়েও পানি পড়ছিল। সবচেয়ে বেশি কেঁদেছিলেন আমার নানি, যিনি আমাকে লালনপালন করেছেন। বাবা যখন নানিকে বললেন, জসাইমংকে এখানে রেখে যাওয়া হবে, তখন নানি আমাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদেকেটে একাকার। আমিও অনেক কেঁদেছিলাম। যদিও কিছু বুঝতাম না তখন।

ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম। এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উত্তীর্ণ হলাম। ক্লাস ফাইভে কোচিংয়ের ফাঁকে সময় পেলে জাম গাছে উঠতাম জাম পাড়তে। তখন যেখানে কোচিং হতো সেখানেই খাওয়াদাওয়া হতো আমাদের। ক্লাসের সময় কোনো পিরিয়ড ফাঁকা পেলেই জাম পাড়তে যেতাম। আমাদের কোচিং হয়েছিল গিরি ফিকরানে।

আর শুক্রবারে আম, বরই পাড়তে যেতাম। সমাপনী পরীক্ষার কয়েক মাস আগে ছালেহ আহমেদ স্যার এলেন। আমাদেরকে ইংরেজিতে 'অলিম্পিক গেমস্' প্যারাগ্রাফ পড়তে দিলেন। তখন বিকেলে কোচিংয়ে স্যার মজা করে বললেন, প্যারাগ্রাফ মুখস্থ না হলে রাতের খাওয়া নেই। পড়লাম বুলেটের গতিতে—আজ আমার মুখস্থ করতে হবে এবং রাতের ভাত খেতেই হবে। সবার আগে আমি মুখস্থ বললাম এবং লিখে দিলাম। এভাবে চলতে লাগল। এগুলো মনে পড়লে এখন হাসি পায়। আর স্যারদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে। তারপর ক্লাস সিক্সে উত্তীর্ণ হলাম। ক্লাস সিক্সে তেমন কোনো পড়ালেখা নেই। শুধু খেলতাম। আমার খেলা ছিল হ্যান্ডবল। আগে খেলতাম টেবিল টেনিস। টেবিল টেনিস ভালো লাগত না।

তাই হ্যান্ডবল খেলার জন্যে গেলাম জাহিদ স্যারের কাছে। আমার সাথে চার বা পাঁচ জন ক্লাসমেট ছিল। স্যার বললেন, তোমরা কি হ্যান্ডবল খেলতে পারবে? তিনি আরো বললেন—তোমরা কি রোদ-বৃষ্টি হলেও মাঠে আসতে পারবে? আমরা বললাম—পারব। আমাদের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট পরীক্ষা নিলেন। সেখানে আমি প্রথম হয়েছিলাম।

ক্লাস সিক্সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা অনুভব করলাম। তাই বড় ভাইদের

কাছ থেকে প্রতি মাসের *কারেন্ট ওয়ার্ল্ড, কারেন্ট অ্যাফেয়ারস, কারেন্ট নিউজ* নিয়ে পড়তাম।

হ্যান্ডবল খেলায় আমার একটা ভালো দিক ছিল। দুই হাতে খেলতে পারতাম। এখনো খেলতে পারি। এটার পেছনে মূল কারণ ক্লাস সেভেনে থাকতে হ্যান্ডবল খেলতে গিয়ে ডান হাত ভেঙে গিয়েছিল। তখন থেকে বাম হাতে খেলতাম, লিখতাম এমনকি খেতামও।

একের পর এক ক্লাস পেরিয়ে ক্লাস এইটে পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ দিলাম। জেএসসি পরিক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হলাম। আমি ক্লাস নাইনে তেমন একাডেমিক বই পড়ি নি। লাইব্রেরির বিভিন্ন বই এনে পড়তাম। ক্লাস নাইন-টেন ভালোভাবে পড়াশোনা না করায় আমি এসএসসি-তে ৪.২৮ পেয়েছিলাম।

একাদশ শ্রেণির দিকে শুরু হলো করোনা মহামারি। আমাদের সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমিও বাড়ি গেলাম। বাড়িতে গিয়ে বাবাকে সাহায্য করেছি। পাহাড় থেকে কলা কাঁধে নিয়ে বিক্রি করতে যেতাম বাজারে। বাবার কষ্ট দেখে আমার খুব কষ্ট লাগত।

আমার বাবা কলা বিক্রি করে টাকা জমাতেন। সেই টাকা দিয়ে ছোটবেলায় স্কুল ছুটির সময় বাবা আমাকে নিতে আসতেন। আমার বাবা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বাবা। সেই ছোট্টবেলায় আমি মাকে হারিয়েছি। তিনি চাইলে আরেকজনকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু আমার কথা চিন্তা করে বিয়ে করেন নি। আমাকে নিয়ে জীবন পার করে দিচ্ছেন।

বাবার একটা স্বপ্ন ছিল—আমি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাই, যেন ভালো কিছু করতে পারি। বাবা আমাকে সবসময় বলতেন—'তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে'। এই কথা মাথায় রেখে এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করলাম। আমি এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেলাম। বাবাকে তখন রেজাল্ট পাওয়ার সাথে সাথে জানাতে পারি নি। কারণ আমাদের গ্রাম এমন একটা জায়গায় যেখানে মোবাইল নেটওয়ার্কের খুব সমস্যা। তাই চাইলেই সহজে যোগাযোগ করা যায় না।

আমাদের গ্রাম থেকে আমিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি। আজ বাবা আমার সাফল্যে গর্ব করতে পারেন। এইচএসসি পরীক্ষার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং কোয়ান্টামে করেছি। পড়তে গিয়ে ঘুম যেন না পায় তাই ইচ্ছে করে দিনে একবেলা খেতাম। আমার লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক বাবাকে খুশি করতে হবে। বাবার কথা চিন্তা করতে করতে পড়তাম।

ভোর ৪টায় উঠতাম আর ঘুমাতে যেতাম রাত ১টায়। এভাবে পাঁচ মাস প্রস্তুতি নিয়েছি। আর সবসময় প্রার্থনা করতাম। আমার মনছবি ছিল ভর্তি পরীক্ষায় আমি প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকব।

আজ আমার মনছবি আমাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি মেধা তালিকায় ৪র্থ হয়েছি। বাবাকে যখন এ কথাটা বললাম, বাবা অনেক খুশি হয়েছিলেন। আজও বাবার কষ্টের কথা মনে পড়লে কান্না এসে যায়।

এখন আমার লক্ষ্য ভালো মানুষ হওয়া, মানুষের সেবা করা। আর ফুল স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে গিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করতে চাই। আর আমি সবসময় মানবসেবায় নিয়োজিত থাকতে চাই। আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি। আমার সকল সফলতার পেছনে যাদের অবদান রয়েছে তাদেরকে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। □

আমি একজন ভালো শিক্ষক হতে চাই

রাজীব আহমেদ

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

আমার বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর থানার কোকাইল গ্রামে। তিন ভাইবোনের মধ্যে আমি সবার বড়। আর মা-বাবা, দাদিসহ আমাদের পরিবার। আমার বাবা একজন কৃষক, মা গৃহিণী। বাবা আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। তার উপার্জন দিয়ে আমাদের এই সংসার এবং পড়াশোনার খরচ চলে।

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি তখন একরাতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বাবার হাত ভেঙে যায়। বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিকভাবে ডাক্তার বললেন, প্লাস্টার করলে ঠিক হয়ে যাবে। তাই ডাক্তারের কথামতো প্লাস্টার করা হলো। যেহেতু বাবা বাসায় বসা, তাই পরিবারে উপার্জন করার মতো তখন আর কেউ নেই।

আমিও অনেক ছোট, কাজ করার মতো তেমন সক্ষমতা হয় নি। কিন্তু কোনো উপায় না পেয়ে কষ্ট করে উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমি না করলে কে করবে? কয়েকদিন পর বাবাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হলো। তখন বর্ষাকাল। এক-দুই মাস পর বর্ষা আরো বেড়ে গেল। কিছুদিন পর বাবার

হাত ভালো হতে শুরু করল। আমরা দুই ভাই বাবাকে সহযোগিতা করতাম।

বাবার হাত ভালো হওয়ার পর হঠাৎ একদিন কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে আবার হাত ভেঙে ফেলেন। হাসপাতালে গিয়ে হাতের অপারেশন করানো হয়। সুস্থ হতে দুই বছর লেগে গেল। আমিও তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছি। ডাক্তার বাবাকে এই অবস্থায় কাজ করতে নিষেধ করলেন। তখন বাবার সমস্ত কাজ আমি করতাম। আমাদের যা জমানো টাকা ছিল তা চিকিৎসা করাতে গিয়ে সবই শেষ হয়ে গেল।

বাবা যখন পুরোপুরি সুস্থ হন, তখনো ডাক্তার তাকে ভারি কাজ করতে নিষেধ করেন। যা-হোক আল্লাহর রহমতে বাবা বর্তমানে সুস্থ আছেন।

আশেপাশের বন্ধুদের খেলতে দেখে আমারও খেলতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু কাজের ব্যস্ততায় আমার খেলাধুলা করার সময় হয়ে ওঠে নি। লেখাপড়া থাকলেও আমি এত বেশি গুরুত্ব দিতে পারি নি। ইউনিভার্সিটি পড়ার কোনো মনছবি ছিল না। নবম শ্রেণিতে উঠে আমি ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ নিলাম। নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার ঠিক তিন-চার মাস পর আমি বাবাকে পরিচিত একজনের সাথে কথা বলতে দেখি। বাবা বললেন, বান্দরবানে নাকি একটা ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রদেরকে বিনামূল্যে পড়ালেখা করানো হয়। সেখানে বাবা আমাকে ভর্তি হতে বললেন, আমিও রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু এদিকে গ্রামের স্কুলে আমার এসএসসি রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। সেটা ট্রান্সফার করে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ আমি পরিবারের সবাইকে রেখে কোয়ান্টামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে পেলাম পড়ালেখা ও খেলাধুলা করার জন্যে অনুকূল এক পরিবেশ। শুধু তা-ই নয়, পেয়েছি মা-বাবার মতো দায়িত্বশীলদের। ক্লাসে গিয়ে দেখলাম আমার সহপাঠীদের এসএসসির সিলেবাস প্রায় শেষ। আর আমি এখনো তাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

সবার জন্যে নির্দিষ্ট ইভেন্ট দেয়া হলো। আমাকে কাবাডি খেলা দেয়া হলো। আমি তেমন আগ্রহী ছিলাম না। কারণ আমার খেলাধুলা করার অভ্যাস নেই। কিন্তু একসময় ভালো লাগতে শুরু করে। আর আমাদের কাবাডির প্রশিক্ষক আমাকে খুব পছন্দ করতেন এবং উৎসাহ দিতেন। স্যারের উৎসাহ পেয়ে আমিও ভালো খেলার চেষ্টা করতাম। তিন মাস পর আমি বাংলাদেশ যুব গেমসে খেলার সুযোগ পেয়ে যাই। এটি ছিল আমার জীবনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাইরে খেলার প্রথম অভিজ্ঞতা।

আমি ২০১৮ সালের মার্চ মাসে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার সুযোগ পাই। কোর্সে মেডিটেশন ও মনছবি সম্পর্কে জানতে পারি। অবশ্য তার আগেই কোয়ান্টামমে এসব শুনেছি কিন্তু কোর্সে গিয়ে নতুনভাবে নিজেকে অনুভব করতে শুরু করি।

যেহেতু আমি সহপাঠীদের তুলনায় একটু পিছিয়ে ছিলাম, হিসাববিজ্ঞান তেমন পারতাম না। তবে এসএসসি-তে ভালো রেজাল্ট করার মনছবি দেখতাম। ভাবতাম আমার দ্বারা সব সম্ভব এবং আমি সবার চেয়ে ভালো নম্বর পাব। তারপর আন্তঃস্কুল খেলা শেষ করে আমি পড়ালেখায় মনোযোগ দিলাম। এসএসসি পরীক্ষা চলে এলো। পরীক্ষা শেষ করে রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি। কয়েকদিন পর রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। পরীক্ষায় দেখলাম হিসাববিজ্ঞানে আমি এ প্লাস পেয়েছি। তখন অনুভব করলাম—আসলে বিশ্বাস এবং পরিশ্রম করলেই সম্ভব। লেখাপড়ার পাশাপাশি আমাদেরকে লাইব্রেরিতে বইপড়ার সুযোগ দেয়া হতো। বিভিন্ন বই পড়ে আমার খুব উপকার হয়েছে।

ক্যাম্পাসের অনেক স্মৃতি রয়েছে। এভাবে দেখতে দেখতে ২০২১ সাল চলে এলো। আমি এইচএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করলাম। ক্যাম্পাসে থেকে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং করল, আমিও করলাম। এখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র। কোয়ান্টামে কর্মরত দায়িত্বশীল ও শিক্ষকদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তারা আমাদের শুদ্ধাচারী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেছেন। আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি।

আর এখানে এসে আমি আমার মনছবি স্থির করি। আমি দেশের সেরা শিক্ষকদের মধ্যে একজন হতে চাই।

আর একটি কথা না বললেই নয়—এই স্কুলে আসার পেছনে যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি আমার এক বড় ভাই। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কোয়ান্টামে আমরা ২২ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা একত্রে ছিলাম। তাই আমার একটাই উদ্দেশ্য—জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ করা। আমার স্বপ্ন সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষদের পাশে থাকা এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা। আসলে এই স্বপ্নটা আমার তৈরি হতো না, যদি আমি কোয়ান্টামে না আসতাম। □

মানুষ মরে যায় কিন্তু তার স্বপ্ন বেঁচে থাকে

ওমর ফারুক

ফার্মেসি বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

যখন থেকে বুঝতে শুরু করেছি, তখন থেকেই খুব কাছ থেকে দেখতাম পরিবারের মানুষ এবং সমাজের মানুষগুলোকে। আমরা নিম্নবিত্ত ছিলাম কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে মানুষকে বলতাম মধ্যবিত্ত। খুবই সাধারণ জীবনযাপন ছিল আমাদের। পারিবারিক বিভিন্ন সংকট, অভাব-অনটন ছিল না বললে ভুল হবে। বাবা দিব্যি খুশি ছিলেন, যদিও অবস্থা ছিল হ্যান্ড টু মাউথ। খুব ছোটবেলা থেকে বুঝতে শিখেছি জীবন কী জিনিস। তাই দারিদ্র্যপীড়িত জীবন আমাকে করেছিল কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তারপরও কিছু অভিজ্ঞতা মনটাকে ছোট করে দিয়েছিল। প্রতিবেশীদের হিংসা, অহংকার এবং অপমানের শিকার হয়েও আমি থেমে থাকি নি। এই ছোট ছোট অভিজ্ঞতা এবং দুঃখকে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগিয়ে এসেছি পড়াশোনার শুরু থেকেই।

সব ক্লাসে ভালো স্টুডেন্টের তালিকায় আমারও নাম থাকত। পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে ষষ্ঠ, সপ্তম এভাবে যতই এগোচ্ছিলাম এবং মনে মনে স্বপ্ন বুনতে লাগলাম। ভাবলাম জীবনকে কীভাবে অর্থবহ করা যায় এবং মানুষের জন্যে

কীভাবে আমি কল্যাণমূলক কাজ করতে পারি।

আমি ছোটবেলা থেকে স্বভাবগতভাবে শান্ত ছিলাম এবং মানুষের সাথে আগ বাড়িয়ে পরিচিত হওয়া, কথা বলা এই ব্যাপারগুলো ভালো লাগত না। সবসময় পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতাম। কারণ আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে, মানুষের জন্যে বৃহৎ কিছু করতে চাইলে আমাকে পড়াশোনা করে, মেধাশ্রম দিয়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে।

যেহেতু আমি শান্ত টাইপের মানুষ ছিলাম সেহেতু ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলা আমাকে তেমন একটা আকৃষ্ট করত না। আমি সবসময় পড়াশোনার জন্যে একটা নির্জন জায়গা খুঁজতাম।

স্কুল জীবনে কত বাধাবিপত্তি যে এসেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আমার বড় ভাই বেশ মেধাবী ছিলেন। দারিদ্র্যের আঘাতে তার পঞ্চম শ্রেণির বেশি এগোনো সম্ভব হয় নি। কিন্তু আমাকে পড়াশোনা করানোর জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তখন অর্থের অভাব দেখতে দেখতে মনে হতো যে, অর্থই জীবনের সবকিছু।

অষ্টম শ্রেণিতে আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নি এবং অপেক্ষা করেছি সুদিনের। আমি যখন অষ্টম শ্রেণিতে তখন এমনও হয়েছে মর্নিং শিফট স্কুলে গিয়েছি এবং বিকালে মুখে রুমাল বেঁধে টমটম গাড়ি চালিয়ে পরিবারকে আর্থিক সাপোর্ট দিয়েছি। মুখে কাপড় পরতাম যাতে স্কুলের কেউ আমাকে না দেখে। তা-ও অনেকে চিনে ফেলেছিল। ছোটবেলায় কত বিচিত্র কষ্টই না করেছি উপার্জন করার জন্যে।

মা সবসময় প্রার্থনায় বিলীন হয়ে যেতেন। খাবার হোটেলে চাকরি থেকে শুরু করে দিনমজুরির কাজ, সব ধরনের অভিজ্ঞতা আমার আছে যা এখন আমাকে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কারণ আমার জীবন আজ নতুন পথে অগ্রসরমান।

আসলে আমার স্কুল শিক্ষক বিকাশ শর্মা পলাশ স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তিনি যদি আমাকে কোয়ান্টামে আসার পরামর্শ না দিতেন হয়তো আমার জীবন নতুন এই মোড় নিত না। কোয়ান্টাম কসমো কলেজ সম্পর্কে স্যারের বর্ণনা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, কোয়ান্টামের পরিবেশটা একদম আমার মনের মতো, যেখানে নীরবে সাধনা করা যাবে। আসলে স্যারও বুঝে গিয়েছিলেন যে, আমার স্কুল লাইফটা গভর্নর মতিউর রহমান স্যার কিংবা এপিজে আব্দুল কালাম স্যারদের স্কুল লাইফের মতো সংকটাপূর্ণ।

কোয়ান্টামে প্রবেশ করেছিলাম মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই হতে আজ অবধি আমাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। কারণ মনছবি কিংবা জীবনের লক্ষ্যের মতো ম্যাজিক আমি পেয়েছিলাম। এর আগে জীবনের লক্ষ্য নিয়ে কখনো ভাবি নি।

স্কুলে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতাম মানুষের জন্যে কল্যাণকর কিছু করার জন্যে। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় এগোব এবং লক্ষ্য নিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তা আমার জানা ছিল না। আসলে জীবনে যদি লক্ষ্য না থাকে তাহলে কর্মোদ্দীপনা পাওয়া যায় না এবং সামনে এগোনোর আগ্রহ থাকে না। জীবনের অর্থ নতুনভাবে বুঝতে শুরু করলাম। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে লামাতে গুরুজী দাদুর পরিচালনায় শিক্ষার্থী অন্বেষায়ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সেখানে আমি জীবন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন গুরুজী দাদুকে করেছিলাম এবং উত্তর পেয়েছিলাম সন্তোষজনক। তখনই নিজেকে শুধরে নিয়েছিলাম। এছাড়াও এখানকার দৈনিক রুটিন মেনে চলতে চলতে ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য এবং সময়ানুবর্তিতা আয়ত্ত করেছি, আলহামদুলিল্লাহ!

কোয়ান্টামমে আমার অনেক স্মৃতি আছে। যেমন ২০১৯ সাল থেকে আমি ব্যান্ড বাদনে অনুশীলন করে আসছিলাম। ২০২০ সালের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবসে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে পারফর্ম করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তার জন্যে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে টানা ১৬ দিন ব্যান্ড প্র্যাকটিস করেছি। তারপর বার্ষিক ছুটিতে গেলাম। জানুয়ারি মাসে ছুটি থেকে ফিরে আবারো প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম।

আমি ড্রাম বাজাতাম, প্রোগ্রামের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি এবং পরিশ্রম এই দুটোর কোনো কমতি ছিল না। আমাদের ব্যান্ড টিমকে সাজানো হয়েছিল নতুনরূপে। কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে গেল কোভিড-১৯ এর মহামারির কারণে। তা-ও আমরা হাল ছাড়ি নি, ২৫ তারিখেও আমরা একই প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছি। কিন্তু ২৬ মার্চ আর প্রোগ্রাম করা হলো না।

সেদিন রাতে ঘটেছে এক চমক। আমাদের উচ্চতর গণিতের শিক্ষক এসে শোনালেন একটি খুশির সংবাদ। আমাদের কষ্ট নিমেষেই হালকা করে দিয়েছিল সেই সুখবরটি। তিনি বললেন—আপনারা কঠোর পরিশ্রম করার পরও প্রোগ্রামে অংশ নিতে না পেরে মন খারাপ করে আছেন। আমরা প্রোগ্রামের জয়ের খবর শুনতে পাই নি তো কী হয়েছে, আমরা তো আরেকটা জয় পেয়েছি। আপনাদের

গুরুজী দাদুর লেখা সদ্য প্রকাশিত হওয়া *শুদ্ধাচার* বইটি জাতীয় শিক্ষা নীতিমালার নজর কেড়েছে, এই বইটি প্রত্যেক সরকারি অফিসে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আমরা শুনে সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। পরে ভাবলাম আমরা যদি ২৬ মার্চে জয়লাভ করতাম, তবে আমরা এভাবেই উদযাপন করতাম আনন্দটা। এরকম অনেক স্মৃতি আছে। আমার শিক্ষাজীবনের সোনালি সময় কেটেছে কোয়ান্টামমে। এখানে সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পেয়েছি বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন।

মানুষ যে মানুষের জন্যে—সেটা এখানে এসে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। আর সঙ্ঘ বা একতার কী শক্তি তা আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কার্যপরিধি না দেখলে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

ধ্যান ও জ্ঞানের নগরী কোয়ান্টামমের অংশ হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। গুরুজী দাদু বলেন, মানুষ মরে যায় কিন্তু তার স্বপ্ন বেঁচে থাকে। যেহেতু কোয়ান্টামম হাজারো মানুষের স্বপ্ন এবং লাখো মানুষের দোয়ার মধ্যে সবসময় থাকে, তাই এটি দীপ্তি ছড়াবে হাজারো বছর ধরে। ইনশাআল্লাহ! □

মা-বাবার ত্যাগের ফল দিতে চাই সাফল্যের মাধ্যমে

উচাইন মার্মা
কম্পিউটার টেকনোলজি, ম্যানগ্রোভ ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, খুলনা

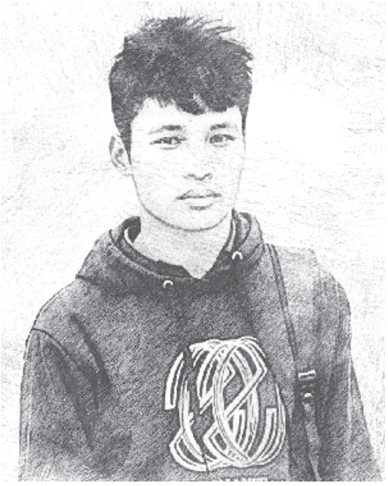

বান্দরবান লামার রূপসীপাড়ায় আমার জন্ম। দুই ভাই, এক বোন আর মা-বাবাসহ একসাথে থাকতাম আমরা। বাবা জুমচাষ করেন। আমার শিক্ষাজীবনের শুরুটা ছিল বেশ আনন্দের। যদিও আমাদের গ্রামে শিক্ষার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়া হতো না। যার কারণে গ্রামের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। আরেকটা সমস্যা হলো আমাদের গ্রামের লোকগুলো অধিকাংশই দরিদ্র, যে কারণে শিক্ষাদীক্ষায় তারা পিছিয়ে আছে।

আমার বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে লাইনঝিরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমি সেখানে পড়ালেখা শুরু করেছিলাম। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে লামা বাজারে হলিচাইল্ড পাবলিক হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। স্কুলে গাড়িতে করে যেতে হয়। কিন্তু গাড়ি ভাড়া না থাকায় প্রায়ই হেঁটে যেতাম। বেশি হাঁটলে জুতো ছিঁড়ে যেত। ছেঁড়া জুতা নিয়ে স্কুলে গিয়েছি বহুবার।

অনেক বন্ধুদের দেখতাম তাদের দুই-তিনটা ড্রেস আছে কিন্তু আমার একটা ড্রেস দিয়েই বছর পার করতে হতো। বর্ষাকালে বৃষ্টির কারণে অনেক সময় স্কুলে যেতে পারতাম না। এভাবে কোনোরকম অষ্টম শ্রেণি সম্পন্ন করলাম। নবম শ্রেণিতে পড়তে হলে কমপক্ষে মাসে দুই থেকে তিন হাজার টাকা লাগবে। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র পরিবারের তা বহন করার সামর্থ্য নেই। আর্থিক সমস্যার কারণে আমাদের গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক সম্পন্ন করে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

শুনেছিলাম দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করার জন্যে কোয়ান্টামে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। তারপর একটা ফরম সংগ্রহ করে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গেলাম। ভর্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হলাম। এই সুসংবাদে আমার চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিল আমার পরিবার। যদিও আমি পার্বত্য অঞ্চলের ছেলে, তারপরও কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে সেখানকার পরিবেশ আমার কাছে অন্যরকম লাগত। সেখানকার নিয়মকানুন আমার কাছে একটু কঠিন মনে হতো। বিশেষ করে ভোরে ঘুম থেকে উঠে ইভেন্টে যাওয়া, তারপর সকালে খাবার খেয়ে স্কুলে যাওয়া।

স্কুলে গিয়ে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে দৈনিক ৩০ মিনিট মেডিটেশন করতাম। তবে আস্তে আস্তে এসব ভালো লাগতে শুরু করল। মেডিটেশন প্রথমে আমি কিছুই বুঝতাম না। ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করি। আমি বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি—বর্তমানে আমার সাফল্যের সিঁড়ি হচ্ছে মেডিটেশন।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের স্মৃতিগুলো লিখতে গেলে লেখা শেষ করা যাবে না। এখানকার শিক্ষক ও ছাত্ররা এত আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ হয়, যা বাইরে আমি দেখি নি। আমাদের সমস্ত সমস্যা থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজানা তথ্য সবকিছুই স্যারদের সাথে আলোচনা করে সমাধান করতাম। আমি বাড়িতে থাকতে এক সেট ড্রেস দিয়ে পুরো বছর পার করেছি, অথচ কোয়ান্টামে এসে বছরে পেয়েছি তিন সেট ড্রেস। এছাড়াও আলাদাভাবে দেয়া হতো স্কুল ড্রেস এবং খেলার জার্সি।

আমি আগে কখনো ভাবি নি যে, কোনো পরীক্ষায় এ প্লাস পাব। কিন্তু এখানে ২০২১ সালের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছি। মেডিটেশন শিখে মনের ভেতরে থাকা রাগ-ক্ষোভ কীভাবে মুছে ফেলতে হয় তা শিখেছি। সুস্থ থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় যোগব্যায়াম কোয়ান্টামে এসে শিখেছি। নিজের মনছবি ঠিক করেছি। গুরুজী দাদুর

সাদাকায়নে মা-বাবা, পরিবার, আত্মীয়স্বজনসহ কোয়ান্টাম পরিবারের জন্যে দোয়া করার সুযোগ পেয়েছি। আমরা যারা ব্যান্ড দলের সদস্য ছিলাম, ক্যাম্পাসে কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব এলে সবাই মিলে অতিথিকে অভিবাদন জানাতাম। গার্ড অব অনার প্রদান করতাম। এখানে না এলে হয়তো এই সুযোগ কখনো পেতাম না।

এখন খুলনায় পড়তে এসেও মন যেন কোয়ান্টামেই পড়ে আছে। এখন আমার লক্ষ্য হচ্ছে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে বিসিএস ক্যাডার হওয়া। আর আমাদের গ্রামে উন্নয়নের জন্যে রুটিন ও নিয়মকানুন দিয়ে কোয়ান্টামের মতো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চাই, যেন বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা করতে পারে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে এসে আমি অনেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। নতুন কিছু শিখতে পেরেছি যেমন চিত্রাঙ্কন, ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস।

যদিও স্কুল জীবনের বেশিরভাগ সময় আমার বাইরে কেটেছে। তবে কোয়ান্টামের স্মৃতিগুলো অন্যরকম। কারণ বাইরের পরিবেশে দেখা যায় স্কুলের শিক্ষার্থীরা বন্ধুদের সাথে মিশে খারাপ কিছুতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে বেশিরভাগ ছাত্ররাই নিজের মনছবি পূরণের লক্ষ্যে ব্যস্ত থাকে। সেই ব্যস্ততাতেই আমি নিজেকে অর্পণ করেছিলাম।

শিক্ষাজীবনে বাবা-মায়ের গুরুত্ব অন্যতম। কারণ তারা কষ্ট করে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করে দেয়। এই বিষয়ে বলতে গেলে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। আমি তখন জেএসসি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার কোচিং আর স্কুলের জন্যে টাকা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তখন বাবার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা ছিল না।

টাকা না থাকাটা নতুন কোনো বিষয় নয় আমাদের জন্যে। সমাজে মধ্যবিত্ত হিসেবে পরিচিতি থাকলেও আমাদেরকে দিনমজুরদের মতো জীবন চালাতে হতো। সে-সময়ে আমার মা অসুস্থ থাকায় তার ওষুধ কেনার জন্যে কিছু টাকা জমানো ছিল। কিন্তু আমার বাবা-মা ওষুধ কেনার চিন্তা না করে আমার পড়ালেখার জন্যে খরচ দিয়ে দেন। তাদের এই ত্যাগ ও আশীর্বাদের প্রতিদান আমি যেন সারাজীবন দিতে পারি। □

প্রতিটি মানুষেরই পারার ক্ষমতা আছে

তপ্ত বিকাশ ত্রিপুরা

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

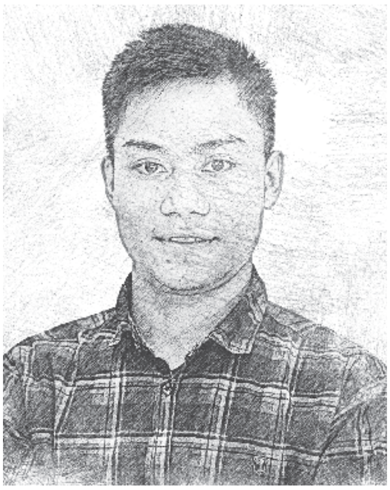

পড়ালেখার প্রতি আমার যেমন আগ্রহ ছিল তেমনি যে-কোনো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির কাজেও আমার খুব আগ্রহ। ইলেকট্রনিক্সের ছোটখাটো কিছু কাজ শিখেও ফেলেছিলাম ছোট বয়সেই। আমার বাড়ি খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার যৌথ খামার পাড়ায়।

আমাদের পাড়ায় তখন প্রাথমিক স্কুল বলতে একটিমাত্র বেসরকারি স্কুল ছিল। আমি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়ালেখা করেছিলাম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় তেমন খরচ হয় নি বলেই মা-বাবা আমাকে পড়াতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী পড়াশোনার জন্যে পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায়, আমার নানি আমাকে পড়ালেখা বাদ দিয়ে ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি ঠিক করার জন্যে বাজারে একটি দোকান করে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল উচ্চশিক্ষা নিয়ে একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবো। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই বাবা আমাকে মাটিরাঙ্গা সরকারি মডেল হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন।

আমাকে ভর্তি করে দেয়ার জন্যে বাবাকে আর্থিকভাবে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল, যা আমি ঐ সময়ে নিজের চোখে দেখেছিলাম।

স্কুলটি আমাদের পাড়া থেকে অনেক দূরে ছিল। প্রতিদিন হেঁটে স্কুলে যেতাম। বৃষ্টির সময় ছাতা না থাকার কারণে স্কুলে যেতে পারতাম না। তারপর রাস্তায় কাদা। যখন বেতন ও পরীক্ষার ফি দিতে হতো, তখন ঠিকমতো দিতে পারতাম না। এসময় মা-বাবা পাড়ার মানুষের কাছ থেকে ধার নিয়ে ফি পরিশোধ করেন। ধার না পেলে বাবা স্কুলের স্যারদের অনুরোধ করে আমাকে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। মা-বাবা আমাকে কখনোই অভাব জিনিসটা বুঝতে দিতে চাইতেন না। আমি কোনো সময় প্রাইভেট পড়ি নি। কারণ ভালোভাবেই জানতাম টাকা জোগাড় করতে বাবার বেশ কষ্ট হবে।

কিন্তু অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় এক স্যারের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে বিনামূল্যে প্রাইভেট পড়িয়েছিলেন। অনেক সময় তিনি আমাকে নিজের টাকায় খাতা, কলম, বই কিনে দিতেন। একবার অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় ফি দেয়ার সামর্থ্য না থাকায় তিনি আমার ফি পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। এভাবেই আমি অষ্টম শ্রেণি শেষ করেছিলাম। স্যারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ভালো কিছু মানুষের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি।

আমার একটি সমস্যা হলো আমার লেখার গতি খুব কম ছিল। কারণ একবার গাছ থেকে পড়ে আমার ডান হাত ভেঙে গিয়েছিল। এ কারণে দ্রুত লিখতে পারতাম না। তাই ভেবেছিলাম অষ্টম শ্রেণি পাশের পর কারিগরি শাখায় ভর্তি হবো। কারণ জেনারেলে পড়াশোনা করলে অনেক বেশি পড়তে হবে, আর কারিগরিতে পড়লে লেখাপড়া কম, হাতের কাজ বেশি থাকবে।

কিন্তু বাবার আর্থিক অভাবের কারণে আমি নবম শ্রেণিতে কোথাও ভর্তি হতে পারছিলাম না। এসময় পরিচিত একজন স্যার আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সম্পর্কে বলেন। জানতে পারলাম সেখানে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে পড়ানো হয়। তাই নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে ২০১৯ সালে কারিগরি শাখায় নবম শ্রেণিতে আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হলাম।

আর এটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম আবাসিক স্কুল। নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সাত দিন ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করার পর এতই ভালো লেগেছিল যে, থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এছাড়াও এখান থেকে ফিরে গেলে আমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যেত। এই স্কুলে আমরা বাঙালি-পাহাড়ি মিলে

একসাথে পড়ালেখা ও খেলাধুলা করতাম। এ স্কুলের পড়ালেখার পদ্ধতি বাইরের স্কুল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা প্রতিদিন মেডিটেশন করে ক্লাস শুরু করতাম। এখানে এসে আমি আমার মনের ও ব্রেনের অফুরন্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে শিখেছি। একসময় যে নেতিবাচক কথাগুলো আমি বাইরে শুনতাম যেমন—তুই পারবি না, তোর দ্বারা হবে না, তোর তো সামর্থ্য নেই! এগুলো এখানে বলা হয় না।

কোয়ান্টামে এসে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে বুঝতে পারলাম প্রত্যেক মানুষের ভেতরে পারার অফুরন্ত শক্তি রয়েছে। এটি আমি কোয়ান্টাদের সাফল্য দেখেই শিখেছি। তখন আমিও পারার এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমার লক্ষ্যটি আরো দৃঢ়ভাবে স্থির করলাম যে, এ প্লাস পাব এবং আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো। তাই নিয়মিত লেখাপড়া করতে শুরু করি এবং মেডিটেশনের মাধ্যমে জীবনের মনছবি দেখতে থাকি।

এভাবে এসএসসি পরীক্ষা চলে আসে। প্রভুর আশীর্বাদে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৪.৯৬ পেয়ে উত্তীর্ণ হই। এ স্কুলের কারিগরি শাখার প্রথম ব্যাচের কোয়ান্টা হিসেবে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নিজের নামটা লিখতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। আমাদের এলাকা থেকে এই প্রথম আমি পলিটেকনিক কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। এজন্যে আমি কোয়ান্টামের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। কারণ এখানে না এলে আমি আমার মেধাকে বিকশিত করতে পারতাম না।

এছাড়া মাথাব্যথা রোগ থেকে মেডিটেশন আমাকে মুক্ত করেছে। আগে যখন আমার মাথাব্যথা শুরু হতো, তখন আমি টানা এক-দুই দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতাম না, খেতে পারতাম না। কোয়ান্টামে এসে আমার এই রোগটি একবার হয়েছিল। তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম চিকিৎসা করাব। কিন্তু কোয়ান্টামে নিয়মিত মেডিটেশন করে এবং সুস্থ থাকার অটোসাজেশন দেয়ার ফলে প্রভুর কৃপায় এখন পর্যন্ত এটা আমার আর একবারও হয় নি।

এখন আমার মনছবি হলো ডিপ্লোমার পর বিএসসি এবং এমএসসি সম্পন্ন করে একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবো। আর কোয়ান্টামের সাথে যুক্ত থেকে দেশের সেবা করব এবং অসহায়-বঞ্চিত মানুষকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করব। □

পাহাড়ি পরিবেশে অল্প খরচে বাসস্থান তৈরির পরিকল্পনা করছি

নিলয় তঞ্চঙ্গ্যা
সিভিল টেকনোলজি, কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

ছোটবেলায় ছিলাম অন্য ১০টি শিশুর মতোই দুরন্ত এবং চঞ্চল। বড় হয়েছি পাহাড়ি গ্রামীণ পরিবেশে। বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়া, মাছ ধরা, আড্ডা দেয়া ছিল আমার নিত্যদিনের কাজ। আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় তখন বাবা আমাকে পাশের গ্রামের জামাচন্দ্র পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে বাঁশের বেড়া এবং টিনের ছাউনি দিয়ে তৈরি স্কুলটিতে ভর্তি করিয়ে দেন। তঞ্চঙ্গ্যা এবং মার্মা সম্প্রদায়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে চালু করা হয় স্কুলটি ।

২০১৫ সালে প্রাইমারি স্কুল থেকে তৃতীয় ব্যাচে আমরা সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে কোনোরকমে পাশ করি। ২০১৬ সালে গ্রাম থেকে দূরে রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম ষষ্ঠ শ্রেণিতে। নতুন সহপাঠী, নতুন স্কুল, নতুন পরিবেশ—একটু ভয় কাজ করছিল। গ্রাম থেকে আমাদের স্কুলের দূরত্ব ছিল পাঁচ কিলোমিটার, প্রতিদিন পায়ে হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করতে হতো। বন্ধুদের নিয়ে একসাথে গল্প করতে করতে স্কুলে যেতাম, যার জন্যে পায়ে

হাঁটার কষ্টটা বুঝতে পারতাম না। প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করত সেই স্কুলে। এভাবে কেটে গেল দুই বছর।

২০১৮ সালে আমার জেএসসি পরীক্ষা। তখন ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক এগুলোর মাঝে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। ভার্চুয়াল ভাইরাসই ছিল আমার সঙ্গী। তাই কোনোরকমে পাশ করলাম।

আমাদের পরিবারে সদস্য সংখ্যা চার জন। আমি বাড়ির বড় ছেলে, বাবা ছিলেন মুদি দোকানদার। আমাদের পড়ালেখা এবং পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করা বাবার জন্যে একটা চাপ হয়ে গেল। বাবা তখন আমাকে রুমা পাহাড়ি আবাসিকে ভর্তি করিয়ে দিতে চাইলেন, কারণ সেখানে ফ্রি-তে পড়ানো হতো। দুর্ভাগ্যবশত আমি সেখানে চান্স পাই নি।

পরবর্তী সময়ে হঠাৎ করে বাবা বললেন, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সন্ধান পেয়েছি, এই স্কুলে যদি চান্স না পাও তাহলে পুরনো স্কুলে পড়তে হবে। নামটি আমার কাছে তখনো সম্পূর্ণ অপরিচিত। ২০১৯ সালে ভগবানের অশেষ কৃপায় আমি কোয়ান্টামে ভোকেশনাল শাখায় পড়ালেখা করার সুযোগ পেলাম। আমরাই ছিলাম কসমো স্কুলে ভোকেশনাল শাখার প্রথম ব্যাচ।

এখানে এসে দেখলাম, বাইরের পরিবেশ এবং কোয়ান্টামের পরিবেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আরো রয়েছে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ। তখন আমিও মনছবি দেখতে শুরু করলাম এসএসসি-তে এ প্লাস পাব। আত্মবিশ্বাস ছিল—সমাপনী এবং জেএসসি-তে এ প্লাস পাই নি তো কী হয়েছে, এসএসসি-তে আমি এ প্লাস পেয়ে ছাড়ব।

আমার দ্বিতীয় মনছবি ছিল কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করা। ২১ মে বিশ্ব মেডিটেশন দিবসে রচনা, চিত্রাঙ্কন, কবিতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করানো হবে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আর এসএসসি-তেও এ প্লাস পেলাম। রেজাল্ট শুনে আমি যতটুকু খুশি হয়েছি তার থেকেও বাবা অনেক বেশি খুশি হয়েছিলেন। অনেকদিন পর বাবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি—এটাই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

এখন আমি একজন সফল ও দক্ষ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। আর আমার লক্ষ্য হলো আমাদের বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্যে পাহাড়ি পরিবেশে অল্প খরচে ভালো মানের বাসস্থান তৈরি করা। □

গ্রামের মানুষ বলেছিল,
এর দ্বারা পড়াশোনা হবে না

সুমন ত্রিপুরা

ইলেকট্রনিক টেকনোলজি, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

খাগড়াছড়ি থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে পানছড়ি উপজেলায় কফুচাঁন পাড়ায় আমার বাড়ি। এলাকাটি বেশ দুর্গম। সেখানে যেতে হলে পাথুরে পাহাড় বেয়ে দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। শহর থেকে সকালে রওনা দিলে সন্ধ্যা নেমে অন্ধকার হয়ে যায়। বিদ্যুৎ এখনো পৌঁছায় নি সেখানে।

পানি আনতে যেতে হয় দুইটা পাহাড় পার হয়ে। এমনও হয়েছে যে, দুইটা পাহাড় পার হয়ে গিয়ে দেখি ঝিরিতে তেমন পরিষ্কার পানি নেই। আমাকে এক বালতি নোংরা পানি দিয়ে গোসল করতে হয়েছে। ভোর ৩টা বাজে আমার মা আর বোনের সাথে আমি পানি আনতে যেতাম। আগে না গেলে পানি পাওয়া যেত না। কারণ অনেকেই পানি নিতে আসত। আট বছর বয়সে ভর্তি হয়েছিলাম আমাদের পাড়া থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে একটা স্কুলে, সেটাও অন্য পাড়াতে। কারণ আমাদের পাড়াতে তখনো কোনো স্কুল নেই।

সমবয়সীদের সাথে সকালে স্কুলে যেতাম। স্কুল শেষে বাসায় ফিরে আসতে ৫টা বেজে যেত। স্কুলে যাতায়াতের পথে একটা খাল রয়েছে। বর্ষাকালে সেই খাল কোমর সমান পানিতে ভরে যেত। অনেক সময় বৃষ্টির পানিতে ভিজে এবং কর্দমাক্ত অবস্থায় ক্লাস করতে যেতাম।

এত দূরের পথ হেঁটে আসার পর বাড়িতে কুপি বাতি জ্বালিয়ে পড়তে বসলে ঘুম চলে আসত। তখন আমাদের গ্রামে আমরা কয়েকজন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তাম। পরে আমি ও আমার দুই জ্যাঠাতো বোন আমাদের গ্রাম থেকে প্রথম এসএসসি পাশ করি। পাড়াবাসীরা আমাদেরকে নিয়ে অনেক নেতিবাচক মন্তব্য করত। আমার বাবার বংশের মধ্যে যেহেতু কেউই পড়াশোনা করার সুযোগ পায় নি, তাই গ্রামের মানুষেরা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলত, ওদের বংশের লোক কোনোদিনও পড়াশোনা করে বড় কিছু করতে পারে নি। ওরা শুধু মদ খেয়ে, জুয়া খেলে থাকতে পারবে। এদের দ্বারা পড়াশোনা হবে না, শুধু জুমচাষ করে খেতে পারবে।

তাই বাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের চার ভাইবোনকে যেভাবে হোক পড়ালেখা করাবেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে বড় ভাই এবং বড় বোন পঞ্চম শ্রেণির পর পড়ালেখা ছাড়তে বাধ্য হয়। এরপর বাবা আমাকে পড়াশোনার জন্যে পানছড়ি উপজেলা সদরে ভর্তি করে দিলেন। তখন গ্রামের প্রতিবেশীরা বাবাকে বলেছিল, টাকা-পয়সা বেশি হয়েছে! ছেলেকে শহরে পড়াশোনা করতে পাঠিয়েছ। লেখাপড়ার মতো ছেলে হলে গ্রামে থেকেও পড়ানো যায়!

পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর বাবা আমাকে পানছড়ি বাজারে এক মার্মা পরিবারের কাছে রেখে দিলেন। আমি পানছড়ি বাজারটাও চিনতাম না। তাছাড়া আগে কখনো মার্মাদেরকে দেখি নি। আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করেছিলাম। অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর আমার পড়ালেখার খরচ বহন করার মতো অবস্থা পরিবারের ছিল না। তাই বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। তবুও বাবা আমাকে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে বললেন।

আমি প্রায় লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ার মতো অবস্থায় ছিলাম। আমি যার বাসায় এতদিন ছিলাম তার বাড়িতে এরপর একদিন বেড়াতে গেলাম। তার স্ত্রীকে জেঠি বলে ডাকতাম। তার কাছে গিয়ে কিছু পরামর্শ নিলাম। তিনি আমাকে কোয়ান্টামের কথা জানালেন। সেখানে নাকি নবম শ্রেণিতে কারিগরি শাখায় ভর্তি হওয়া যায়। ২০১৯ সালে বাবার সাথে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে নবম শ্রেণির কারিগরি শাখাতে ভর্তি হলাম।

এখানে এসে আমি নিজেকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে লাগলাম। মেডিটেশন আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। একবার আরোগ্যশালায় পাথর রং করতে করতে আমার মনে হলো, এই যে পাথরগুলো আমরা বসার উপযোগী করে তুলছি, এখানে অনেক মানুষ আসবে এবং এই পাথরে বসে মেডিটেশন করে সবার জন্যে দোয়া করবে। তখন আমি এই কথা ভাবতে ভাবতে রোদের মধ্যে কাজ করেও প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম।

আর ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের ব্যবহার খুবই ভালো। তারা স্নেহ করতেন এবং ক্লাসের সময় সঠিক জীবনযাপনের শিক্ষা দিতেন। এখানে আসার পরে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পেরেছি। আগে আমি লক্ষ্যহীন ছিলাম। স্কুলে সবাইকে আলাদা করে ইভেন্ট দেয়া হয়। আমাকে ব্যান্ডের ড্রাম সেকশনে দেয়া হয়। এই ইভেন্ট থেকে আমি অনেক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি।

২০২১ সালে এসএসসি সম্পন্ন করে আমি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রনিক ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলাম। পাশাপাশি আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের একজন নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক। আমি এখন একজন ভালো মানুষ ও ভালো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার চেষ্টা করছি। □

বড় কিছু, ভালো কিছু করতে হবে

গাঁথীচন্দ্র ত্রিপুরা

গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বাড়ি গতিরাম পাড়ায়, এটি বান্দরবান জেলার লামা থানার প্রত্যন্ত এক গ্রাম। এখন আমি পড়াশোনা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে। অথচ জীবনের একটা সময় পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি নি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করব।

জন্মের এক সপ্তাহ পর বাবাকে হারিয়েছি। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে মা-ই আমাকে লালনপালন করেন। খুব ইচ্ছে হয় বাবাকে দেখতে। হোক ছবিতে কিংবা বাস্তবে। কেমন ছিলেন বাবা? কী রকম দেখতে ছিলেন তিনি? বাবার একটা ছবিও নেই আমাদের কাছে। থাকবেই বা কীভাবে? তখন ক্যামেরা বা বর্তমান সময়ের মতো স্মার্টফোন কিছুই ছিল না আমাদের কাছে। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থাও খারাপ ছিল। এরকম একটা পিছিয়ে থাকা অঞ্চল থেকে উঠে আসাটা সত্যিই চ্যালেঞ্জের।

সেই ২০০৭ সালের কথা মনে পড়ে। মা আমাকে কোয়ান্টাম শিশুকাননে ভর্তির জন্যে নিয়ে এসেছিলেন। তখন আমার বয়স তিন কিংবা একটু বেশি।

পড়াশোনা কী জিনিস তা-ও বুঝতাম না। আমার মা-ও খুব একটা বুঝতেন না পড়াশোনার ব্যাপারে।

প্রথম যখন আসি তখন কোয়ান্টামমে তেমন স্থাপনা ছিল না। আর বর্তমান সময়ের মতো বড় জায়গাও ছিল না। কিন্তু তারপরও আমার এলাকার তুলনায় অনেক সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল ছিল। যেহেতু খুব ছোট বয়সে এখানে আসি, তাই আমার ছোটবেলা থেকেই ভালবাসা ছিল কোয়ান্টামমের প্রতি।

২০০৭ সালে আমি সূচনা শ্রেণিতে ভর্তি হই। আর ২০২১ সালে এইচএসসি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। এই ১৫ বছরে আমি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে যা শিখেছি তা আমার জন্যে অনেক সৌভাগ্যের। এই জন্যে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। এখানে আমি কোয়ান্টাম পরিবার পেয়েছি। একটি সুন্দর জীবন ও জীবনের লক্ষ্য পেয়েছি।

যদি আমার এলাকার ছেলেমেয়েদের কথা বলি—তারা বেশি কিছু ভাবলে কী ভাববে! কোনোরকম পড়ালেখা করে তারা একটা ছোটখাটো চাকরি করতে চায়। আবার অনেক ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শেষ করতে না করতেই খুব অল্প বয়সে বিয়ে করে সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এলাকার অনেক ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা-বাবারা এখন পর্যন্ত জানে না যে, বিশ্ববিদ্যালয় বলে কিছু আছে। তারা সেনাবাহিনীর সৈনিক বা পুলিশের কনস্টেবল হওয়াকে সর্বোচ্চ অর্জন মনে করে। গ্রামে বেড়ে উঠলে হয়তো তাদের মতোই হতাম। কারণ বাবা হারা সন্তান আমি, নিঃস্ব মা আর কীই-বা করতে পারতেন।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের সেই সব রুটিনমাফিক দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ভোর ৪.৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করা আর সব কাজ শেষ করে রাত ১০.৩০ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়া। যদিও তখন খুব রাগ হতো এসব রুটিনমাফিক কাজের জন্যে। বিশেষ করে ভোরে ঘুম থেকে ওঠা আমার কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় ছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, সেই রুটিনের জন্যেই আজ এত দূর আসতে পেরেছি।

আরো মনে পড়ে কোয়ান্টামমে ছোটবেলায় দেখা বর্ষাকালের কথা। বর্ষার পানিতে রাস্তাঘাটগুলো ভিজে কর্দমাক্ত হয়ে যেত। গাড়ি ঢোকার কোনো ব্যবস্থা থাকত না। সেই সময়ে গুরুজী দাদুসহ সবাই মিলে পায়ে হেঁটে চাল, ডাল, সবজি মাথায় বহন করে আনতে যেতাম। তখন এসব কাজের গুরুত্ব বা উদ্দেশ্য বুঝতাম না। মনে করতাম, ক্যাম্পাসে খাবার প্রায় শেষ হয়ে আসছে, তাই

বাজার করা হয়েছে এবং তা বহন করে আনতে হচ্ছে। এখন উপলব্ধি করি, একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের সবারই দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন।

২০১৯ সালটি আমার জীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সময় ছিল। তখন আমি এইচএসসি প্রথম বর্ষ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। পাশাপাশি আমি স্পোর্টসে খুব ভালো ছিলাম। স্কুলে আমার ইভেন্ট ছিল খো খো খেলা। কিছুটা আমাদের দাড়িয়াবান্দার নিয়মে।

বাংলাদেশ জাতীয় খো খো ফেডারেশন থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে আমাকে ঢাকায় আসতে হয় ২০১৯ সালে। আমার বিশ্বাস ছিল সবচেয়ে ভালো খেলাটা টিমকে দেবো এবং জাতীয় টিমে নিজের জায়গা করে নেব। ঠিক যেমন ভাবনা তেমনি পরিশ্রমে লেগে পড়লাম। বাছাইয়ের ঠিক সাত দিনের মধ্যে আমাদের কোচ টিমের বেস্ট নয় জনের মধ্যে সিলেক্ট করলেন আমাকে। সাধারণত এ খেলায় টিম গঠিত হয় ১৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে।

এভাবে ক্যাম্পে ছয় মাস পার হয়ে গেল। এই ছয় মাস আমি পরিশ্রম করেছি দেশের সুনামের জন্যে। মনে আছে সেই দিনের কথা যেদিন প্র্যাকটিস করতে গিয়ে হাতের বুড়ো আঙুল মচকে গিয়েছিল। তখন কোচ আমাকে শুধু একবেলার জন্যে ছুটি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমি সেই আঙুল নিয়েই প্র্যাকটিস করেছি। সে-বছর নভেম্বর মাসে ১৩ তম সাউথ এশিয়ান গেমস-এ অংশ নিতে নেপাল যাই। প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে গেলাম আমি। খো খো খেলায় আমাদের দল রৌপ্যপদক অর্জন করে।

দেশে ফিরে আরো বড় চ্যালেঞ্জ শুরু হয় পড়ালেখা নিয়ে। কেননা খেলাধুলার জন্যে প্রায় সাত মাস পড়ালেখার বাইরে ছিলাম আমি। আমার বন্ধুরা তখন সবাই পড়ালেখায় আমার থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। এরপর কোভিড-১৯ চলে এলো এবং পড়ালেখার আরো বারোটা বেজে গেল। করোনা পরিস্থিতি শিথিল হলে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষার রুটিন প্রকাশিত হলো। প্রস্তুতির জন্যে মাত্র তিন মাসের মতো সময় পেয়েছিলাম। ভাবতে শুরু করলাম, এখন ভালো কিছু করতে হবে আমাকে। টানা তিন মাস শুধু রাতে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। পরীক্ষা চলাকালেও আমি

আমার সেই পরিশ্রমকে অব্যাহত রেখেছিলাম। যার ফলাফল এইচএসসি-তে জিপিএ-৫ পেলাম।

এরপর চট্টগ্রামে শুরু করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির প্রস্তুতি। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন মা খুব অসুস্থ হয়ে যান। মায়ের অসুস্থতার কথা শুনে সেদিনই চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। টাকা-পয়সার অভাবের কারণে মাকে ভালো হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি নি সেদিন। লামার সরকারি হাসপাতালে মাকে ভর্তি করিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে রাত ঘনিয়ে আসে। পাশের এলাকা থেকে আমার বড় দিদিরাও মাকে দেখতে চলে আসেন।

আমাদের এলাকায় আর ভালো কোনো হাসপাতাল নেই। তখন আবার বর্ষার মৌসুম। রাতে মশার দল আসত আমাকে পাহাড়া দিতে! আর আমি পাহাড়া দেই মাকে। বর্ষার জন্যে রাতে বিদ্যুৎ ছিল না হাসপাতালে। আমি আর বড় দিদি মায়ের পাশে বসে আছি। আমি কাগজ দিয়ে মাকে বাতাস করছি। ঐ রাতে বড় দিদিও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি সেই মুহূর্তে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। কাঁদতেও পারছি না মায়ের ঘুমের অসুবিধার কথা ভেবে। দিদি বললেন, 'কিছু হবে না আমার'। এই বলে দিদি মায়ের পাশে শুয়ে পড়লেন। আমি দিদিকে আর মাকে সারারাত বাতাস করলাম। বার বার নিজেকে বললাম—আমাকে বড় কিছু, ভালো কিছু করতে হবে জীবনে।

এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষার সময় চলে এলো। কিন্তু খুব একটা ভালো প্রস্তুতি ছিল না। যখন শুনলাম, জাতীয় টিমের খেলোয়াড়দের জন্যে আলাদাভাবে পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দেয়া হচ্ছে, তখন সেই সুযোগ পেয়ে পরীক্ষা দিলাম। স্রষ্টার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা যে, পরীক্ষায় অংশ নেয়া বিভিন্ন স্পোর্টসের জাতীয় টিমের ১৩ জনের মধ্যে আমি প্রথম হই।

এখন আমি ভালো রেজাল্ট করার এবং একজন দেশসেরা গ্রাফিক ডিজাইনার হওয়ার স্বপ্ন দেখি। আরো স্বপ্ন দেখি—দেশের জন্যে এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করব। জাতির কাছে একটি উদাহারণ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব। □

আমার জীবন হয়তো একটা পাহাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেত

ইয়াইয়ং ম্রো
ড্রইং এন্ড পেইন্টিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার বাড়ি বান্দরবানের আলীকদম উপজেলার কুরুকপাতা ইউনিয়নের ক্রংলেং পাড়ায়। শৈশব কেটেছে সেখানেই। শ্রাবণের প্রখর রোদ, ঢালু পাহাড়ের নিস্তব্ধ গ্রামে ঘন মেঘের ছায়া মাঝে মাঝে এসে উঁকি দেয় আবার চলে যায়। ছোট ঝিরিতে কলা পাতার শক্ত ডাটা অনেকগুলো একসাথে করে চিকন কাঠি দিয়ে নৌকা বানিয়ে পানিতে ছেড়ে দিতাম। পেছনে পেছনে দৌড়াতাম আমরা। এই দলে আমার একজন প্রিয় বন্ধু ছিল। আমাদের বন্ধুত্ব খুব গাঢ় ছিল। ও যেখানে আমিও সেখানে।

আমরা চার ভাই, দুই বোনের মধ্যে আমি পঞ্চম। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন এক দুর্ঘটনায় বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তখন আমি পরিবারে সবচেয়ে ছোট ছিলাম। আর আমার ছোট বোন ছিল মায়ের গর্ভে। ছোট বোনের জন্যে বেশি খারাপ লাগে। কারণ আমি না হয় বাবার কিছু স্পর্শ পেয়েছি, কিন্তু আমার বোন, সে তো পৃথিবীতে এসে বাবা বলার মতো কাউকে পায় নি।

বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারে দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমে আসে। ভাইদের থেকে শুনেছি, সে-সময় তারা দুই বেলাও নাকি ঠিকমতো খেতে পারত না। তাছাড়া চাল কম থাকায় চাল আর পাহাড়ের আলু একসাথে রান্না করা হতো। এতে ভাত পায়েসের মতো হয়ে পরিমাণে বেড়ে যেত। ফলে সবাই খেতে পারত। এ অবস্থায় তারা কী করবে বুঝতে পারছিল না। আমি আর ছোট বোন তো তখন অবুঝ শিশু।

এসময় মায়ের পাশে আমার কাকু এসে দাঁড়ান। কাকু জঙ্গল থেকে শিকার করে যা পেত তা-ই সবাই মিলে খেতাম। কাকু আমাদের ক্ষুধা ভোলানোর জন্যে বাদুড় ধরে এনে বাদুড়ের পায়ে দড়ি বেঁধে আমাদের খেলতে দিতেন। আমরা বাদুড় নিয়ে খেলতে খেলতে খাবারের কথা ভুলে যেতাম। আসলে ছোটবেলায় তো খেলার কিছু পেলেই আমরা খাওয়ার কথা ভুলে যেতাম।

ঐদিকে আমার সেই প্রিয় বন্ধুর বাবা একা হয়ে গেছেন। কারণ তার মা কোনো কারণে নিরুদ্দেশ! আমাদের পরিবার আর তাদের পরিবারকে গোছানোর জন্যে গ্রামের লোকেরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমার মায়ের সাথে তার বাবাকে বিয়ে দেবে। বিয়ে হয়েও গেল। এরপর থেকে আমরা হয়ে গেলাম আট ভাইবোনের পরিবার। আর বন্ধু হয়ে গেল আমার ছোট ভাই।

আমার বড় ভাইয়ের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ। কারণ বড় ভাই দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের জন্যে অন্ধকারে আলো ফুটিয়েছে। আমার বড় ভাই পড়ালেখা করত আলীকদম সদরে অর্থাৎ আমাদের বাসা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে। তখন আবার গাড়ির রাস্তাও ছিল না। আলীকদম থেকে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরতে হতো। সুযোগ পেলেই সে মাকে জুমের কাজে সাহায্য করত। কারণ বড় ভাই বাদে আমরা সবাই ছোট ছিলাম, কাজ করতে পারতাম না।

বাবা মারা যাওয়ার পর বড় ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ দেয়া কঠিন হয়ে যায়। তারপরেও বিভিন্ন কাজ করে সে নিজের এবং পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার চেষ্টা করেছে। বড় ভাই বরাবরই একটু সচেতন ছিলেন। তাই আমার পড়ালেখার জন্যে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ফরম সংগ্রহ করলেন। আমাকে কোয়ান্টামে ভর্তি পরীক্ষার জন্যে নিয়ে গেলেন।

সেদিন আমার যে এত ভালো লেগেছিল! মনে হয়েছিল যেন এক নতুন পৃথিবীতে পা রেখেছি। কারণ আমি গাড়ি বলতে মাটির তৈরি খেলনা বুঝি। কিন্তু কখনো আসল গাড়ি দেখি নাই। তারপর দালান-কোঠা, বিল্ডিং এবং গাড়িতে চড়া এগুলো আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন বিষয়।

এরপর এই স্কুলেই আমার জীবন শুরু হলো। আসলে কোয়ান্টামে যদি ভর্তি না হতাম তাহলে হয়তো বড় কলম (দা, কোদাল, কুঠার) ধরতাম। জীবনটা একটা পাহাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যেত। আমি দেখেছি আমার ভাই-ভাবি ভোরে ঘুম থেকে উঠে জুমে চলে যায়। আবার বিকেলে ঘরে ফিরে ক্লান্ত শরীর নিয়ে। ছুটিতে বাসায় গেলে আমি নিজেও কাজ করেছি ভাইদের সাথে। কোয়ান্টামে ভর্তি না হলে হয়তো আমি নিজেকে, দেশকে এবং পৃথিবীকে এত ভালোভাবে জানতে পারতাম না। আমাদের গ্রামে এখনো মোবাইল নেটওয়ার্ক নাই যে সহজে কোনো বার্তা পাঠানো যাবে।

মজার বিষয় হচ্ছে, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পড়া অবস্থায় আমাদের বাসায় সপ্তাহে একদিন কল করে কথা বলার সুযোগ দেয়া হতো। কিন্তু আমাদের গ্রামে নেটওয়ার্ক না থাকলেও কখনো কখনো আবার পাহাড়ের উপরে উঠলে পাওয়া যেত কিছুটা। তাই বাসায় আমার কল দেয়াটা লুডু খেলার মতো ছিল—ছক্কা পড়লে কলে পেতাম না হলে নাই।

আসলে কোয়ান্টামে ভর্তি হয়ে আমি আমার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পেরেছি, পেরেছি নিজেকে আবিষ্কার করতে, পেরেছি দেশের সম্পদ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে। আমার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করার জন্যে কোয়ান্টামের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তবে কোয়ান্টামে প্রথম এসে আমি নিজেকে একা অনুভব করতাম। ছোট ছিলাম। বাংলা পারতাম না, শুধু কাঁদতাম। কিন্তু স্কুলের শিক্ষকেরা আমাকে বাংলা ভাষা, পড়ালেখা, খেলাধুলা, শুদ্ধাচার, গান-নাচ, ছবি আঁকা শিখিয়েছেন ধীরে ধীরে। বড় যখন হলাম এই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনকে বন্দিজীবন মনে হতো। কখনো কখনো পালিয়ে যেতে চাইতাম। কিন্তু ভাবতাম পালালে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোয়ান্টামের প্রত্যেকটা নিয়মের সাথে চেষ্টা করতাম নিজেকে মানিয়ে নিতে। এক্ষেত্রে স্যাররা আমাকে কাউন্সেলিং করতেন। মমতা দিয়ে বোঝাতেন। আমিও শান্ত হয়ে যেতাম। এখন এসে বুঝতে পারি, স্যাররা কতটা মমতা দিয়েছেন সে-সময়।

যখন শিশুশ্রেণিতে ছিলাম তখন বড় ভাইদের দেখে ভাবতাম—ইশ! আমি

কখন বড় ক্লাসে উঠব। কারণ আমার সবসময় শুধু বড় হতে ইচ্ছে করত। ধীরে ধীরে পঞ্চম শ্রেণি, ষষ্ঠ শ্রেণি, তারপর একসময় কলেজ পাশ করলাম। এভাবেই কোয়ান্টামে ১৫ বছর অতিক্রম করেছি নিজের অজান্তেই।

অনেকে ভাবতে পারে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি, নিশ্চয়ই আমি ভালো ছাত্র ছিলাম। আসলে তা না। আমি শিশু থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের ছাত্র ছিলাম। ষষ্ঠ শ্রেণিতে গণিতে ৫০-এর মধ্যে ৫ নম্বর পেয়েছি এমনও হয়েছে। পড়ালেখার এই অগোছালো অবস্থার কারণে ষষ্ঠ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারি নি। ফেল করার পর আমার আক্কেল হলো যে, আমাকেও কিছু করতে হবে। স্যারদের অনেক আবেদনপত্র দিলাম যেন আমাকে সপ্তম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়। এটা জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ছিল।

আমি নিজেকে বলেছিলাম যে, ক্লাসে ১ থেকে ১০-এর মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসব। আমার সব থেকে ভয় ছিল গণিতে। তাই ভয় দূর করার জন্যে গণিত দিয়েই শুরু করেছিলাম। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলাম। অনেক পরিশ্রম করে সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় সপ্তম হয়েছি। এভাবে আমি সব জায়গায় নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিলাম। একপর্যায়ে নিজের কিছু চেষ্টা এবং কোয়ান্টামের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি স্বপ্নের চারুকলা বিভাগে।

আমার জীবনের গল্পকে যদি এককথায় বলতে চাই—শিশুকালে যে অবস্থায় আমি ছিলাম, সেখান থেকে নিজেকে আজ একটি অবস্থানে দাঁড় করাতে পেরেছি। সুন্দর একটি পরিচয় সৃষ্টি হয়েছে আমার। সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। □

আমি সফল হবো

মো. নাজমুল ইসলাম
ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

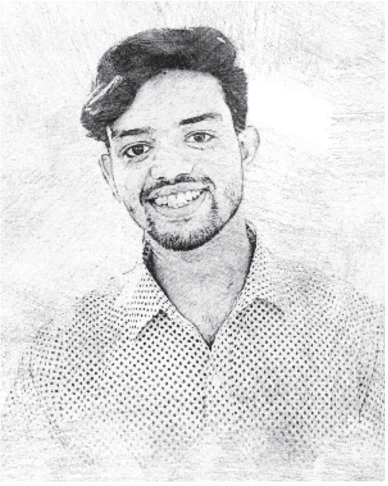

বাবার একার আয়ে সংসার চলত। আমি মা-বাবার ছোট সন্তান। মা-বাবা আমাকে যেন ভালোভাবে পড়ালেখা করাতে পারেন, এজন্যে মেজো ভাইয়া অষ্টম শ্রেণি পাশ করার আগেই পড়ালেখা ছেড়ে দেন।

যে স্কুলে পড়তাম সেটা বেসরকারি ছিল। সেখানে মাসিক বেতন আর ফরম পূরণের টাকা জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। সম্পূর্ণ টাকা দিতে না পারলে পরীক্ষা দেয়া যেত না। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে সম্পূর্ণ টাকা শোধ করা কষ্টের ছিল। এজন্যে দরখাস্ত লিখে, অনেক অনুরোধ করে পরীক্ষা দিতে হতো। নিয়মিত স্কুলে যাওয়া হতো না। পড়ালেখায়ও তেমন ভালো ছিলাম না। স্কুল থেকে বৃত্তিও পেতাম না। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো, খেলাধুলা, ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাতে তখন বেশি ভালো লাগত।

মা ভেতরে অনেক কষ্ট নিয়ে আমাকে বোঝাতেন—বাবার একার আয়ে সংসার চলে। ঠিকমতো লেখাপড়া করাতে পারবেন না। অন্য ভাইবোন কাউকে

তারা লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি। এজন্যে আমাকে নিয়েই তাদের স্বপ্ন। এক আত্মীয়ের কাছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। অনেক আগ্রহ নিয়ে কোয়ান্টামে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তিন মাস পরে কোয়ান্টাম থেকে জানানো হলো আমি ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করেছি। পরের দিন বাবা আমাকে লামায় নিয়ে গেলেন। গাড়িতে ওঠার সময় পরিবারের সবার থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। মা আমার সামনে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেও তার ভেতরে কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম। আমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে বাবা বাড়ি ফিরে গেলেন। বাবার ফিরে যাওয়ার দৃশ্যটা আজও মনে পড়লে চোখে পানি চলে আসে।

আমাকে এত দূরে পড়ালেখা করতে পাঠানোর ফলে প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, এলাকার মানুষদের কাছ থেকে মা-বাবাকে অনেক কটুকথা শুনতে হয়েছে। 'এত ছোট ছেলেকে কেন এত দূরে পাঠিয়েছেন? বাড়িতে কি খাবারের অভাব? এদিকে কি পড়ালেখা নাই?'—এরকম অনেক কথা।

আমি ২০১৭ সালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হই। পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব সবকিছুই নতুন। সে-বছর জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় রেজাল্টও খারাপ হয়। আসলে প্রথম প্রথম নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবে সে-বছরই আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। কোর্স করার পর নিজের জীবনের লক্ষ্য ঠিক করতে পারি।

এরপর নবম শ্রেণিতে বাণিজ্য বিভাগ বেছে নিলাম। তখন থেকে পড়ালেখায় সিরিয়াস হই। নবম শ্রেণিতে ভালোভাবে লেখাপড়া করায় দশম শ্রেণিতে আমি প্রথম হলাম। আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লেগেছিল। আগে ভাবতাম কলেজের পর পড়ালেখা শেষ। কোয়ান্টামে আসার পরে দেখি ভার্সিটি পড়ুয়া ভাইয়েরা অ্যাডমিশন পরীক্ষার্থীদের ভর্তি কোচিং করাতে আসেন। তখন আমার ধারণা পাল্টে যায়।

কোয়ান্টামে ভর্তি হওয়ার পর সবাইকে একটা নির্দিষ্ট ইভেন্ট দেয়া হতো। আমি কাবাডি খেলতাম। তখন আমি খুবই হালকা গড়নের ছিলাম। তাই কয়েক মাস পরে আমার ইভেন্ট পরিবর্তন করে দেয়া হলো। এরপর আমাকে প্যারেডে দেয়া হয়। যার সুবাদে ২০১৯ সালে ২৬ মার্চ ঢাকায় কুচকাওয়াজ ও শিশু-কিশোর জাতীয় সমাবেশে প্যারেডে অংশগ্রহণ করি।

এরপর ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিলাম। এ প্লাস পেলাম। কলেজে প্রথম থেকেই পড়ালেখায় সিরিয়াস ছিলাম। নবম-দশম শ্রেণিতে লেখাপড়ায়

মনোযোগী থাকায় আমার লেখাপড়ার ভিত্তিটা ভালোভাবে গড়ে ওঠে। এজন্যে কলেজে পড়ালেখায় তেমন চাপ অনুভব করি নি। কমার্স থেকে এইচএসসি-তে একজন বাদে আমরা সবাই এ প্লাস পেয়েছিলাম। আমাদের ভালো করার পেছনে মূল কারণ ছিল সবার ভেতর ভালো বন্ডিং—একজন পড়া না পারলে আরেকজন বুঝিয়ে দিত।

আমি কোয়ান্টাম কসমো কলেজে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি নিই। প্রায় সময় আফসোস করতাম বাইরে কোচিং করলে মনে হয় ভালো হতো। বাইরে কোচিং করলে পর্যাপ্ত বই, পরীক্ষা, শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ, ইন্টারনেটের সুবিধা সবকিছুই পেতাম। কিন্তু পরবর্তীতে আমার এই ধারণা ভেঙে যায়। কারণ আমরা যেভাবে প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পেয়েছি সেটাই আমাদের জন্যে ভালো ছিল। আমাদেরকে ভার্সিটি ভর্তি প্রস্তুতির এক সেট বই দেয়া হয়েছিল। সাথে পূর্বের ভর্তি পরীক্ষার্থীদের বই, পাঠ্যবই তো ছিলই।

আমি স্কুল থেকেই নিয়মিত মেডিটেশন করতাম। নিয়মিত নামাজ পড়তাম। সে-সময় আমরা ইন্টারনেট থেকে দূরে ছিলাম, যার ফলে বাইরের শিক্ষার্থীদের মতো আমাদের ফোনের পেছনে আলাদা সময় ব্যয় হতো না। নিজে একটা রুটিন করে নিয়েছিলাম। আমরা নিজেরাই প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষা দিতাম। স্যারও মাঝে মধ্যে প্রশ্ন নিয়ে আসতেন। স্বাভাবিকভাবেই আমার ইচ্ছা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। প্রস্তুতিও সেভাবে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ঢাকা ভার্সিটির পরীক্ষাটা আশানুরূপ হয় নি। তখন অনেক ভেঙে পড়ি। মা-বাবা, মেজো ভাই, বোন আমাকে অনেক বোঝায়।

এরপর গুচ্ছভুক্ত ২২ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেই। সেখানে আমি চান্স পাই। বাবা-মা শুনে সেদিন কতটা যে খুশি হয়েছিলেন, তা বলে বোঝাতে পারব না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ-তেও সুযোগ পাই। তবে আমি ঢাকার মধ্যেই পড়তে চেয়েছিলাম তাই ভর্তি হই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগে।

এখন আর মা-বাবাকে পাড়া-প্রতিবেশীর কথা শুনতে হয় না। সেই দিন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলেই আজ তারা গর্বের সাথে বলতে পারেন আমার সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আমার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার অনেকে তাদের সন্তানদেরকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমার জানা মতে, আমাদের এলাকা থেকে আমিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছি। এজন্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে লাখ লাখ

শুকরিয়া। কখনো কখনো মনে হয় কসমো স্কুল ও কলেজে না পড়লে হয়তো আজ এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না।

কসমো স্কুল ও কলেজ ছাড়াও কোয়ান্টামের বিভিন্ন রকমের সেবা কার্যক্রম রয়েছে। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচিতে আমি এ পর্যন্ত চার বার রক্ত দিয়েছি। যতদিন সুস্থ থাকব রক্তদান করে যাব। আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে নিয়মিত কোয়ান্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক) হিসেবে কাজ করছি।

মা-বাবা ও পরিবারের সবাই আমার ওপর ভরসা করে। আমি সফল হতে চাই, বড় হতে চাই। পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে চাই। আমি ভালো মানুষ হতে চাই। সমাজের, জাতির কল্যাণ করতে চাই। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম থেকে দেশ ও জনগণকে সেবা দিতে চাই। □

এই স্কুলে না পড়লে হয়তো লেখাপড়াই করা হতো না

লেনার্ধ সাংমা
আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

মাদক আর নেশায় বিপর্যস্ত এক গ্রাম। সেই গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। গ্রামের সবার সাথেই মিলেমিশে চলতাম। কিন্তু এলাকার পরিবেশটা তেমন ভালো ছিল না। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি—আমাকেও নেশার আগুন পেয়ে বসেছিল সেই ছোটবেলাতেই। আবার পারিবারিক বিভিন্ন কারণে আমি ছিলাম গ্রামের মানুষের তাচ্ছিল্যের বিষয়বস্তু। আমাকে গ্রামের লোকেরা প্রচুর বিরক্ত করত ও কটুকথা বলত। তাদের আচরণে কষ্ট পেতাম। এসব মনে পড়লে আজও আমি ব্যথা অনুভব করি। কিন্তু কথায় আছে না—সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ আর ভাগ্য নিয়েই আমাদের জীবন।

মানুষের ভাগ্যও দুই ধরনের—সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। এমন অবস্থায় আমার বাল্য জীবনে সৌভাগ্যই এসেছিল, যা আমাকে জীবনের গুরুত্ব ও নিজেকে ভালবাসার শিক্ষা দিয়ে বদলে দিয়েছে, নেশা থেকে মুক্ত করেছে। আমার

সৌভাগ্যের কাহিনীই বলব আজ। এটাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এজন্যেই আমি আজ নেশামুক্ত পুরোপুরি সুস্থ একজন মানুষ। ভাগ্যই আমাকে শিক্ষার প্রদীপ বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে নিয়ে এসেছিল।

আমি ২০০৯ সালে ছয় বছর বয়সে সূচনা শ্রেণিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হই। এলাকার পরিচিত খ্রিষ্টফার স্যার আমাকে এই স্কুলে নিয়ে আসেন। তিনি কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের দায়িত্বশীল ছিলেন।

এখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের একসাথে থাকার বিষয়টি আমার খুবই ভালো লাগত। বিভিন্ন ভাষা, ভাষার ধরন ও উচ্চারণ শুনে ভালোলাগা কাজ করত, সেগুলো শেখার চেষ্টা করতাম। আবার বিভিন্ন জাতির বন্ধুও পেয়েছি। বন্ধুত্বের সেই স্মৃতিগুলো কখনোই ভুলতে পারব না।

হ্যান্ডবল আমার পছন্দের একটি খেলা। খেলার কোচ ছিলেন কায়সার জাহিদ আহমেদ স্যার। চেষ্টা করতাম খেলায় দক্ষতা অর্জন ও স্যারের সুযোগ্য শিষ্য হওয়ার। এই খেলা আমাদের জীবনে অনেক আনন্দ-বেদনার স্মৃতি জন্ম দিয়েছে। স্যারের সাথে স্মৃতিগুলো আজও মনে পড়ে। আমার মন আজও মেনে নিতে পারে না যে, স্যার আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন। কোয়ান্টা জীবনে ২০১৭ সালের ১৩ জুন আমার জন্যে সুখের একটি দিন। সেদিন জাহিদ স্যারের মুখে শোনা 'লেনার্ধ! তুমি আন্তঃস্কুলে খেলার সুযোগ পেয়েছ'—বাক্যটি আমাকে অনেক বেশি প্রাণশক্তি জুগিয়েছিল।

আর লুকিয়ে লুকিয়ে ফুটবল খেলা আলাদা একটা আনন্দ দিত। ফুটবল খেলা আমি খুবই পছন্দ করি। আমার ভালো লাগে খেলা করতে এবং কাউকে সাহায্য করতে পারলে। খেলাধুলা করার সময় আমি একদম পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খেলি। অন্য কিছু ভাবার সময়ও পাই না। টেনশনমুক্ত থাকি। আর যে-কাউকে সাহায্য করতে পারলে আমি মনে প্রশান্তি অনুভব করি। আমার আরো শখ হলো গল্পের বই পড়া, পশু-পাখির যত্ন ও লালনপালন করা এবং গাছ লাগানো ও যত্ন নেয়া।

গুরুজী দাদুর সাথে স্মৃতি হিসেবে বেশি মনে পড়ে পাবলিক পরীক্ষার আগে দাদুর কাছে দোয়া নিতে যাওয়া এবং ভালো ফলাফল করতে পারা। ছোটবেলায় যখন দেখতাম—গুরুজী দাদু ঢাকা থেকে এসেছেন, আমি সবসময়

লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতাম। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে চলে আসার আগে তাকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। গুরুজী দাদুর হাসির আওয়াজ খুবই সুন্দর। সেই হাসির আওয়াজটা কানে এলে আমিও সাথে সাথে হেসে ফেলতাম। তার মতো আমি নিজেকে ভালো মনের, মহৎ মনের মানুষ এবং সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেবা করার মাধ্যমে আমি প্রভুর ভালবাসা পেতে চাই। তাছাড়া খেলাধুলায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে অগ্রপথিক হওয়ার ইচ্ছে আছে।

আমার জীবন বদলাতে ও জীবনের মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ভূমিকা বলে শেষ করতে পারব না। কোয়ান্টামের কিছু ভালো দিক আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি। আমি খুব জেদী ও রাগী মানুষ ছিলাম। মেডিটেশন করে কিছুটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি। এই স্কুল আমার জীবন বদলে দিয়েছে। পাঁচ বছর বয়সেই আমি নেশার সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম! যদি এখানে না আসতাম আমার জীবন কেমন হতো তা এখন ভাবতে গেলে অন্তরটা কেঁপে ওঠে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত এখানে চলে আসায় জীবনে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে।

এসএসসি-র পর আমি নিজের ইচ্ছায় ময়মনসিংহ চলে আসি। এখানে আনন্দমোহন কলেজে পড়ছি। কোয়ান্টাম এখনো আমার পাশে আছে।

আর আমি আমাদের গারো সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নতির দিকে নিতে চাই। আমার জনগোষ্ঠীকে নেশামুক্ত করে উপযুক্ত জনসম্পদে রূপান্তর করতে চাই। আমি মনে করি, আমরা কোয়ান্টারা বাংলাদেশকে স্বর্গভূমিতে রূপান্তরে ভূমিকা রাখতে পারব। কারণ আমরা জেনেছি—সব সম্ভব! এটাই তো একজন তরুণের প্রত্যয় হওয়া উচিত। □

ভোকেশনালে পড়েও জেনারেল শাখায় ভালো করা সম্ভব

শিহাব সজীব

ফলিত গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

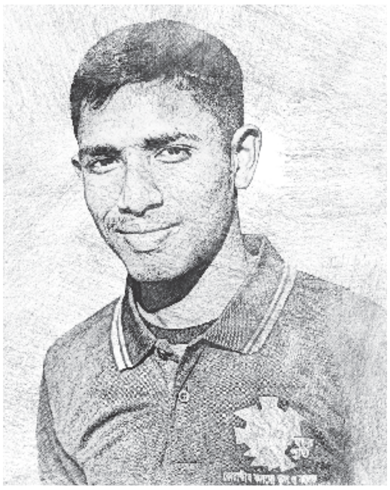

২০১৯ সালের ১৯ মার্চ। একটা বিশেষ দিন। কিছুদিন আগে মোবাইল ফোনে খবর এসেছে ২০ তারিখে লামায় পৌঁছাতে হবে। আমার মেডিকেল চেক-আপ করা হবে। আর কোনো অসুবিধা না থাকলে ওখানকার স্কুলের কারিগরি শাখার নবম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাব। স্কুলের নামটা অবশ্য অজানা। মামা মাস তিনেক আগে বলেছিলেন ভালো একটা স্কুল পেয়েছেন আমার জন্যে।

হোস্টেলে বা বাড়ির বাইরে থেকে পড়াশোনার অভিজ্ঞতা তখনো হয় নি। অনেক আগ্রহ ছিল হোস্টেল জীবন কেমন তা জানার। স্কুলটাতে ভর্তি হওয়ার জন্যে তাই খানিকটা ব্যাকুলই ছিলাম। আমার ব্যাকুলতা আরো তীব্র হলো যখন শুনলাম স্কুলটা কক্সবাজারে। পাহাড়ও আছে। পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝে একটা তিন-চারতলা স্কুলভবন, সাথে হোস্টেল। সামনে বড় খেলার মাঠ। বন্ধুরা মিলে সব ক্রিকেট খেলছি। আর আমি তাদের তারকা খেলোয়াড়। বিকেলে সাগরের

পাশে পাহাড়ের পাদদেশে সাইকেল চালাচ্ছি। চারদিকে জঙ্গল, বানর আর পাখির ঝাঁক। হরেক রকম সাপ আর নানা বন্যপ্রাণী। ক্লাসের পড়ায় ওস্তাদ আমি। আর লাইব্রেরি এবং ল্যাবের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য। এমন একটা দৃশ্যপট গেঁথে গেল মনের গহীনে।

জীবনে প্রথম বাড়ির বাইরে পড়াশোনা, প্রথমবারের মতো লম্বা দূরত্ব অতিক্রম, প্রথম পাহাড় দেখা, প্রথম জঙ্গলে যাওয়া, প্রথম পাহাড়ি মানুষ দেখাসহ আগমনী যাত্রাটা প্রায় পুরোটাই নতুন অভিজ্ঞতায় ভরা।

পরে জানতে পারি এটা কক্সবাজার নয়! এটি বান্দরবানের লামার একটি জায়গা। যা-হোক পাহাড়ি পরিবেশ তো পাবই—এ আশাটুকু ছিল। আমিরাবাদ থেকে সিএনজি নিয়ে কোয়ান্টামমে আসার সময় খুব ভালো লাগছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর কোয়ান্টামমে পৌঁছে একটা অসাধারণ আবেশ সৃষ্টি হয় মনে। যদিও আমার মা বেশি জার্নির কারণে খানিকটা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ দিনই মেডিকেল চেক-আপ শেষে আমাদেরকে ভর্তি করানো হলো। আমরা যারা ভর্তি হয়েছিলাম, তাদেরকে বেশ কয়েকটা পাহাড় পার করে একটা জায়গায় নেয়া হলো। পরে জেনেছিলাম ওটাই আমাদের ক্যাম্পাস।

ক্যাম্পাসে রওনা হওয়ার আগে মায়ের কাছে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সব দিয়েছিলাম। ভেবেছি পরে দেখা হবে। তাই তেমন কোনো কথা হয় নি। বিদায় জানানোও হয় নি। তারপর দেখা হয়েছিল নয় মাস পর। বার্ষিক ছুটির সময়।

আমি ছোটবেলা থেকেই ভাবতাম, যখন বড় হবো তখন পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল সব জায়গায় ঘুরব। তাই এখানে এসে পাহাড়, জঙ্গল। আর আশ্চর্য শান্ত পরিবেশ আমার ভালো লাগে। আসলে আমি তো তখন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল, কোয়ান্টাম মেথড এসব কিছুই জানতাম না। শুধু মা আর মামার কথায় চলে এসেছি।

এসে দেখি আমার সাথে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি আমার অজান্তেই মনছবির প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ফেলেছি। বাড়িতে থাকার সময় আমার পড়ালেখার যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। তবে মা ছিলেন বদ্ধপরিকর। যে করেই হোক তিনি আমাদের পড়ালেখা করাবেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা মা তার দুই সন্তান অর্থাৎ আমাকে আর আমার ছোট ভাইকে পড়ালেখা করানোর জন্যে কী পরিমাণ কষ্ট করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

মায়ের বিয়ের আগে থেকেই বাবা অসুস্থ। পারিবারিক ষড়যন্ত্রে দাদার প্রচুর জমিজমা হাতিয়ে নিয়ে বাবাকে ভুয়া চিকিৎসা করিয়ে অসুস্থ বানানো

হয়েছিল। ছোটবেলায় দাদাকে হারিয়ে সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন বাবা। লেখাপড়ায় ভালো হয়েও নানান বিপাকে পড়ে জীবনে তেমন কিছু করা হয়ে ওঠে নি তার। বিয়ের পর বাবার অসুস্থতা বাড়তে লাগল। কাজকর্ম করার সামর্থ্য কমতে কমতে নামল প্রায় শূন্যের কোঠায়। পরিবারকে বাঁচাতে মা একটা এনজিও-তে চাকরি নিয়ে স্বল্প মজুরিতে বেদম খাটতে লাগলেন।

সংসার সামলাতে গত ১৮ বছর সংগ্রাম করেই চলেছেন তিনি। এনজিও-র এক প্রজেক্ট শেষ, তো অন্য কোনো প্রজেক্টে ঢোকার চেষ্টা। আমার মনে আছে, খুব ছোটবেলায় আমি তখন মোটামুটি কথা বলতে পারি, আমাকে হয় ঘুম পাড়িয়ে অথবা চাচাতো ভাইবোনদের সাথে খেলার তালে রেখে মা কাজে চলে যেতেন। মায়ের একবার স্ট্রোক হয়েছিল। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যান। তবুও কাজ চালিয়ে গেছেন। তবে মাকে একাই সবকিছু সামলাতে হয়েছে। এখন আপাতত কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। বর্তমানে যে জমি আছে তা দিয়ে মোটামুটি খাবারের মতো চাল পাওয়া যায়। আর কিছু বিক্রি করা হয়।

আর বাবা একটা মক্তবে পড়াচ্ছেন কয়েক বছর ধরে। বাবার আয়ের টাকা মোটামুটিভাবে তার ওষুধের খরচেই চলে যায়। মা আমাদের দুই ভাইকে ভালো পড়ালেখা করার মানসে স্থানীয় একটা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। উপরের ক্লাসে ওঠার সাথে সাথে খরচও বাড়তে লাগল সমান হারে।

প্রাইমারিতে সরকারি স্কুলে থাকায় তেমন অসুবিধে হয় নি। যখন আমি নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম, ছোট ভাই তখন পঞ্চম শ্রেণিতে। কয়েকদিন পর তারও খরচ যোগ হবে সাথে আমার খরচ তো আছেই। সব মিলে দিন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। আমাদের আত্মীয়রা সাহায্য করতেন। আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে যুদ্ধে নামতে হবে শীঘ্রই।

তাহলে মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছি! এতদিন তো মা সব ধকল সামলেছেন। বাবার অবদানও অবশ্য কম নয়। বাড়িতে থাকার সময় আমার কয়েকটা বিষয় নিয়ে চাওয়া এত প্রবল ছিল যে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যে করেই হোক তা আমি পূরণ করব। আর অপেক্ষা করছিলাম সুযোগের।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সুযোগ পেলে যোগব্যায়াম আর ধ্যান শিখব। অবশ্য সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতাম না। টিভিতে দেখে আর বইতে পড়ে আগ্রহবোধ করতাম। সব চাওয়া আগলে রেখেছিলাম, বড় হয়ে সামর্থ্য হলে পূরণ করব বলে। কসমো স্কুলে এসে এত দ্রুত সেই সুযোগ পেয়ে যাব আশা

করি নি। এখানে এসে আরো জানলাম মনছবি সম্পর্কে। এখানকার বেশিরভাগ ব্যাপারই ভালো লাগতে শুরু করল।

সময়ের সাথে সাথে কোয়ান্টাম সম্পর্কে জানতে থাকলাম, শিখতে লাগলাম। আমি বাড়িতে ঘরকুনো ছিলাম। এখনো কিছুটা সে-রকমই আছি। তারপরও কীভাবে যেন অনেক জনের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে!

দুই বছর মেয়াদি কারিগরি এসএসসি কোর্স শেষ করি কোয়ান্টাম কসমো স্কুল থেকে। আমরাই প্রথম ব্যাচ ছিলাম। বিজ্ঞান ভালো লাগে, তাই এসএসসি শেষে ভর্তি হয়েছি এখানেই কসমো কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে। এইচএসসি পরীক্ষায়ও এ প্লাস পেয়েছি।

অনেকে মনে করে, ভোকেশনাল বা কারিগরি থেকে পড়লে নাকি জেনারেল লাইনে ভালো করা যায় না। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নি। কেন পারব না? আমার কীসের অভাব! যদিও পথটা সহজ না। কিন্তু কঠিন কাজই তো আমাদের করতে হবে। পরম করুণাময়ের রহমতে বর্তমানে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতে পড়ছি। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বেছে নেয়ার সুযোগ ছিল কিন্তু আমি গণিত নিয়েই উচ্চতর পড়াশোনা করতে চাই। কারণ গণিত আমার খুব ভালো লাগে।

আসলে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সিলেবাসভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুধু নয়, পূর্ণাঙ্গ জীবনমুখী শিক্ষালাভের আদর্শ স্থান। কারণ এখানে এসে আমি নিজের মেধা সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি।

জীবনটা গড়ার এক অপূর্ব সুযোগ পেয়েছি এখানে। যারা এতে অবদান রাখছেন, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খাটো করতে চাই না তাদেরকে। তবে আশ্বস্ত করতে পারি, অনন্য মানুষে উত্তরণের পথে এখানে পাওয়া শিক্ষাগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। □

আনন্দটা যেন স্বাধীনতার

শাহনেওয়াজ হৃদয়

রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার জন্ম ২০০৪ সালে। গ্রামে দাদা-দাদি, চাচাদের আদরেই বেড়ে ওঠা। আম্মুর একমাত্র ছেলে তখন আমি। বাড়িতে তখন বেশ অভাব। আব্বু ২০০১ সাল থেকেই কোয়ান্টামমে কর্মরত ছিলেন। এর মাঝে আব্বু অনেকবার চলে যেতে চেয়েছেন বিদেশ। কিন্তু আব্বুকে কোথাও যেতে দিলেন না আম্মু। তার ইচ্ছে ছিল আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পড়াশোনা করাবেন। পাঁচ বছর বয়সে মা আমাকে বাবার সাথে কোয়ান্টামমে পাঠিয়ে দেন। আম্মু এখনো বলেন, তোকে পাঠানোর পর ২১ দিন আমার সময় কীভাবে যে কেটেছে! কারণ ২১ দিন পর আমার ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়। মা তখন ছোট ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

কিন্তু আমি কোয়ান্টামমে আসার পর দেখি আব্বুও আমার সাথে থাকেন না। আমাকে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে আবাসিক ছাত্রদের সাথে ভর্তি করে দেয়া হয়। আমার এখনো মনে পড়ে আমার ক্লাসের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি কাঁদতাম। যদিও কিছুদিনের মধ্যে ঠিক মানিয়ে নিয়েছিলাম।

ছোটবেলার সময়টা ছিল আনন্দ, ভয় ও নতুন কিছু শেখার সময়। পড়ালেখায় আমি প্রথম থেকেই ভালো করার চেষ্টা করেছি। স্মৃতি বলতে মনে পড়ে কুংফু শেখা, মাটি দিয়ে গাড়িসহ নানান জিনিস তৈরি, ছবি আঁকা, গান গাওয়া ও নাচের ক্লাসগুলো। ঐসময় তেমন না বুঝলেও এখন সে-সময়গুলো খুব মিস করি।

যখন ক্লাস ফাইভে উঠলাম হঠাৎ করে পড়াশোনার যে আনন্দ পেলাম তার একটা বড় কারণ প্রতিযোগিতা। স্যারেরা আমাদের খুবই কৌশলের সাথে পুরস্কার দিয়ে মাতিয়ে রাখতেন। আর আমার রেজাল্ট বরাবরই ভালো হতো। তারপর সিক্স, সেভেনে তেমন একটা পড়াশোনা হয় নি। ক্লাসে গল্প করা, স্যারের চোখ ফাঁকি দিয়ে গল্পের বই পড়া, দাবা খেলার মজাই ছিল অন্যরকম। বিকেলে টেবিল টেনিস খেলতাম। হঠাৎ একদিন আমাকে বলা হলো যে আমাকে বিজ্ঞান ক্লাবে চলে যেতে হবে। সেদিনের পর থেকে টেবিল টেনিস তেমন আর খেলা হলো না। সত্যি বলতে কখনো ভাবি নাই বিজ্ঞান এত মজার হতে পারে। ক্লাবে ঢোকার পর অনুভব করলাম পড়াশোনা আসলেই মজার হতে পারে। ক্লাস সেভেন, এইট, নাইনের বিজ্ঞান ক্লাবে খুব সক্রিয় ছিলাম। এছাড়াও আমি মনে করি ঐসময়ে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি—কিছু ভালো বন্ধু। আসলে একই রকম চিন্তাভাবনা করতে পারতাম আমরা।

বিজ্ঞান ক্লাবে থাকার সুবাদে আমি বিজ্ঞানমনস্ক হতে শিখলাম। একদিন স্কুলে ঘোষণা দেয়া হলো যে, আমাদের স্কুলে বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াড হবে। যারা চান্স পাবে তাদেরকে ঢাকায় প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন প্রথম অলিম্পিয়াডের সাথে পরিচয়। তারপর থেকেই বিজ্ঞানের যে-কোনো সমস্যার প্রতি ভালবাসা শুরু। বন্ধুরা মিলে স্যারদের কাছ থেকে গণিত অলিম্পিয়াডের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করলাম।

আমাদের নতুন ইভেন্ট তখন ব্যান্ড। খুব মনে পড়ে, আমি আর আমার বন্ধু ড্রাম বাজাতাম। আমাদের পকেটে থাকত ছোট্ট একটা পেন্সিল আর সাথে ভাঁজ করা থাকত গণিত অলিম্পিয়াডের একটা প্রশ্ন। যখনই সুযোগ পেতাম, ড্রামের উপরে কাগজ রেখে জ্যামিতিক ডায়াগ্রামগুলো এঁকে এঁকে সমস্যার সমাধান করতাম। একটা সময় এলো স্কুলের শিহাব শুভ স্যার আমাদের স্বপ্নের সীমা

বাড়াতে আমাদের নিয়ে ছোট্ট একটা গণিত ক্লাব খুললেন। সেইবার প্রথম গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়েছিলাম। এই অলিম্পিয়াডকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে একটা বিশাল পরিবর্তন আসে। সারাদিন একটা সমস্যার পেছনে লেগে থাকার এই প্রয়াস আমাকে এইচএসসি-তেও খুব সাহায্য করেছে। আমি মনে করি—এই পর্যন্ত জীবনের সবচেয়ে ভালো কিছু সময় পার করেছি এই অলিম্পিয়াডকে কেন্দ্র করে। তাই আমি মনে করি Mathematics is a lifestyle.

তারপর এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে কলেজে উঠলাম। আর কলেজ লাইফ যে কত ব্যস্ততায় কেটে গেছে তা তো বলার বাইরে। মনে হতো কবে ভাইয়াদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাব।

আজ স্বপ্নের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার সময় মনে হয় জীবনের সেই ১৫টি বছর বাবা-মাকে ছেড়ে থাকাটা সার্থক হলো। এই আনন্দটা যেন স্বাধীনতার। যেই স্বাধীনতার স্বাদ মনে জাগায় একরাশ কৃতজ্ঞতা।

মেডিটেশন আমার ভালো লাগত। জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় বলতেই হয় এই মেডিটেশনকে নিয়ে পার করেছি। কারণ কোয়ান্টাদের প্রতিদিন দুটি বা একটি মেডিটেশন করতেই হয়। কোয়ান্টা সাদাকায়ন ছিল এই মেডিটেশন এবং জীবনের নৈতিক চর্চাগুলোর প্রাণকেন্দ্র। সপ্তাহ শেষে কিছু বন্ধু ও কিছু ছোট ভাই মিলে এর আয়োজন করতাম। সত্যি বলতে আয়োজন করার মজাটা, অংশ নেয়ার তুলনায় বেশি ভালো লাগত আমার। অনেক কিছু শিখেছি জীবনে প্রথম হওয়ার এই প্ল্যাটফর্ম থেকে।

আমার ছোট্ট এই জীবনে কোয়ান্টাম থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। যখন আমি ক্লাস সেভেনে, তখনই আমার কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার সুযোগ হয়। সাথে কোয়ান্টায়ন, অন্বেষায়ন, খতমে কোরআন, লাইফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মতো আত্ম উন্নয়নমূলক অনেক প্রোগ্রাম করার সুযোগ পেয়েছি। আর এগুলোর বেশ কিছু প্রোগ্রাম পেয়েছি গুরুজী দাদুর সাথে। দাদুর সাথে কাটানো এই স্মৃতিগুলো আমার কাছে একেকটি অমূল্য রত্ন। বোর্ড পরীক্ষার আগে ক্লাসের সব বন্ধুরা লাইনে দাঁড়িয়ে গুরুজী দাদুর দোয়া নিতাম। কোনো সাফল্যে দাদুর বাহবা যেন কখনোই মিস হতো না। এই স্মৃতি বিজরিত শৈশবটি অনেক মিস করব। □

স্বর্গভূমি বাংলাদেশ আমরাই নির্মাণ করব

পারভেজ আলম

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

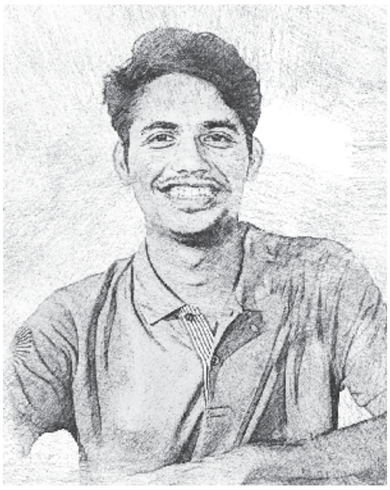

ভাবনা আর বিশ্বাস আমাকে দিয়েছে সাফল্যের অনন্ত পথে চলার অনুপ্রেরণা, তাই লক্ষ্যপানে আমি নির্ভয়ে হেঁটে যাচ্ছি। আজও মনে পড়ে, ফজরের আজানের আগে বাঁশ ঝাড়ে চড়ুই দলের কিচিরমিচির শব্দের আগেই আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো 'ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব'।

আসলে কোয়ান্টামমের মাটি আমার নিজের মাটি। এটাই আমার শিকড়। এখানকার প্রকৃতি আমার খুবই আপন। এখান থেকেই আমার পড়ালেখাসহ জীবন শিক্ষার হাতেখড়ি। ২০০৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আমি বাবার সাথে আসি। সূচনা শ্রেণিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হই। তারপর ১৫ বছর এখানেই অতিবাহিত করি। এখানকার আলো বাতাসের মাঝেই আমি একটু একটু করে বড় হয়েছি।

মা-বাবা সন্তানকে যেমন হাঁটতে শেখায়, কথা বলতে শেখায় এবং সকল প্রতিকূল অবস্থায় নিজের কথা না ভেবে সন্তানের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন, তেমনি আমার কাছে কোয়ান্টাম মা-বাবার মতোই উৎসর্গকারী এক

অভিভাবক। কোয়ান্টামের স্বেচ্ছাসেবকদের নিঃস্বার্থ শ্রমের ফসল আমি। এভাবে আমি এইচএসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছি। আর এখন আমি চুয়েটে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পড়ছি।

প্রাইমারির গণ্ডি শেষ করে হাই স্কুলে পা দিয়েছি। আগে সহজেই অন্যের কথায় প্রভাবিত হয়ে যেতাম। হীনম্মন্যতা যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। হতাশা সহজেই আচ্ছন্ন করে ফেলত। পড়ালেখায় ভালো হলেও দুশ্চিন্তা ছাড়া খুব কম দিনই অতিবাহিত হতো।

এছাড়া সৃজনশীল যে-কোনো কিছুতে আমি সবসময় আকৃষ্ট হয়েছি। সপ্তম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় মাসিক বিজ্ঞান চিন্তায় প্রকাশিত ম্যাথ অলিম্পিয়াডের কিছু মজার প্রশ্ন সময় পেলেই সল্ভ করতাম। ম্যাথ অলিম্পিয়াডের প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে মজা পেতাম। তারপরে ২০১৮ সালে অষ্টম শ্রেণিতে বর্তমান ফিকরান ক্যাম্পাসে কোয়ান্টাদের নিয়ে নতুন করে সাদাকায়ন শুরু হয়। আমি তৎকালীন আবাসিক লিডার শোভন স্যারের কথা শুনে সাদাকায়নে আসি। সাদাকায়নের বিষয়গুলো আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কেননা বিষয়গুলো আমার জন্যে নতুন ছিল। কথাগুলো আমাকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে ফেলে।

আমি ইনট্রোভার্ট টাইপের ছিলাম। নিজের কষ্ট এবং আনন্দগুলোকে প্রকাশ করতে পারতাম না। সাদাকায়ন করাতেন শিহাব স্যার। ভাবলাম স্যারের সাথে কথা বলি। সাদাকায়ন শেষ হয়ে যায় শুক্রবার সকাল ১০টায়। কিন্তু সাদাকায়নের পরেও আমি স্যারের সাথে হাঁটতে হাঁটতে তার কথাগুলো শুনতাম। এভাবে অনেক সময় বিকেলও হয়ে যেত। বুঝতে পারলাম, জীবনে বড় হতে হলে শুধু মেধাবী হলেই হবে না, আরো অনেক গুণের সংমিশ্রণ দরকার। হতাশা আমাকে যেন আটকে না দেয়, পথ চলায় হোঁচট খেলে যেন উঠে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা পাই সেজন্যে প্রয়োজন একজন প্রাজ্ঞ পথপ্রদর্শক।

লক্ষ্যের বিপরীত কাজগুলো আমাকে সে-সময় অনেক আনন্দ দিত। কিন্তু বুঝলাম আর নয়। আমাকে নিজের প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পেতে হবে। ২০১৯ সালে ক্যাম্পাস পরিবর্তন করে আমরা হিকমান ক্যাম্পাসে আসি। নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম।

এভাবে আমি যেমন বড় হতে লাগলাম, আমার স্বপ্নও বড় হতে লাগল। ম্যাথ অলিম্পিয়াডে আগ্রহী কিছু কোয়ান্টাকে নিয়ে আমরা ২০২০ সালে প্রথম ম্যাথ অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সে-সময় আমিসহ সাত জন কোয়ান্টা সেন্টারের জাহিদান হলের ৮/৮ ফুটের ছোট্ট একটা রুমে কিছু বই নিয়ে প্রস্তুতি

নিচ্ছিলাম। আমরা টিমের নাম দিলাম Mission Impossible. কিন্তু শ্রদ্ধেয় গুরুজী দাদু এটি কারেকশন করে দিয়ে বললেন, Mission Impossible : we will make it possible.

তারপরে গণিত চর্চা আরো বেড়ে গেল। গণিত এবং বিজ্ঞানকে জীবন হিসেবে দেখলাম। যেহেতু আমরা যোগ এবং ধ্যানচর্চা করি, গণিতকে যোগের অংশ বানিয়ে ফেললাম। যোগ/ইয়োগার আসনগুলো কল্পনা করতাম জ্যামিতির বিভিন্ন ফিগার হিসেবে। শুরু হলো ইয়োগা চর্চার মাধ্যমে জ্যামিতিক ফিগারগুলোকে আরো সুস্পষ্টভাবে অবলোকন করার প্রচেষ্টা। সেইসাথে ভোরবেলা আরোগ্যশালায় গিয়ে ধ্যানচর্চা যেন মনোযোগকে আরো সূচাগ্র করতে পারি। সেখানে মেডিটেশন করে 'ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব' প্রত্যয়ন দিয়েই আমাদের কয়েকজনের দিন শুরু হতো। গুরুজী দাদুকে খুব অনুভব করতাম। বারবার মনে হতো জীবনে আসলেই পথপ্রদর্শক দরকার।

প্রতিদিন অল্প অল্প করে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। কোয়ান্টামে বলা হয়—একা হলে ব্যক্তি আর সঙ্ঘে এলে শক্তি। তখন ম্যাথ অলিম্পিয়াডের পদক জয়ের উদ্দেশ্যে হোক আর যে-কোনো কারণেই হোক বন্ধু শাহনেওয়াজ এবং বাদশার সাথে থাকার ফলে ধীরে ধীরে 'আমি' থেকে 'আমরা' হয়ে উঠলাম। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার কারণে আমাদের দক্ষতা বেড়ে গেল কয়েক গুণ।

হঠাৎ শুরু হলো করোনা মহামারি। দেশে এবং বিশ্বে বিরূপ অবস্থার জন্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ হলে সবাই বাড়ি চলে গেলাম। কিন্তু আমরা একমাস পরেই ফিরে আসি কোয়ান্টামমে। মূলত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে এই ফিরে আসা। এসময় কম্পিউটারে নিজেকে দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করি।

করোনায় ছয় মাস স্কুল-কলেজ বন্ধের পরে নতুন উদ্যমে সবকিছু শুরু হয় ক্যাম্পাসে। আমরা ১৮ জুন ২০২১ প্রথমবারের মতো বড় পরিসরে কোয়ান্টা সাদাকায়নের আয়োজন করি। 'কোয়ান্টা সাদাকায়ন : জীবনে প্রথম হওয়ার প্ল্যাটফর্ম'—এই প্রত্যয়ন ধ্বনিত হলো সেদিন প্রথম। কলেজের ১০০ ফিট হলে সাদাকায়ন শুরু হলেও আমার মনে হয় সঙ্ঘের শক্তির কারণে এবং শতাধিক কোয়ান্টা আগ্রহী হয়ে উঠলে নেয়ামাতান হলে বড় পরিসরে সাদাকায়ন শুরু হয়।

ভাবনা আর বিশ্বাসের বলেই কিছুদিনের মধ্যে সাদাকায়নের পরিধি আমাদের ক্যাম্পাস থেকে অন্যান্য ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে পড়ল। আমরা সাদাকায়নকে আমাদের সংস্কৃতির অংশ করতে চাই—এমন কথাই শুনেছিলাম গুরুজী দাদুর কাছে। তখন মনে হতো সেই স্বপ্নই যেন বাস্তবায়নের পথে।

২০২১ সালে এসএসসি-তে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে কলেজে উঠলাম। কলেজে ওঠার পর আমাদের নিয়ে তৈরি হলো একটিভ কোয়ান্টিয়ার পুল। ১২ জন ছিলাম আমরা। কাজগুলো গুছিয়ে করার জন্যে নিয়মিত বৈঠক করতাম। আর সাদাকায়ন আয়োজনের ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকল আমার সামাজিক ফিটনেস। নিজের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে শুদ্ধ ও সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগ্রহ বাড়তে থাকল।

কোয়ান্টাম মানবিক মহাসমাজ নির্মাণ করতে চায়। কিন্তু প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়লে হবে না। বিন্দু বিন্দু পানি মিলেই অতল সাগর হয়। তাই আমাদের গণিতের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে শুরু হলো সায়েন্স ক্লাব, নাম দেয়া হলো—আমরা পারি বিজ্ঞান। এই ক্লাবে রয়েছে গণিত, প্রোগ্রামিং, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স, গ্রাফিক ডিজাইন এবং লাইফ সায়েন্সের মতো মজার মজার বিষয়। তাই তো এখন হাই স্কুলের শুরু থেকেই একজন কোয়ান্টা বিজ্ঞানে সহজেই দক্ষ হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞান, জুনিয়র সায়েন্স, বায়োলজি ও ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কোয়ান্টাদের আরো প্রতিভাবান করে তুলছে। আমিও এগুলোতে অংশ নিতাম এবং প্রতিটিতেই আমার কোনো না কোনো পুরস্কার আছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত গিয়েছিলাম। পুরস্কারের এই ক্রেস্টগুলো আমাদের বিজ্ঞান ভবনে রাখা আছে।

ক্যাম্পাসে বসেই আমরা ভাবতাম, আমাদের এখান থেকেই বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও প্রযুক্তিবিদের আবির্ভাব হবে। এখান থেকেই সৃষ্টি হবে দক্ষ নেতৃত্ব যারা আগামী বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।

আমি বিশ্বাস করি, কোয়ান্টাম যে মানবিক মহাসমাজের স্বপ্ন দেখে, সেটার সূতিকাগার হলো আমাদের এই কোয়ান্টামম। আর আমরা কোয়ান্টারাই এখানে কসমো ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করব একসময়। স্বর্গভূমি বাংলাদেশ আমরা কোয়ান্টারাই নির্মাণ করব। এগুলো যখন লিখছি কেউ আমাকে পাগল ভাবতে পারে, কিন্তু এগুলো আমাদের প্রত্যয়ী কোয়ান্টাদের বিশ্বাসের কথা।

আর আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাসকে বুনে দিয়েছেন গুরুজী দাদু।

Quantum Computing এবং Artifitial Intelligence আমার পছন্দের বিষয় এবং এসব বিষয়ে আমি দক্ষ হতে চাই। নিজের কাজ আমি ভালোমতো করার চেষ্টা করেছি সবসময়। যখন ছুটিতে সবাই বাড়ি যেত, তখন আমি ক্যাম্পাসে থেকেই পড়ালেখায় দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে নিতাম। আর সবসময় রুটিন মেনে চলতাম। রুটিন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে আলসেমি এলে নিজেকে শাস্তি দিতাম।

আসলে কোয়ান্টামম এবং কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ হলো আমাদের ঘর। 'আমাদের ঘর আমরাই গোছাব'—এই থিম নিয়ে আমাদের ব্যাচ এবছর (২০২৩) বের হয়েছে।

নিজেকে সবসময় ভাগ্যবান মনে হয়। সবকিছুর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। ফলবান বৃক্ষ যেমন নুয়ে থাকে, তেমনি আমি বিনয়কে জীবনের অংশ বানাতে চাই। গুরুজী দাদুর আলোয় আলোকিত হয়ে জগতে আলো ছড়াতে চাই। কারণ সারা পৃথিবী আমার। ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব! □

আমার সম্প্রদায়ে আমি প্রথম সরকারি ডেন্টাল ইউনিটে পড়ছি

খয়লন ম্রো

ডেন্টাল ইউনিট, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল

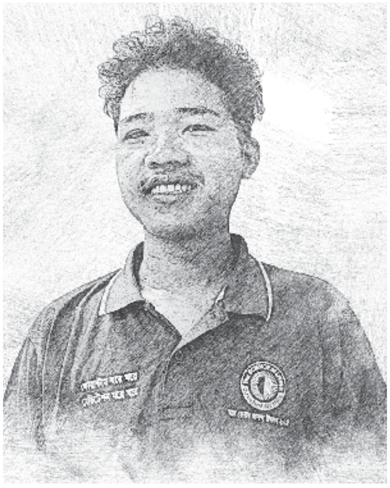

আমি ২০০৮ সালে সূচনা শ্রেণিতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেই দিনটি ছিল খুব বেদনার। পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকার কষ্ট! প্রিয়জনের স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবো ভেবে অনেক কান্নাকাটি করেছিলাম। প্রথমে আমি এখানে থাকতে চাই নি। কিন্তু স্যার-ম্যাডামেরা যে মা-বাবার মতো যত্ন নেবেন এটা তখনো বুঝতে পারি নি। ক্যাম্পাসে প্রতিদিন স্যার, ম্যাডাম, ব্রাদার, খালারা আমাকে দেখেশুনে রেখেছিলেন। তাদের যত্ন পেয়ে পরে মনে হতো মায়ের স্নেহের ছায়ায় আছি।

তবে সবচেয়ে সংগ্রামের বিষয়টি ছিল বাংলা বলাটা। কারো সাথে কথা বলার মতো ভাষা খুঁজে পেতাম না। শুধু ইশারায় কাজ চালিয়ে নিতাম। বাংলা শেখার জন্যে অনেক কষ্ট করেছি। শুধু নিজের নামটা ভালো করে বলতে পারতাম। আর খাবারের সময় হলে বুঝতাম। অন্যদের তুলনায় আমি বাংলা

বলতে শিখেছি অনেক দেরিতে। আস্তে আস্তে ঐ পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে লাগলাম। এভাবে অনেক বছর কেটে গেল।

গুরুজী দাদু দেখতে আসতেন আমাদেরকে। সালাম দেয়াটা দাদুর থেকেই শিখেছি। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিতেন।

পঞ্চম শ্রেণিতে উঠলাম। সময়টা আমার জন্যে কঠিন ছিল। আমার ছোট ভাইকে জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা গেলেন। এটা জানার পর থেকে সে-সময় আমার কোনোকিছুই ভালো লাগত না। প্রত্যেকটা নতুন দিন শুরু হতো আর মায়ের কথা মনে পড়ে যেত। মা হারানোর কষ্টে একা একা থাকতাম। কাউকে কিছু বলতাম না। এখনো মনে পড়ে সেই দিনগুলো।

তখন আমি তেমন ভালো ছাত্র ছিলাম না। ছোটবেলায় অনেক দুষ্টামি করতাম। ক্লাস সেভেনে থাকাকালে আমার জীবন একটা নতুন মোড় নিল। পড়ালেখায় অবহেলার কারণে আমি ফেল করি। দুবছর থাকতে হবে একই ক্লাসে। তখন মনে হলো, আগে কেন ভালো করে পড়ি নাই! নতুন ক্লাসের জুনিয়র সহপাঠীদের সাথে মিশতে হবে। মনে মনে লজ্জা পেলাম। বাবা বলেছিলেন, পড়ো ভালো করে। স্যার-ম্যাডামরাও অনুপ্রেরণা দিলেন, একবার ব্যর্থ হলেও নতুনভাবে স্বপ্নকে ছোঁয়া যায়।

আমি আবার শুরু করলাম। পেছনের দিকে না তাকিয়ে সামনের লক্ষ্যের দিকে ছুটে চললাম। নতুনভাবে আত্মপর্যালোচনা করি যে, বড় হয়ে আমি কী হতে চাই।

এরপর আমি অষ্টম শ্রেণিতে একজন ভালো ছাত্র হিসেবে নিজের পরিচয় তৈরি করেছি। আগে ভাবতে পারি নি যে, এইরকম সাফল্য আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। শিক্ষকদের আন্তরিকতায় আমি অষ্টম শ্রেণিতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেলাম। সেই মুহূর্তটা আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছিল।

রেজাল্ট ভালো হওয়ায় বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার জন্যে আমি স্যারদের কাছে আবেদন করি। সেই থেকে আমার বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার নতুন যাত্রা শুরু। স্যার-ম্যাডামরাও আমাকে অনেক ভালবাসতেন। মনে মনে ভাবতাম—আমি অনেক ভাগ্যবান মানুষের মধ্যে একজন।

২০২১ সালে আমি এসএসসি-তে এ প্লাস পেলাম। আসলে আমার আপন ঘর এই কোয়ান্টামম। এখানে না এলে আমি বুঝতাম না যে, বঞ্চিত থেকেও সাফল্য অর্জন করা যায়। কোয়ান্টামের প্রতি আমার অনেক কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা থাকবে আজীবন।

হাই স্কুলের জীবনটা অনেকে অনেকভাবে নিতে পারে। এটা হচ্ছে জীবনের প্রাথমিক স্তর যা কল্পনার শক্তিকে ব্যবহার, জ্ঞানার্জন ও ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করার সময়। এ সময়টা অবহেলার নয়।

এইচএসসি-তেও এ প্লাস পেলাম ২০২৩ সালে। কিন্তু এই পরীক্ষার আগমুহূর্তে আকস্মিকভাবে আমার দাদা পরলোকগমন করেন। তিনিই আমাকে কোয়ান্টামে নিয়ে আসার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন।

আমি আসলে প্রত্যন্ত অঞ্চল বান্দরবানের থানছি থেকে এসেছিলাম। তখন সেখানে তেমন কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। যাতায়াতের উপযোগী রাস্তাও ছিল না। হেঁটে অনেক দূরের পথ যেতে হতো। গহীন পথে ভয়ংকর হিংস্র জন্তুর দেখা পাওয়া যেত। সেখান থেকে আমার দাদা এবং বাবা আমাকে কোয়ান্টামে দিয়ে যান। আর বাৎসরিক ছুটিতে দাদাই বেশিরভাগ সময় আমাকে নিয়ে যাওয়া-আসা করতেন।

দাদার সাথে এই স্মৃতিগুলো বার বার মনে পড়ছিল। তাই পড়ালেখায় মনোযোগ দেয়াটা অনেক কষ্টের ছিল। এখনো অনেক মিস করি দাদাকে। তার অনুপ্রেরণায় আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল। তাকে এখনো অনেক ভালবাসি আমি। আমি থেমে না গিয়ে কষ্টকে সাফল্যে রূপ দিতে পেরেছিলাম। কারণ আমি ভাবতাম আমাকে ভালো করতে হবে।

এরপর আমার লক্ষ্যকে ছুঁয়ে দেখার উপলক্ষ এলো মেডিকেল অ্যাডমিশন জার্নি। আসলে মেডিকেলে পড়ার স্বপ্ন ছিল ছোট থেকে। মা মারা যাওয়ার পর বাবা বলেছিলেন, বড় হয়ে তুমি ডাক্তার হবে। চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে। তোমার মায়ের মতো করুণ পরিণতির সম্মুখীন যেন তাদের হতে না হয়।

বাবার সেই কথাটা মনে গেঁথে গিয়েছিল। আজকে বাবা অনেক খুশি। দাদা বেঁচে থাকলে আরো খুশি হতেন। তারা সবসময় চাইতেন আমি যেন নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে কাজ করি।

কিন্তু মেডিকেল ভর্তি কোচিং তো পরের কথা ফরম পূরণের সামর্থ্য আমার ছিল না তখন। কোয়ান্টাম কসমো কলেজেই আমার সবকিছুর ব্যবস্থা করা হলো। মাথায় চিন্তা আসত আমার দ্বারা সম্ভব হবে তো? নিজেকেই সব পড়তে হবে। তবে মেডিকেলে চান্স পাওয়া কামরুল ভাই, লালসেপঠা ভাইয়েরা তাদের সবটুকু দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে আমি কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। শিক্ষকেরাও আমাদের পাশে থেকে উৎসাহ দিতেন। জীবনে সঠিক নিয়মে কষ্ট করেছি বলেই আজ সঠিক জায়গায় আসতে পেরেছি।

আমি বর্তমানে পড়ালেখা করছি বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে। নিজেকে এই পর্যায়ে আনতে পেরে খুবই আনন্দবোধ করছি। ছোটবেলার স্বপ্নকে ছুঁতে পেরে অনেক ভালোলাগা কাজ করছে। মনে হয় যেন সবকিছুই সম্ভব।

আমার বাবা এখনো তার সামান্য উপার্জন দিয়ে পরিবারের সব খরচ বহন করছেন। ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা করাচ্ছেন। চার ভাই চার বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। তাই আমাকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ভবিষ্যতে আমি ভালো ডাক্তার হতে চাই। একজন দক্ষ দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ হতে চাই। আমার জানা মতে, ম্রো সম্প্রদায়ের মধ্যে আমিই প্রথম সরকারি ডেন্টাল ইউনিটে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো সুচিকিৎসার অভাব। তাদের দুঃখ দেখার কেউ নেই। আমি সারাজীবন তাদের পাশে থাকতে চাই। কীভাবে তাদের পাশে থাকতে পারি, এটা নিয়ে আমি প্রায় সময় চিন্তা করি। আর আমি বিশ্বাস করি, আমি পারব। কারণ আমি শিখেছি, সব সম্ভব! □

সব সম্ভবে ব্যবহৃত পরিভাষা

কোয়ান্টামম : কোয়ান্টাম চেতনার লালনভূমি। কোয়ান্টাম ও মমতা এই দুই শব্দের মিশেলে কোয়ান্টামম—বান্দরবান লামার সরই ইউনিয়নে অবস্থিত এক আলোকিত জনপদ।

কোয়ান্টা : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের বলা হয় কোয়ান্টা।

ইকরান : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বর্তমান ক্যাম্পাসের নাম।

ফিকরান : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের ছেলে কোয়ান্টাদের প্রাইমারি ক্যাম্পাস।

হিকমান : কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের ছেলে কোয়ান্টাদের হাই স্কুল, ভোকেশনাল ও কলেজের বর্তমান ক্যাম্পাসের নাম।

আমরা পারি কার্যক্রম : খেলাধুলা, বিজ্ঞান চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা ও চারুকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কোয়ান্টাদের সহশিক্ষা কার্যক্রম হলো 'আমরা পারি'।

শাফিয়ান : কোয়ান্টামমের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র।

আরোগ্যশালা : নাগরিক কোলাহলের বাইরে গিয়ে নীরবে ধ্যান সাধনায় ডুব দেয়ার স্থান কোয়ান্টামমের আরোগ্যশালা—'দ্য জোন অব সাইলেন্স'।

মারহামান : কোয়ান্টামমের সুবিশাল প্রোগ্রাম হলটির নামকরণ করা হয়েছে মারহামান।

সাদাকায়ন : ভালো কাজে অর্থ মেধা শ্রম দেয়া হচ্ছে দান বা সাদাকা। আর এই সাদাকা থেকে সাদাকায়ন। প্রতি শুক্রবারে সকাল ৯টা-১০টা আত্ম উন্নয়নমূলক উন্মুক্ত প্রোগ্রামটি দেশের আড়াই শতাধিক স্থানে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়।

অন্বেষায়ন : অন্বেষণ থেকে অন্বেষায়ন। নিজের মেধা ও সামর্থ্যকে খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে কোয়ান্টামমে তরুণদের নিয়ে আয়োজিত হয় এই প্রোগ্রাম।

করসেবা : সৃষ্টির সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কায়িক শ্রম করা হয় সেটাই করসেবা।

কোয়ান্টিয়ার : কোয়ান্টাম ও ভলেন্টিয়ার এই দুই শব্দের মিশেলে কোয়ান্টিয়ার। তাই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবকদের বলা হয় কোয়ান্টিয়ার।

অটোসাজেশন : অটোসাজেশন হচ্ছে ইতিবাচক শব্দের সম্মিলনে গঠিত বাক্যমালা।

মনছবি : মনছবি হচ্ছে মনের পর্দায় গভীর বিশ্বাস আর একাগ্র মনোযোগে লালিত সাফল্যের ছবি। চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া এই মনছবি।

ছবিতে

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ

আমাদের লালনভূমি
যে মাটিতে বেড়ে ওঠা

কোয়ান্টামমের মাটি আমাদের ঠিকানা।
মানুষের ভালবাসা ও শ্রমে নির্মিত
এক আলোকিত জনপদ।
এখানকার সবকিছুই আমাদের খুব আপন।
কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ পরম মমতায়
সেই ছোট্টবেলায় আমাদের হাত ধরেছিল বলেই
আজ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারছি, সব সম্ভব!
আমরা কোয়ান্টা—এটাই আমাদের পরিচয়।
সত্যিই সৌভাগ্যবান আমরা।

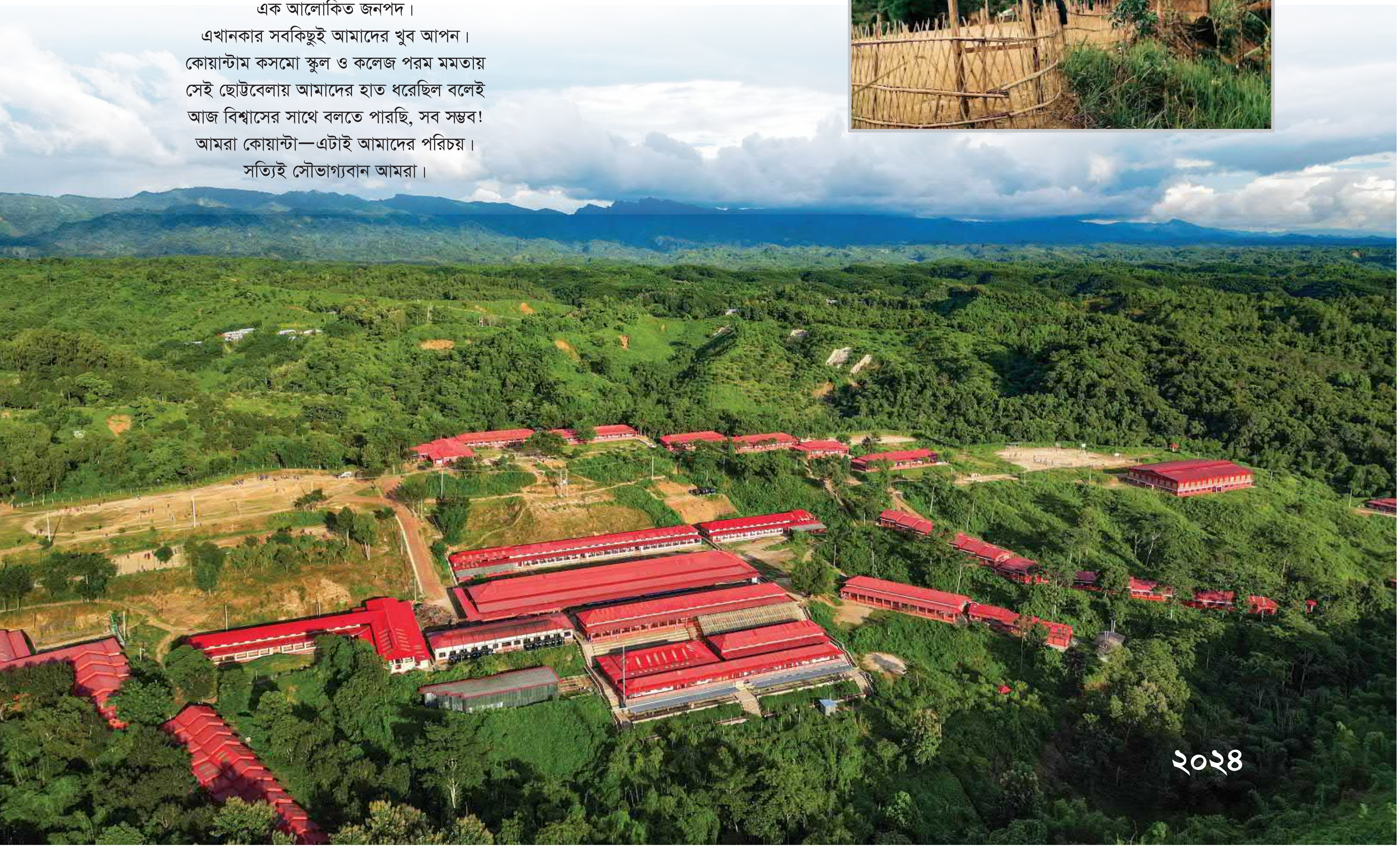

১৯৯৮ সালে গুরুজী দাদু শহীদ আল বোখারী মহাজাতক মুরংপাড়ায় একটি স্কুল পরিদর্শনে যান। সেখানকার দুরাবস্থা দেখে তিনি বুঝতে পারেন—প্রত্যন্ত এই জনপদকে আলোকিত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষা। এই ভাবনা থেকেই তিনি স্বপ্ন বুনতে থাকলেন একটি শিক্ষালয়ের। ছবিতে প্রথম ব্যাচের দুজন কোয়ান্টা (ডান থেকে) থংইয়া ও সুমথং। থংইয়া এখন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এবং সুমথং ডাক্তার।

২০০১ সালে ম্রো জনগোষ্ঠীর ৭টি শিশু নিয়ে শুরু হলো এই স্কুলের যাত্রা। ছবিতে আছে প্রথম ৭ জনের ৬ জন।

নাহার আল বোখারী। আমরা ভালবেসে ডাকি মা-জী দাদু। স্কুলের শুরু থেকেই তিনি আমাদের অনেক সময় দিয়েছেন। কত গল্প শুনিয়েছেন! রান্না করেও খাইয়েছেন। এখনো কোয়ান্টামমে এলে কোয়ান্টাদের সাথে তিনি সময় কাটান। ছবিটি ২০০১ সালের।

ভোরবেলা আমাদের যোগব্যায়াম শেখানো হচ্ছে। সুস্থ দেহ প্রশান্ত মনের জন্যে শিশুকাল থেকেই যোগচর্চা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০২

শিশুকাননে স্কুলঘরের সামনে সকালে ক্লাস শুরুর আগে অ্যাসেম্বলি হতো আমাদের। ২০০৩

২০০৪ সালের একটি ক্লাসরুম। তখনকার বেড়ার ক্লাসরুম আর বর্তমানে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের মধ্যে কত ব্যবধান! আসলে শুরুটা সবসময়ই অল্প কিছু দিয়েই হয়।

২০০৪-এ বান্দরবানে আমরা বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপ্লে-তে প্রথমবারে অংশ নিয়েই প্রথম হই। এটাই ছিল জেলা পর্যায়ে প্রথম কোনো প্রতিযোগিতায় আমাদের অংশগ্রহণ।

বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপ্লে

২০০৪ থেকে প্রতিবছর লামা উপজেলা ও বান্দরবান জেলায় কোয়ান্টারা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আসছে। প্রতিবারই আমাদের মনোমুগ্ধকর প্যারেড ও ডিসপ্লে-র জন্যে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার দেয়া হয়।

চট্টগ্রামের এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে ডিসপ্লে-র একটি মুহূর্ত। ১৬ ডিসেম্বর ২০১১

স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীকে মুগ্ধ করল কোয়ান্টারা

২০১৫ সালের শুরুতেই কোয়ান্টারা সৃষ্টি করে এক বিরল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজের রাষ্ট্রীয় আসরে প্রথমবারের মতো অংশ নিতে আমরা ঢাকায় আসি। এমনকি আমাদের বেশিরভাগের জন্যে ঢাকায় আসাও ছিল এবারই প্রথম। স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ মার্চপাস্টে প্যারেড বড় ও ছোট দুটি দলই যুগ্মভাবে অর্জন করল প্রথম স্থান। ২০১৬-২০১৯ পরবর্তী চার বছরেও এই বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল।

হল অব গ্র্যাটিচুড

বিভিন্ন সময়ে কোয়ান্টাদের অর্জিত ক্রেস্ট, মেডেল, পদক ও সম্মাননা গ্যালারি ‘হল অব গ্র্যাটিচুড’। এ অর্জন আমাদের করেছে আরো আত্মবিশ্বাসী, আরো বিনয়ী, আরো কৃতজ্ঞ।

ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা স্কুল

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্কুলভিত্তিক যে-কোনো আসরে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল মানেই চমকপ্রদ অর্জন! ২০১৭-২০২০ পর পর চার বার ক্রীড়ানৈপুণ্যে দেশসেরা স্কুলের তালিকায় রয়েছে আমাদের স্কুল।

১৬ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯। বাংলাদেশ দলের ৯ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিল কোয়ান্টা। বাংলাদেশের অর্জিত ২৫টি পদকের ২১টিই পেয়েছে কোয়ান্টারা।

জিমন্যাস্টিক্স অনুশীলনের জন্যে আমাদের রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের জিমনেসিয়াম।

◆ পর পর ৮ বার (২০১৩-২০২৩) অংশ নিয়ে ৮ বারই জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল হ্যান্ডবল টিম। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২০-২১ সালে প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল।

◆ ২০১৯-এ ১৩ তম সাউথ এশিয়ান গেমস-এ বাংলাদেশ খো খো জাতীয় দলের ১২ জনের ১০ জনই ছিল কোয়ান্টা।

◆ ২০১৭-১৮ বিজয় দিবস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন।

◆ ২০১৪-১৫ স্বাধীনতা কাপে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন।

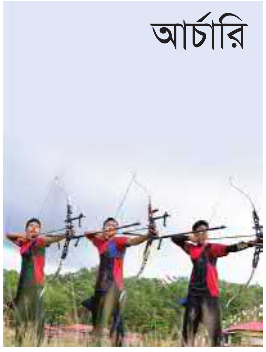

◆ ২০১৮-তে ২য় যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে একক ইভেন্টে স্বর্ণ জয়, ন্যাশনাল র‍্যাংকিং স্টেজ-২ সেরা দশে তিন জন কোয়ান্টার অন্তর্ভুক্তি।

◆ ২০১৭-তে ৯ম জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্য পদক অর্জন।

◆ ২০১৬-২০১৭ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কাবাডিতে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল।

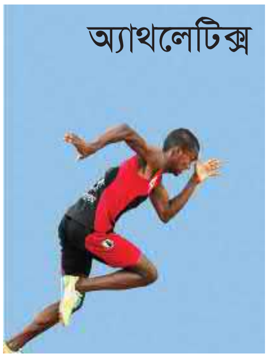

◆ ২০১৮-তে জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য পেয়ে সেরা খেলোয়াড় স্প্রিন্ট, স্কিপিং, পোল ভল্ট ও লং জাম্পে স্বর্ণ জয়।

◆ ২০২০-২৪ বালিকা একক ইভেন্টে পরপর ৪ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৫-১৭ আন্তঃস্কুল জাতীয় প্রতিযোগিতায় বালক দ্বৈত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টারা।

বিজ্ঞান চর্চা

পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি কোয়ান্টাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্যে প্রতিনিয়ত নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

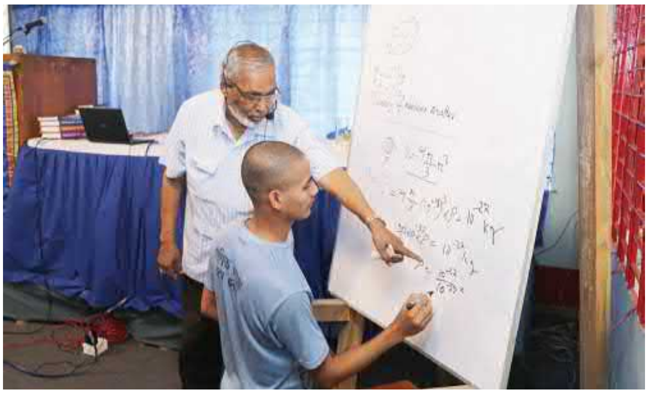

বিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী স্যার কয়েকবার আমাদের স্কুল পরিদর্শন করেছেন। আমাদের বিজ্ঞান ভাবনার পরিসরকে আরো বড় করেছেন। (ছবিতে) ২০২২ সালে আমাদের ক্যাম্পাসে 'হলিস্টিক সায়েন্স' বিষয়ক কর্মশালা পরিচালনা করেছেন তিনি।

বাংলাদেশের গণিত অলিম্পিয়াডের স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ স্যারও আমাদের কসমো ক্যাম্পাসে এসেছিলেন (২০২০ ও ২০২২)। গণিত ও প্রোগ্রামিং নিয়ে তিনি আমাদের বেশ অনুপ্রাণিত করেছেন।

সায়েন্স ক্লাবকে বলি 'আমরা পারি এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স'। এই ড্রোন আমরা নিজেরাই বানিয়েছি। যেদিন ক্যাম্পাসে নিজেদের তৈরি ড্রোন আকাশে উড়িয়েছিলাম, সেদিন আমাদের কী যে আনন্দ! এছাড়াও কম্পিউটার শেখার জন্যে আমাদের রয়েছে 'আমরা পারি প্রোগ্রামিং' কার্যক্রম।

যতই প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ আসুক, প্রকৃতিকে সংরক্ষণের বিকল্প নেই। তাই কোয়ান্টাদের রয়েছে 'আমরা পারি লাইফ সায়েন্স' কার্যক্রম। এখানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা হয়। ছবিতে গাছের পাতা, বীজ, ফুল-ফলের সংগ্রহশালা 'হার্বেরিয়াম'-এ কাজ করছে কোয়ান্টারা।

কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছি

৯ম ও ১০ শ্রেণির ভোকেশনালে বেশ কয়েকটি ট্রেডে কোয়ান্টারা পড়ছে। নিজেদের মেধা বিকাশে কোনো অংশে কম নয় তারা। শতকরা ৬০-৭৫ ভাগ এ প্লাস-সহ শতভাগ পাশ করে ভোকেশনালের কোয়ান্টারা।

ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের জন্যে একাডেমিক পড়াশোনা যেমন জরুরি, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো হাতে-কলমে শেখা। কোয়ান্টারা এই সুযোগটি ভালোভাবে পায়। আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ, উড-ওয়ার্ক ওয়ার্কশপ।

মেধাসৃজন কার্যক্রম

মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে লেখাপড়ার পাশাপাশি মেধাসৃজন নামের সহপাঠ কার্যক্রমে আমরা অংশ নিয়ে থাকি। এতে রয়েছে নাচ, গান, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও কারুশিল্প।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল
সব ধর্মের সব মানুষের

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত চার প্রধান ধর্মের ধর্মবাণী নিয়ে কণিকা

এখানে দেয়া হয় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা।
নিজ নিজ ধর্মচর্চারও পূর্ণ সুযোগ পাই আমরা।

বাঙালিসহ ২২ জাতির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আমরা একসাথে
বেড়ে উঠছি এক উদারনৈতিক পরিবেশে।

ভাষা শহিদ ও বীরশ্রেষ্ঠদের শ্রদ্ধায়
‘শহিদ স্মরণে’

১৯৫২’র ভাষা শহিদ ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর এক অনন্য উদ্যোগ ‘শহিদ স্মরণে’। ইট-সিমেন্ট-পাথরের কোনো অবকাঠামো নয়, শহিদদের স্মরণে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বৃক্ষরোপণ করা হয় ২০০৮ সালে। ১২টি গাছের ৫টি উৎসর্গ করা হয় ৫ জন ভাষা শহিদের উদ্দেশ্যে এবং ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠকে স্মরণ করে ৭টি গাছ লাগানো হয়েছে। এই গাছগুলো থেকে মানুষ, পশুপাখি ও প্রকৃতি যত উপকৃত হবে, তা শহিদদের জন্যে সদকায়ে জারিয়া বা প্রবহমান দান হিসেবে গণ্য হবে।

২০০৮ সালে ‘শহিদ স্মরণে’ শহিদদের উদ্দেশ্যে প্রথমবার বৃক্ষরোপণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই আমরা।

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাসহ সকল ভাষার প্রতি ‘শহিদ স্মরণে’ চত্বরে শ্রদ্ধা জানাই আমরা। ছবিটি ২০২৩ সালের। ২০০৮ সালে রোপিত চারাগুলো এখন বৃক্ষ।

ভালো ছাত্র ভালো মানুষ
ক্লাসে ১ম জীবনে ১ম

শৃঙ্খলাই শৃঙ্খলমুক্তির পথ—সাফল্যের এই চিরায়ত সূত্র চর্চা করেই বেড়ে উঠি আমরা। ভোর সাড়ে ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত আমাদের প্রতিদিনের রুটিন ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে। লেখাপড়া ও খেলাধুলার পাশাপাশি ইয়োগা, মেডিটেশন, স্বেচ্ছাশ্রম ও শুদ্ধাচার চর্চা একজন কোয়ান্টাকে ক্লাসে ও জীবনে ১ম হতে সাহায্য করে।

ভোরে ইয়োগা-মেডিটেশন করে, সকালের খাবার খেয়ে ফ্রেশ হয়ে ক্লাস শুরুর আগেও আমরা কিছুক্ষণের জন্যে মেডিটেশনে আত্মনিমগ্ন হই।

পাবলিক পরীক্ষায় ১০০% পাশ

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের পাশের হার ১০০%। পিইসি, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি—প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায় এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আর এর কারণ হলো ক্লাসে শতভাগ উপস্থিতি এবং একাডেমিক পড়াশোনায় গাইড বইয়ের চেয়ে মূল পাঠ্যবইয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া।

ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি শুক্রবার সকাল ৯-১০টা কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের ৩টি ক্যাম্পাসেই আয়োজিত হয় কোয়ান্টা সাদাকায়ন। এ আয়োজনটি আমরা নিজেরাই পরিচালনা করে থাকি।

ক্যাম্পাসে আমরা কোনো শিক্ষার্থী স্মার্টফোন ব্যবহার করি না। তাই লেখাপড়া বা খেলাধুলার পরে অবসরে বিভিন্ন বই পড়ে সময়টা কাজে লাগাই। এজন্যে আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি—অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পাঠাগার।

আম কাঁঠাল লিচু তরমুজ—বিভিন্ন ফলের মৌসুমে আয়োজিত হয় ফল উৎসব।

মেয়ে কোয়ান্টাদের ক্যাম্পাস
ইকরান

২০০৪ সালে **১১**টি মেয়েশিশুকে নিয়ে রাজশাহীতে শুরু হয় কোয়ান্টাম শিশুসদন। তারই বিকশিত রূপ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের মেয়ে কোয়ান্টাদের বর্তমান ক্যাম্পাস ইকরান। এখানে ৫ শতাধিক মেয়েশিশু নিজের পরিচয় সৃষ্টির মনছবি নিয়ে বেড়ে উঠছে। প্রথম ব্যাচের ছাত্রীরা এসএসসি শেষে পড়ছে কসমো কলেজে। এইচএসসি (২০২৪) শেষে তারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করবে—এটাই তাদের স্বপ্ন।

আধুনিক প্রযুক্তিতে মেয়ে কোয়ান্টারাও পিছিয়ে নেই। নিয়মিত কম্পিউটার ল্যাবে ক্লাস করে।

২০২১ সালে পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি-তে এ প্লাস পাওয়া মেয়ে কোয়ান্টাদের একাংশ।

বিভাগীয় পর্যায়ে ২০১৬ সালে প্রথমবার গিয়েই প্রথম হয় মেয়ে কোয়ান্টাদের দল। তারপর থেকে তারা বিজয় দিবসে চট্টগ্রাম এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে প্যারেডে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার পেয়ে আসছে।

জাতীয় পর্যায়ে বাস্কেটবল বালিকা ইভেন্টেও পরপর ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হয় (২০২২-২৪)। টেবিল টেনিসে বালিকা একক ইভেন্টে পরপর ৪ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টারা (২০২০-২৪)। আন্তঃস্কুল জাতীয় প্রতিযোগিতায় ভলিবল বালিকা ইভেন্টে টানা ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হয় (২০২০-২৩)।

মেডিকেল বুয়েট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ২১৫ জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগপ্রাপ্ত কোয়ান্টাদের একাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ জন

২০১৪ সালে ১ জন
২০১৫ সালে ১ জন
২০১৬ সালে ৫ জন
২০১৭ সালে ৭ জন
২০১৮ সালে ১০ জন
২০১৯ সালে ১০ জন
২০২১ সালে ৪ জন
২০২২ সালে ৭ জন
২০২৩ সালে ৮ জন
২০২৪ সালে ৭ জন

ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন

বুয়েট
১ জন

চুয়েট
৩ জন

সরকারি মেডিকেল কলেজে ১৪ জন

২০১৪ সালে ১ জন
২০১৮ সালে ৩ জন
২০১৯ সালে ৩ জন
২০২১ সালে ৪ জন
২০২৪ সালে ৩ জন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগপ্রাপ্ত কোয়ান্টাদের একাংশ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৪ জন

২০১৫ সালে ৭ জন
২০১৬ সালে ২ জন
২০১৭ সালে ৭ জন
২০১৮ সালে ১১ জন
২০১৯ সালে ১৭ জন
২০২০ সালে ৩ জন
২০২১ সালে ৭ জন
২০২২ সালে ৮ জন
২০২৩ সালে ৫ জন
২০২৪ সালে ৭ জন

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৩ জন

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় — ১২ জন
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় — ১৩ জন
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় — ৬ জন
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় — ৯ জন
- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় — ৩ জন
- নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় — ৪ জন
- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় — ২ জন
- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় — ১ জন
- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় — ২ জন
- রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় — ৫ জন
- কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় — ২ জন
- চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় — ১ জন
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় — ১ জন
- গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় — ১ জন
- হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় — ১ জন

দেশবরেণ্য গুণীজনের সান্নিধ্য
আমাদের করেছে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ

জাতীয় অধ্যাপক
ডা. নুরুল ইসলাম

জাতীয় অধ্যাপক
ডা. এম আর খান

জাতীয় অধ্যাপক
ব্রিগে. (অব.)
ডা. আব্দুল মালিক

সব্যসাচী লেখক
সৈয়দ শামসুল হক
ও তার সহধর্মিণী
মনোচিকিৎসক
আনোয়ারা সৈয়দ হক

অধ্যাপক আবদুল্লাহ
আবু সায়ীদ ও তার
সহধর্মিণী বেগম
রওশন আরা সায়ীদ

চিকিৎসাবিদ অধ্যাপক
ডা. নিজামউদ্দিন
আহমেদ

স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্টেডিয়ামে আমাদের মার্চিং ব্যান্ড, ২০১৮

আবাসন ও খেলার মাঠ, ২০০১

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও
কলেজ সব ধর্মের,
সব শিশুর, সব মানুষের,
যেখানে প্রত্যেকেরই রয়েছে
নিজ মেধা বিকাশের অপূর্ব
সুযোগ—জীবন জয়ের,
জীবনের সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব
দেয়ার, মাথা উঁচু করে
দাঁড়ানোর, সবার সাথে
সমমর্মিতার বিকাশভূমি।

ভালো মানুষ
ভালো দেশ
স্বর্গভূমি
বাংলাদেশ

ISBN 978-984-37-0079-7